সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

মরুকন্যা

কাজী আনোয়ার হোসেন

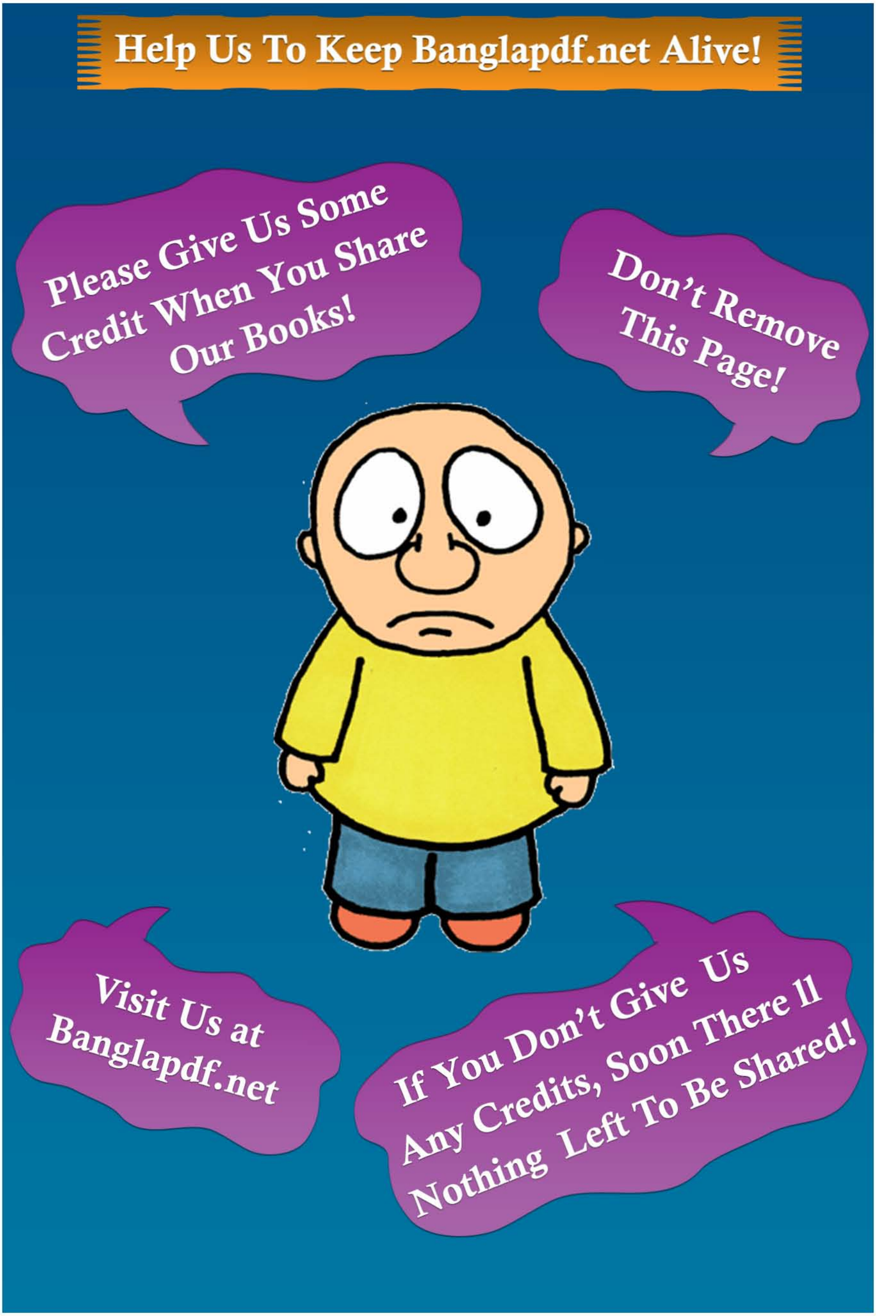
Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা ৩৫২

মরুকন্যা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-7352-5
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের
প্রথম প্রকাশ: ২০০৫
প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব
রচনা: বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
Masud Rana-352
MORUKONYA
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

চল্লিশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা *তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত* সতর্ক শয়তান *নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ* শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস *আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র *শকুনের ছায়া *তুরুপের তাস *কালসাপ গুডবাই, রানা* সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা! *দেশপ্রেম *রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা সিক্রেট এজেন্ট *ভাইরাস X-99 *মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট *গোপন শত্রু মোসাদ চক্রান্ত *চরসদ্বীপ *বিপদসীমা *মৃত্যুবীজ *জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র অন্ধ আক্রোশ *অশুভ প্রহর *কনকতরী *স্বর্ণখনি *অপারেশন ইজরাইল শয়তানের উপাসক *হারানো মিগ *ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত *সবুজ সঙ্কেত *অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা *গহীন অরণ্য *প্রজেক্ট X-15 অন্ধকারের বন্ধু *আবার সোহানা *আরেক গডফাদার *অন্ধপ্রেম *মিশন তেল আবিব *ক্রাইম বস *সুমেরুর ডাক *ইশকাপনের টেক্কা কালো নকশা *কালনাগিনী *বেঈমান *দুর্গে অন্তরীণ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

দক্ষিণ আমেরিকা।

ঘন সবুজ গাছপালা আর গাঢ় ছায়ায় ঢাকা গা-ছমছমে গভীর জঙ্গল। প্রতিপদে রহস্যের হাতছানি আর অজানা বিপদের আশঙ্কা। মগডালের কাছে শাখা-প্রশাখা আর পাতার ঘন আচ্ছাদন ভেদ করে অল্প যেটুকু রোদ ঢুকতে পারছে তার রঙ গোয়ালার পানি মেশানো দুধের মত ঘোলাটে। বাতাস ভেজা ভেজা আঠালো আর নিরেট, আর্দ্রতার একটা পাঁচিল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পাখিরা তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচাচ্ছে, হঠাৎ যেন প্রকাণ্ড কোন জালে আটকা পড়েছে ওগুলো। পায়ের তলায় চাপা পড়ার ভয়ে চকচকে পিঠ নিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে পোকারা। ঘন ঝোপের ভিতর ঝগড়া-ফ্যাসাদে মত্ত একদল খুদে জানোয়ার।

অতি পুরাতন, আদিম একটা জঙ্গল এটা; শুধু প্রাচীন নয়, ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে যাওয়া একটা এলাকা, আধুনিক মানচিত্রে স্থান পায়নি, এর আগে এ-যুগের কেউ বোধহয় আসেওনি এদিকে—জায়গাটা যেন দুনিয়ার শেষ প্রান্ত।

সরু একটা ট্রেইল ধরে ধীর গতিতে এগোচ্ছে দশজন মানুষ। মাঝে-মধ্যেই থেমে উপর থেকে নেমে আসা ডাল বা ঝুলে থাকা শাখা কেটে এগোবার পথ পরিষ্কার করছে ওরা।

দলের মাথায় রয়েছেন প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক–প্রকাণ্ড শরীর তাঁর, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথায় এলোমেলো রুক্ষ চুল, চোখ দুটো অসম্ভব উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ। চেহারাতেই লেখা আছে আপস করতে না জানা একজন মানুষ, অসম্ভব দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। পরনে বুক খোলা সাদা শার্ট আর জিনসের প্যান্ট, পায়ে গোড়ালি ঢাকা বুট আর মাথায় শক্ত হ্যাট। ভদ্রলোক মিশরের অত্যন্ত নাম করা, সম্মানিত একজন আর্কিওলজিস্ট, ডক্টর জাওয়াদ কাসেমি।

ডক্টর জাওয়াদের ঠিক পিছনেই রয়েছে তাঁর মেয়ে ফাহিমা। সে-ও আর্কিওলজি নিয়ে কায়রো ইউনিভার্সিটি থেকে গত বছর মাস্টার্স করেছে। বাপের মতই জিনসের প্যান্ট আর সাদা পপলিনের শার্ট পরেছে সে, মাথায় হ্যাট আর পায়ে বুট। মাঝে মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে লাইনের শেষ মাথাটা দেখবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে সে। যার উপর ভরসা করে এই দুর্গম অভিযানে এখানে আসা, অনেকক্ষণ হলো তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

ফাহিমার পিছনে রয়েছে পাঁচজন নার্ভাস কুইচুয়া ইন্ডিয়ান। একজোড়া গাধার সঙ্গে প্রায় সারাক্ষণই লড়াই করতে হচ্ছে তাদেরকে। ওদের সমস্ত রসদ আর ইকুইপমেন্ট ওই গাধা দুটোর পিঠে।

কুইচুয়া ইন্ডিয়ানদের পিছনে দু'জন পেরুভিয়ান–মোয়াক্কা আর বেলিয়ো। অসম্ভব সতর্ক তারা, চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে সারাক্ষণ নজর রাখছে জঙ্গলের উপর।

লাইনের শেষ মাথায় রয়েছে দীর্ঘদেহী এক তরুণ। লেদার জ্যাকেট পরে আছে সে, মাথায় কারনিস সহ ফেল্ট হ্যাট। তার শরীরটাকে পেশির সমষ্টি বলা যেতে পারে, সাফল্যের মধ্যগগনে উঠে আসা একজন অ্যাথলেট-এর মত। কয়েকদিনের না কামানো খোঁচা-খোঁচা দাড়ি আর ঘামের কয়েকটা দাগের আড়ালে চেহারাটা ঢাকা পড়ে গেলেও, সুদর্শন বলেই যেন আভাস পাওয়া যায়। নাম মাসুদ রানা।

বয়সের বিরাট ব্যবধান সত্ত্বেও ডক্টর জাওয়াদের বন্ধু রানা, বলা যেতে পারে, জুনিয়র বন্ধু। কবে কীভাবে বা কোথায় পরিচয় হয়েছিল হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে দু'জনের কেউই হয়তো বলতে পারবে না, মনে করতে চাইলে স্মৃতির পাতা হাতড়াতে হবে, তবে আর্কিওলজি একজনের মহান পেশা আর অপরজনের প্রবল নেশা হওয়ায় ঘনিষ্ঠতা জন্মাতে দেরি হয়নি। এই ঘনিষ্ঠতা থেকে পরস্পরের প্রতি আশ্চর্য একটা আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, ফলে আনুষ্ঠানিক কোন আয়োজন ছাড়াই দু'এক বছর পর পর কী করে যেন ঠিকই ওদের দেখা হয়ে যায়। আর দেখা হলেই আর্কিওলজিক্যাল খবরাখবর বিনিময় করে ওরা, সময় ও সুযোগ থাকলে ছোটখাট কোনও অভিযানে পরস্পরকে সঙ্গ দেয়।

দেশটা পেরু, মোয়াক্কা আর বেলিয়ো এ-দেশেরই সন্তান, অথচ রানার ভাব-ভঙ্গির মধ্যে তাদের মত অতি সতর্কতা দেখা যাচ্ছে না। আত্মবিশ্বাস দেখে মনে হতে পারে এখানে ও-ই বুঝি স্থানীয়। তবে বাইরের শান্ত ভাব সজাগ সচেতন থাকার প্রবণতাকে মোটেও নিস্তেজ করে দেয়নি। মাঝে মধ্যেই চোখ বুলিয়ে চারদিকটা দেখে নিচ্ছে, আশা করছে এই বুঝি কোন হুমকি বা বিপদ দেখা দিল। একটা শাখা হঠাৎ ফাঁক হলো বা পচা কাঠ ভাঙার আওয়াজ শোনা গেল–এগুলোই সঙ্কেত, বিপদের পূর্বাভাস।

মাঝে মধ্যে থামছে রানা, হ্যাটটা নামাচ্ছে, কপালের ঘাম মোছার সময় চিন্তা করছে–কোনটা ওকে বেশি বিরক্ত করছে, বাতাসের আর্দ্রতা, নাকি কুইচুয়া ইন্ডিয়ানদের নার্ভাসনেস? মাঝেমধ্যেই তুমুল এক পশলা বৃষ্টির মত শব্দ করে নিজেদের মধ্যে অদ্ভুত এক ভাষায় কথা বলছে তারা, যে ভাষাটা রানাকে পাখির কিচিরমিচির, দুর্ভেদ্য জঙ্গলের বিচিত্র প্রাণী আর হাঁটু সমান কুয়াশার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

গাধা দুটো অসহযোগিতা শুরু করায় কুইচুয়ারা পিছিয়ে

পড়ল। তাদের উপর নজর রাখার জন্য পিছিয়ে পড়ল বেলিয়ো আর মোয়াক্কাও।

ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দু'জনকে একবার দেখে নিল রানা। দু'জনের একজনকেও বিশ্বাস করে না ও, অথচ এই অভিযানে সাফল্যের জন্য ওদের উপর নির্ভর না করে উপায়ও নেই।

কী একটা দল!—ভাবল রানা। দুই সন্দেহজনক চরিত্রের পেরুভিয়ান, পাঁচ আতঙ্কিত ইন্ডিয়ান, অসুস্থ এক প্রৌঢ় আর্কিওলজিস্ট, অনভিজ্ঞ এক তরুণী আর দুটো গাধা। ভাবা যায়, এরকম একটা দলের লিডার বানানো হয়েছে ওকে!

ঘাড় ফিরিয়ে মোয়াক্কার দিকে তাকাল রানা, উত্তরটা কী হবে জানা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করল, 'ইন্ডিয়ানরা কী বলছে?'

মুয়াক্কার চেহারায় অস্বস্তি ফুটে আছে। 'ওদের বলার কথা তো সব সময় একটাই। অভিশাপ!'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ইন্ডিয়ানগুলোর দিকে একবার তাকাল রানা। তাদের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস আর ভীতি সম্পর্কে জানে ও। এক অর্থে তাদের প্রতি খানিকটা সহানুভূতিও আছে ওর। এই অভিশাপ অতি প্রাচীন, চাচাপুয়ান যোদ্ধারা দিয়ে গেছে। কুইচুয়ারা বংশ পরম্পরায়, জন্মের পর থেকে এই অভিশাপের কথা শুনে আসছে, ক্রমে তাদের বিশ্বাস আর অস্তিত্বের একটা অংশ হয়ে উঠেছে ব্যাপারটা।

'ওদেরকে শান্ত হতে বলো, মুয়াক্কা,' বলল রানা। 'বলো কারও কোন বিপদ হবে না।' নিজেও জানে, কথাটা সত্যি নয়। বিপদ হবে কি হবে না, ও তা জানবে কীভাবে?

রানাকে এক মুহূর্ত দেখে নিয়ে কর্কশ ভঙ্গিতে ইন্ডিয়ানদের ধমক দিল মুয়াক্কা। আপাতত চুপ করল লোকগুলো।

এই আকস্মিক নীরবতাটুকু আসলে দমিয়ে রাখা ভীতির আরেক রূপ। আবারও লোকগুলোর প্রতি সহানুভূতি জাগল রানার—মৌখিক অভয়দান শত বছরের কুসংস্কারকে মুছে ফেলতে

পারে না।

হ্যাটটা মাথায় পরে নিল, তারপর ট্রেইল ধরে আবার ধীর পায়ে এগোল ও। জঙ্গলের বিচিত্র সব শব্দ ধরা দিচ্ছে কানে। উন্মোচিত কুঁড়ি আর নতুন চারার গন্ধ পাচ্ছে। গন্ধ পাচ্ছে পচনের। ঝাঁক বাঁধা পোকাদের ভন-ভন আওয়াজ টের পাওয়া যাচ্ছে প্রাচীন কঙ্কাল, মরা কাঠ আর মৃতপ্রায় ঝোপের ভিতরে।

নাহ্, এ-জঙ্গলটা ভালো লাগছে না রানার। সত্যি কথা বলতে কী, এখানে বোধহয় না আসলেই ভালো হতো। অস্তিত্বের কোন্ এক গহীন তলদেশ থেকে কী যেন অশুভ একটা সঙ্কেত আসছে, ঠিক ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না।

অবশ্য এখানে আসার জন্য কেউ ওকে সাধেনি বা বাধ্য করেনি। অ্যাডভেঞ্চারের লোভে নিজেই আসতে চেয়েছে ও। হঠাৎ সব মনে পড়ে গেল।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর হেডকোয়ার্টার ঢাকা সিরিয়া আর লেবানন সীমান্তে একটা কাজ দিয়ে পাঠিয়েছিল তাদের অন্যতম সেরা এজেন্ট এমআরনাইন, অর্থাৎ মাসুদ রানাকে।

কাজটা শেষ করে দামেস্ক হয়ে কায়রো চলে এল রানা, উদ্দেশ্য এ অঞ্চলের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করে পুরানো বন্ধুত্ব যথাসম্ভব ঝালিয়ে নেওয়া।

প্রথম দিনটা কায়রো মিউজিয়ামে কাটাল রানা। সন্ধ্যায় নিজের হোটেল সুইটে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে, এই সময় ফোন। রিনিকিঝিনি একটা নারীকণ্ঠ ভেসে এল, 'মাসুদ রানা, ফ্রম বাংলাদেশ?'

উত্তরটা সাবধানে এড়িয়ে গিয়ে নরম সুরে জানতে চাইল রানা, 'আপনি কে বলছেন, প্লিজ?'

মেয়েটির কথায় রহস্য আরও জমাট বাঁধল। 'দেখুন তো, হিমা নামে চমৎকার কোন মেয়ের কথা আপনার মনে পড়ে কিনা?'

'হিমা…হিমা…নাহ্,' হাল ছেড়ে দিয়ে বলল রানা। 'কই, এই মুহূর্তে ঠিক…'

'ঠিক আছে, একটা টিপস দিই,' বলল মেয়েটি। 'বছর দশেক আগের কথা। আফ্রিকা, কঙ্গোর গভীর জঙ্গল। সামনে মানুষ-খেকো জংলীদের এলাকা। মোটবাহকরা পালিয়ে যাচ্ছে, আধ পাগলা একজন আর্কিওলজিস্ট ওই এলাকা পার হতে চান। কিন্তু তার কিশোরী মেয়ে তাকে একা ছাড়বে না। মনে পড়ে?'

ইতিমধ্যে হাসতে শুরু করেছে রানা। 'ধ্যাত, আগে বলবে তো–তুমি ফাহিমা, মরুকন্যা!' এখন ওর মনে পড়ছে–ওদের বাপ-বেটির এটা একটা পুরানো লড়াই। বয়সের নিষেধ অমান্য করে একের পর এক বিপদসঙ্কুল অভিযানে বেরুতেই হবে বাবাকে, আর মা-মরা কিশোরী মেয়েটির একমাত্র কাজ বুঝিয়ে-শুনিয়ে তাকে ঘরে আটকে রাখা, তাতে ব্যর্থ হলে নিজেও তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়া। 'এই মেয়ে, কেমন আছ তোমরা? বাইপাস সার্জারির পর ডক্টর জাওয়াদের শরীর-স্বাস্থ্য এখন কেমন?'

'মাসুদ ভাই, আপনি তা হলে জানেন গত বছর আব্বুর অপারেশন হয়েছে?' গলার আওয়াজ শুনে বোঝা গেল বিস্মিত হয়েছে ফাহিমা।

'কেন জানব না। তোমাদের সব খবরই রাখি আমি।'

'ধন্যবাদ, মাসুদ ভাই,' বলল ফাহিমা। 'শুনুন, আব্বুকে নিয়ে এবার খুব বড় একটা সমস্যায় পড়ে গেছি আমি।'

'নতুন কিছু?' হাসি চেপে জানতে চাইল রানা।

'বাঁচিয়ে রাখার জন্যে প্রায়ই অপারেশন দরকার হচ্ছে আব্বুর,' বলে যাচ্ছে ফাহিমা, রানার কথা যেন শুনতে পায়নি। 'এই তো, ডানদিকের ফুসফুস পচে যাওয়ায় পাঁচ মাস হলো ওটার ছয় ইঞ্চি কেটে ফেলে দিতে হয়েছে।'

'তা-ও জানি।'

এক সেকেন্ড থেমে ফাহিমা জিজ্ঞেস করল, 'এ-ও নিশ্চয়ই

জানেন যে ডাক্তাররা বলে দিয়েছেন আর কোন আর্কিওলজিকাল এক্সপিডিশনে আব্বুর বেরুনো চলবে না?'

'জানি।'

'এটা নিয়েই সমস্যায় পড়েছি, মাসুদ ভাই।'

'কী সমস্যা?'

ব্যাখ্যা করল ফাহিমা। বহু বছর ধরে প্রাচীন একটা মানচিত্র ছিল ডক্টর জাওয়াদের সংগ্রহে–পুরোটা নয়, মাত্র অর্ধেক। ওই মানচিত্র নাকি পেরুর গহীন জঙ্গলের ভিতর চাচাপুয়ানদের হারিয়ে যাওয়া একটা মন্দিরে যাওয়ার পথ দেখাবে।

হঠাৎ করে এক পেরুভিয়ান খবর দিয়েছে, মানচিত্রের অর্ধেকটা তার কাছে আছে । লোকটার নাম বেলিয়ো। তার বাবা মারা যাওয়ার সময় ওটা তাকে দিয়ে গেছে। এই বেলিয়োর সঙ্গে ই-মেইলে যোগাযোগ করেছেন ডক্টর জাওয়াদ। খবরটা মিথ্যে নয়, মানচিত্রের অর্ধেকটা সত্যি তার কাছে আছে।

পরবর্তী মেসেজে ডক্টর জাওয়াদ বেলিয়োকে যৌথ অভিযানের প্রস্তাব দেন। এক্সপিডিশনের আয়োজন করবে বেলিয়ো, দু'জন ভাগাভাগি করে খরচ বহন করবেন, মন্দির থেকে মহামূল্য চাচাপুয়ান স্বর্ণমূর্তিটা উদ্ধার করা সম্ভব হলে সেটা নিলামে বিক্রি করা হবে, সেই টাকা দু'জন ভাগ করে নেবেন।

তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেছে বেলিয়ো। মেসেজটা পেয়েই অভিযানে বেরুবার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন ডক্টর জাওয়াদ, মেয়ের প্রতিবাদ আর আপত্তি কানে তুলছেন না। অথচ ডাক্তাররা বলে দিয়েছেন, কঠিন পরিশ্রমের কাজ তাঁর সইবে না। এরকম পরিস্থিতিতে, চোখে যখন অন্ধকার দেখছে ফাহিমা, খবর পেল কায়রো মিউজিয়ামে দেখা গেছে মাসুদ রানাকে।

ঘণ্টা দুয়েক চেষ্টা করার পর সে তার মাসুদ ভাইয়ের খোঁজ পেয়ে ফোন করছে, ভরসা, একমাত্র তিনিই যদি আব্বুকে বোঝাতে পারেন।

সব শুনে রানা বলল, 'এ এমন এক নেশা, কাউকে যদি একবার পেয়ে বসে, কারও নিষেধই শুনবে না সে। তবু তুমি যখন এত করে বলছ, আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'তাই করুন, প্লিজ, তাতেই আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।'

পরদিন সকালে 'ঈজিপশিয়ান কালচারাল হেরিটিজ'-এর অফিসে চলে এল রানা। ডক্টর জাওয়াদ এই সরকারী প্রতিষ্ঠানটির প্রধান গবেষক। অফিস সংলগ্ন কোয়ার্টারে জুনিয়র বন্ধু মাসুদ রানাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন ডক্টর। ফাহিমাও উপস্থিত সেখানে, অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে—আব্বুকে নিশ্চয়ই বোঝাতে পারবেন তিনি।

কিন্তু ধীরে ধীরে বিচিত্র একটা অভিজ্ঞতা হচ্ছে তার।

অনেক দিন পর পরস্পরকে পেয়ে পরিবেশ-পরিস্থিতি বেমালুম ভুলে বসল ডক্টর জাওয়াদ আর রানা। দশ সেকেন্ডের মধ্যে কুশল বিনিময় শেষ, তারপরই শুরু পুরাকীর্তি আর প্রত্ন-নিদর্শন সম্পর্কিত সর্বশেষ খবরাখবর বিনিময় পর্ব। এটা বিরতিহীন চলতেই থাকল, দু'জনের কেউই কামরায় ফাহিমার উপস্থিতি সম্পর্কে যেন সচেতন নয়।

ফাহিমা প্রথমে ওদের আশপাশে হাঁটাহাঁটি করল। খানিক পর পর কাশল। এক সময় পিয়নকে দিয়ে চা-বিস্কিট আনাল। কিন্তু কিছুতেই রানার মনোযোগ ফেরাতে পারছে না। যখন ওদেরকে বাধা দেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল সে, শুনতে পেল মাসুদ ভাইকে চাচাপুয়ান স্বর্ণমূর্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আব্বু।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় থাকল ফাহিমা।

ডক্টর জাওয়াদ তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন এই বলে, 'এটা শুধু বিরল নয়, আমার জীবনের শেষ সুযোগ। ওই স্বর্ণমূর্তি আমার চাই, রানা। বেলিয়োকে বলেছি বটে, তবে ওটা আমি বেচব না। যা দাম উঠবে, তার অর্ধেক টাকা তাকে দিয়ে জিনিসটা নিজের

কাছে রেখে দেব আমি। প্রস্তুতি নেয়া হয়ে গেছে, মাই ফ্রেন্ড। কালই আমরা রওনা হচ্ছি।'

'ধারণা করি, কেউ আপনাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওহ্, নো! প্রশ্নই ওঠে না।' আড়চোখে একবার ফাহিমাকে দেখে নিলেন ডক্টর জাওয়াদ।

'কিন্তু শরীর যদি বেঁকে বসে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'শুনলাম ডাক্তাররা আপনাকে এক্সপিডিশনে বেরুতে নিষেধ করেছেন।'

'ডাক্তাররা অমন বলেই। আমার শরীর-স্বাস্থ্যের কথা আমার চেয়ে ভালো আর কেউ জানবে কীভাবে? আমি সম্পূর্ণ ফিট।'

'আপনি সুস্থ্ বোধ করছেন, নিজেকে ফিট বলে মনে করছেন আদর্শ একটা পরিবেশে। কিন্তু পেরুর জঙ্গলে ঢোকার পর পরিবেশটা বদলে যাবে। তখন প্রতি পদে বিপদ দেখা দেবে। সে-সব বিপদ সামলাবার সামর্থ্য আপনার আছে?'

'কেউ যদি সত্যি আমার জন্যে এতটা উদ্বিগ্ন হয়, তার উচিত আমাকে যেতে বাধা না দিয়ে, বরং আমার সঙ্গে যাবার জন্যে তৈরি হওয়া।' ডক্টর জাওয়াদ হাসছেন।

উত্তরে রানা কী বলে শোনার জন্য অপেক্ষা করছে ফাহিমা।

চিন্তা করছে রানা—এই মুহূর্তে অফিশিয়াল কোন কাজ নেই হাতে, চাইলে অনায়াসে বসের অনুমতি পাব; বিশেষ করে ডক্টর জাওয়াদ যখন বিসিআই ডিরেক্টরের প্রিয় ব্যক্তিদের একজন।

'আচ্ছা,' ডক্টর জাওয়াদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল রানা, 'আপনাদের দু'জনের কাছে একটা ম্যাপের অর্ধেকটা করে আছে, এটা আপনারা জানলেন কীভাবে?'

'মানে?' জানতে চাইলেন ডক্টর জাওয়াদ, এতই উত্তেজিত হয়ে আছেন ভদ্রলোক যে কারও কথা খেয়াল করে শুনছেনও না।

'প্রথমে আপনারা কে কার সঙ্গে যোগাযোগ করেন?'

'বেলিয়ো, বেলিয়ো! সেই তো আমাকে চিঠি লিখে জানায় যে

ম্যাপের অর্ধেকটা তার কাছে আছে।'

'বেলিয়ো জানল কীভাবে আপনার কাছে ম্যাপের বাকি অর্ধেকটা আছে?'

'জানল কীভাবে?' কিছুটা বিরক্ত আর অসহায় দেখাল ডক্টর জাওয়াদকে। 'তা তো বলেনি। আমিও এ-ব্যাপারে তাকে কোন প্রশ্ন করিনি। কী দরকার! ম্যাপটা জোড়া লেগেছে, ব্যস, তা-ই যথেষ্ট।'

'প্রসঙ্গটা ওঠা উচিত ছিল। শুনেছি আপনার অনেক শত্রু আছে, আপনিই বলেছেন—বেলিয়োকে তারা কেউ টোপ হিসেবে ব্যবহার করে থাকতে পারে।'

'দূর, কী যে বলো না! বেলিয়ো একজন পেরুভিয়ান, সে আমার শত্রুদের চিনবে কীভাবে! তারা তো হয় ফ্রেঞ্চ, না হয় ইটালিয়ান।'

'তাদের সম্পর্কেও আমার জানা দরকার—মানে, আপনার শত্রুদের সম্পর্কে। কারা তারা?'

'আমার প্রধান শত্রু দুজন,' বললেন ডক্টর জাওয়াদ। 'আলবার্তো টেরেল আর পল ভিত্তেরা।'

একের পর এক প্রশ্ন করে এদের দু'জন সম্পর্কেই যা জানার জেনে নিল রানা তারপর আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে এল, বলল, 'কি করে বুঝবেন বেলিয়ো এদের কারও সঙ্গে হাত মিলিয়ে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকায়নি?'

'আরে নাহ্, এরমধ্যে আবার ষড়যন্ত্র পাকাবার কী আছে! আগেই তো বলা-কওয়া হয়ে গেছে আধাআধি বখরা হবে...'

ডক্টর জাওয়াদের জবাবে খুশি হতে না পারলেও এ-ব্যাপারে তাঁকে আর কিছু বলল না রানা। তবে জানতে চাইল, 'ঠিক কীভাবে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে সে?'

'ম্যাপের যে অর্ধেকটা আমার কাছে আছে সেটার মাপ হলো লম্বায় চার ইঞ্চি আর চওড়ায় তিন ইঞ্চি,' দ্রুত বলে গেলেন প্রখ্যাত আর্কিওলজিস্ট। 'বেলিয়োর কাছেও ঠিক তাই আছে। সে একটা চিঠি লেখে আমাকে, সেই চিঠির খামে ভরে নিজের ম্যাপের ছেঁড়া অংশটার ইঞ্চি দুয়েক আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। চিঠিতে লিখেছিল, "একটা ম্যাপের অর্ধেকটা আমার কাছে আছে, তারই খানিকটা অংশ পাঠালাম; এমন ধারণা করার উপযুক্ত কারণ আছে যে বাকি অর্ধেকটা আছে আপনার কাছে । এখন আমার জানার বিষয় হলো, আপনি কি ইন্টারেস্টেড?" আমি দেখলাম আমার ম্যাপের ছেঁড়া অংশের সঙ্গে খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে তারটা, রেখাগুলোও মিলছে; ব্যস, যৌথ অভিযানের প্রস্তাব দিয়ে দিলাম আমি।'

রানা বলল, 'কই, তার ম্যাপের ছেঁড়া অংশটা দেখান আমাকে, সত্যি কতটা মেলে দেখতে চাই আমি।'

পুরানো একটা ওয়াল সেফ খুলে ম্যাপের টুকরোগুলো বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিলের ডক্টর জাওয়াদ। পরীক্ষা করে দেখে নিশ্চিত হলো রানা, সত্যিই মেলে।

'আমি কিন্তু যাবই যাব। তোমরা যদি ভেবে থাকো...'

ফাহিমার দিকে ফিরল রানা, ডক্টর জাওয়াদকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি তো আর কোন উপায় দেখছি না। কারও কথা শুনবেন না, উনি যাবেনই। কাজেই তাঁর যাতে কোন বিপদ না হয় সেটা দেখার জন্যে মনে হচ্ছে আমাকেও যেতে হবে।'

কথা না বলে রানার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ফাহিমা। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'আপনিও তো দেখছি পাগলামিতে কারও চেয়ে কম যান না!'

'তুমিই বলো, আর কী করার আছে আমার?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফাহিমা বলল, 'আমারও কিছু করার দেখছি না–দুই পাগলকে সামলাবার জন্যে আমাকেও তা হলে যেতেই হয়।'

'ওহ্, মার্ভেলাস!' খুশিতে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন ডক্টর জাওয়াদ। 'নাও, বাপের হাত ধরে এক্সপিডিশনে বেরিয়ে পড়ো। জীবনেও কোনদিন ভুলতে পারবে না এটার কথা।'

সত্যিই, ভুলতে পারেনি রানা বা ফাহিমা!

দুই

গাধাগুলোকে নিয়ে পিছিয়ে পড়েছে ইন্ডিয়ানরা, তাদের উপর নজর রাখার জন্য মুয়াক্কা আর বেলিয়োকে দায়িত্ব দিয়ে লাইনের মাথায় চলে এল রানা, ডক্টর জাওয়াদের পাশে।

ডক্টর জাওয়াদ যে অসুস্থ বোধ করছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর, বাঁশীর মত শব্দ করে নিঃশ্বাস ছাড়ছেন। সবাই ঘামছে, তবে তাঁর মত অতটা নয়--তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে যেন এই মাত্র নদী থেকে ডুব দিয়ে এলেন। এক ঘণ্টা আগে ব্লাডপ্রেশার মেপেছে ফাহিমা–নীচেরটাই ছিল ১৩০-এর ঘরে। পালসও বেড়ে হয়েছে দ্বিগুণ।

অথচ তারপরও চোখাচোখি হলেই সপ্রতিভ একটা ভঙ্গি করে হাসছেন ভদ্রলোক, নিজের সমস্যার কথা কাউকে বুঝতে দিতে চান না।

রানাকে পাশে চলে আসতে দেখে মাথাটা একবার ঝাঁকালেন তিনি, অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে একটু হাসলেন, তারপর ফিরে গেলেন নিজের জগতে। ইটালিয়ান আর্কিওলজিস্ট আলবার্তো টেরেলের কথা ভাবছেন তিনি। কয়েক বছর আগে এই জঙ্গলে ঢুকেছিল সে, নিশ্চয়ই এই একই ট্রেইল ধরে মন্দিরের দিকেও এগিয়েছিল। ডক্টর জাওয়াদ কল্পনার চোখে দেখতে চেষ্টা করলেন মন্দিরের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর কী অবস্থা হয়েছে টেরেলের–বিস্ময়ে বিহ্বল? উল্লাসে উন্মাদ? নাকি–?

তবে যত দক্ষ আর্কিওলজিস্টই হোক টেরেল, সেই অভিযানটা থেকে ফিরতে পারেনি সে। ফলে চাচাপুয়ান মন্দিরের সমস্ত রহস্য এখনও অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। বেচারা টেরেল। এরকম অভিশপ্ত একটা জঙ্গলের ভিতর মৃত্যুবরণ করাটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। ডক্টর জাওয়াদ নিজের জন্য এরকম মৃত্যু কামনা করেন না।

ইতিমধ্যে ডক্টর জাওয়াদকে পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে রানা, এক লাইনে সবাই অনুসরণ করছে ওকে। জঙ্গলটা এখানে বেড়ে উঠেছে একটা ক্যানিয়ন-এর ভিতর, আর ট্রেইলটা পুরানো একটা ক্ষতচিহ্নের মত এগিয়েছে ক্যানিয়নের দেয়াল ধরে। নীচ থেকে এখন পাতলা কুয়াশা উঠছে, রানা জানে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও গাঢ় হবে ওটা। এ-ধরনের কুয়াশাকে ক্যানিয়নের মধ্যে আটকা পড়ে থাকতে দেখেছে রানা, গাছ থেকে গাছে ঝুলে থাকা মাকড়সার জালের মত।

বিরাট একটা তোতা মুহূর্তের জন্য চমকে দিল রানাকে, পরিষ্কার আর স্পষ্ট রঙধনুর মত শরীর নিয়ে ঝোপ থেকে লাফ দিল শূন্যে, তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। এই সময় ইন্ডিয়ানরা আবার কিচিরমিচির শুরু করল, ঘন ঘন হাত নাড়ছে, খোঁচা মারছে পরস্পরকে।

ঘাড় ফিরিয়ে তাদেরকে ধমক লাগাল মুয়াক্কা। আপাতত চুপ

করলেও, রানা জানে সামনে যত এগোবে ওদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ততই কঠিন হয়ে উঠবে। শরীরে চেপে বসা আর্দ্রতার মতই তাদের উদ্বেগ আর ভয় অনুভব করতে পারছে ও।

তবে ইন্ডিয়ানদের চেয়ে পেরুভিয়ান দু'জনকে নিয়েই বেশি চিন্তিত রানা। বিশেষ করে মুয়াঙ্কাকে বেশি ভয় পাচ্ছে। সময় যত গড়াচ্ছে ততই সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করছে ও। মুয়াঙ্কা আর বেলিয়োর মত লোকেরা দু'পাঁচ টাকার জন্য মানুষের গলায় ছুরি চালাতে পারে।

মন্দিরে পৌঁছানোর পর জানা যাবে মানবচরিত্র সম্পর্কে ওর ধারণা কতটা সত্যি কিংবা আদৌ সত্যি কি না।

নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাল রানা। ডক্টর জাওয়াদ ওর একেবারে পিঠের কাছে চলে এসেছেন। হাঁপাচ্ছেন তিনি, তবে সেটা শুধু পরিশ্রমে নয়; তাঁর চঞ্চল দৃষ্টি চারদিকে ছুটোছুটি করছে দেখে বোঝা গেল মন্দিরের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা।

তাঁর এই উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ এবার রানার মধ্যেও ছড়াল, অনুভব করল শরীরের ভিতর উথলে উঠেছে অ্যাড্রেনালিন।

ইন্ডিয়ানরা আবার চেঁচামেচি শুরু করেছে। ডক্টর জাওয়াদের মত তারাও বুঝতে পারছে আর বেশি দূরে নেই মন্দিরটা। ফলে ভয় পাচ্ছে তারা।

সাবধানে এগোচ্ছে রানা। গাছপালার ভিতর দিয়ে দেখা গেল ক্যানিয়নের পাঁচিল অনেকটা পিছিয়ে গেছে। ট্রেইলটা এক রকম অদৃশ্যই বলা যায়—ওটার উপর দিয়ে এগিয়েছে গোছা গোছা লতা, গায়ে ঘন হয়ে জন্মেছে আগাছা, চড়াও হয়েছে পেঁচানো আর মোচড় খাওয়া অসংখ্য শিকড়। ট্রেইলের উপর ঝুলে আছে ঝুরি, গাছের শাখা-প্রশাখা, ঝোপের ডাল আর মাকড়সার জাল। ছোরার চওড়া ফলা দিয়ে ওগুলো কেটে পথ তৈরি করছে রানা।

এভাবে এগোতে হওয়ায় খানিক পরপরই ক্লান্ত হয়ে পড়ছে রানা। থেমে বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছে কয়েক মিনিট।

বিশ্রাম নেওয়ার জন্য রানা থামলে সদ্য-তৈরি পথের উপর বসে পড়ছেন ডক্টর জাওয়াদ। একবার জিজ্ঞেস করলেন, 'খুব বিপদে ফেলে দিয়েছি, না?'

হাসল রানা। 'মোটেও না। আমি এনজয় করছি।'

'এই সামনে, এসে পড়েছি প্রায়,' হাঁপাতে হাঁপাতে জানালেন ডক্টর জাওয়াদ।

রানা খেয়াল করল কুয়াশা গাঢ় হতে শুরু করেছে। এই কুয়াশার জন্য ঠাণ্ডা দায়ী নয়, এটা যেন জঙ্গলের ঘাস থেকে তৈরি হচ্ছে। সরু প্যাসেজ ধরে এগোবার সময় একবার দম আটকাল রানা। আরেকবার দম বন্ধ করল ট্রেইলের শেষ মাথায় পৌঁছে।

এখন দেখা যাচ্ছে।

ওই তো। খানিকটা দূরে, মোটা গাছপালা দিয়ে ঘেরা–প্রাচীন সেই মন্দির।

দম আটকে ফেলেছেন ডক্টর জাওয়াদও। নিঃশব্দে রানার পাশে চলে এলেন তিনি, বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছেন সামনে। এই মুহূর্তটিকে ইতিহাসের একটা শুভযোগ বলে মনে হলো তাঁর, কয়েক হাজার বছরের পুরানো মন্দিরটিকে সভ্যতার কালোত্তীর্ণ একটা প্রতীক হিসাবে দেখছেন। নিজেকে তাঁর অসম্ভব ভাগ্যবান বলে মনে হলো। ভাষা হারিয়ে বোবা হয়ে গেলেন তিনি।

রানাও আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, তবে ওর সংবিৎ ফিরল ইন্ডিয়ানদের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনে। বন করে আধ পাক ঘুরতেই দেখল তিনজন ইন্ডিয়ান গাধাগুলোকে ফেলে ট্রেইল ধরে খিঁচে দৌড়াচ্ছে। পকেট থেকে পিস্তল বের করে তাদের দিকে লক্ষ্যস্থির করছে মুয়াক্কা। খপ করে তার ডান কবজি চেপে ধরল রানা, একটু মোচড়ও দিল, ফলে ঘুরে রানার মুখোমুখি হতে বাধ্য হলো লোকটা।

'না,' বলল রানা।

চোখে অভিযোগ নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে মুয়াক্কা। 'ওরা কাপুরুষ, সিনর রানা।'

'তাতে আমাদের কী,' বলল রানা। 'কাপুরুষ বলেই মেরে ফেলতে হবে?'

পেরুভিয়ান মুয়াক্কা ধীরে ধীরে পিস্তলটা নামাল, তারপর সঙ্গী বেলিয়োকে একবার দেখে নিয়ে আবার রানার দিকে তাকাল। 'ইন্ডিয়ানরা না থাকলে এত সব সাপ্লাই বইবে কে, সিনর? আগেই তো বলে নেয়া হয়েছে যে বেলিয়ো বা আমি মোট বইতে পারব না।'

রানা ভাবল, মুয়াক্কার চোখ দুটো এত ঠাণ্ডা কেন? মনে পড়ল এরকম চোখ আগেও দেখেছে–এই লোক কখনও হাসে বলে বিশ্বাস হয় না। 'সাপ্লাই ফেলে যাচ্ছি আমরা। জিনিসটা ভালোয় ভালোয় পেয়ে গেলে সন্ধ্যার আগেই প্লেন ধরতে পারব বলে আশা করি। কাজেই সাপ্লাই আর দরকার নেই।'

পিস্তলটা নাড়াচাড়া করছে মুয়াক্কা। আঙুল বুলাচ্ছে গায়ে

ট্রিগারের প্রতি দুর্বলতা আছে এই লোকের, কথাটা নিজেকে মনে রাখতে বলল রানা। তিনজন ইন্ডিয়ান বেঁচে না থাকলে তার কিছু আসে যায় না। 'পিস্তলটা সরিয়ে রাখো তুমি,' তাকে নির্দেশ দিল রানা। 'ট্রিগারে আমার নিজের আঙুল থাকলে আলাদা কথা, তা না হলে ওই জিনিসটা আমি সহ্য করতে পারি না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেলিয়োর দিকে তাকাল মুয়াক্কা; দু'জনের মধ্যে নীরবে কোন বার্তা বিনিময় হলো। 'ইয়েস, সিনর।'

সুযোগটা নেবে ওরা নিজেদের পছন্দমত সময়ে, জানে রানা। বাকি দুই ইন্ডিয়ানের দিকে তাকাল ও, বেলিয়োর তাড়া খেয়ে নিজেদের জায়গায় ফিরে এসেছে। দু'জনকেই অসুস্থ দেখাচ্ছে, ভূতে পাওয়া মানুষের মত আচ্ছন্ন।

কুইচুয়া ইন্ডিয়ান তিনজন তীরবেগে ছুটতে ছুটতে এক সময় ক্লান্ত

হয়ে পড়ল, তারপরও তারা থামছে না, কারণ জানে, প্রাচীন মন্দির খুঁজে পাওয়ার রিপোর্টটা সাদা চামড়ার লোকটাকে দিতে পারলে দামী পুরস্কার পাওয়া যাবে। খুব বেশি হলে আর আধ মাইলটাক যেতে পারলেই আশা করা যায় দেখতে পাবে তাকে।

ডক্টর জাওয়াদের পরম শত্রু ফ্রেঞ্চ আর্কিওলজিস্ট পল ভিতেরা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ডক্টর জাওয়াদকে অনুসরণ করছে। খানিক আগে মাইল দুয়েক দূরে ক্যাম্প ফেলেছে সে।

এই মুহূর্তে নিজের তাঁবুর বাইরে অধীর উত্তেজনায় পায়চারি করছে ভিতেরা। বেলিয়ো আসলে তারই রোপণ করা টোপ, সমস্ত খরচ সে-ই বহন করছে, এমনকী মুয়াক্কা আর কুইচুয়া ইন্ডিয়ানদেরও সে ভাড়া করেছে। তার মন গাইছে, এবার যেন ভালো কোন খবর আসার সময় হয়েছে।

ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শুনে পায়চারি থামাল ভিতেরা। ক্যাম্পে প্রচুর বিশ্বস্ত হোভিটস যোদ্ধা রয়েছে, তারা ভিতেরাকে ঘিরে একটা পাঁচিল তৈরি করল, সেই পাঁচিলের ফাঁক গলে ভিতরে ঢুকল তিন কুইচুয়া ইন্ডিয়ান। হাঁপাতে হাঁপাতে ভিতেরার সামনে এসে দাঁড়াল তারা।

'কী খবর আনলে তোমরা, ভালো না মন্দ?' জানতে চাইল ভিতেরা। 'এত হাঁপাচ্ছ কেন?'

'ভূত আমাদের তাড়া করেছে, তাই হাঁপাচ্ছি। তবে খবর আমরা ভালোই এনেছি, হুজুর,' কুইচুয়াদের একজন বলল, সে-ই ওদের নেতা। 'ইচ্ছে করলে বুড়ো জাওয়াদ আর তার দলকে আপনি এখন জবাই করতে পারেন। যদি করেন, দয়া করে কাজটা যেন আমাদেরকে দিয়ে করানো হয়, হুজুর।'

'জবাই?' ভিতেরাকে বিস্মিত দেখাল। 'কেন, ওদেরকে জবাই করতে হবে কেন?'

'ওদের কাজ ফুরিয়েছে, তাই,' জবাব দিল কুইচুয়াদের লিডার। 'আপনি যেটা খুঁজছেন, হুজুর, সে-ই প্রাচীন মন্দিরটা ওরা

পেয়ে গেছে। এখন শুধু ওটার ভেতরে ঢুকে সোনার মূর্তিটা বের করে আনতে হবে আপনাকে।'

ভুরু কোঁচকাল ভিতেরা। 'ব্যাপারটা কী এতই সহজ যে মন্দিরের ভেতর ঢুকলাম আর আর্টিফ্যাক্টটা বের করে আনলাম?' মাথা নাড়ল সে। 'আসল বিপদ তো সব ওই মন্দিরের ভেতর। আমি অপেক্ষা করব। সে-সব বিপদ কাটিয়ে উঠে স্বর্ণমূর্তিটা বের করে আনবে ওরা, তারপর সময়-সুযোগ মত ওদের কাছ থেকে কেড়ে নেব।'

'কিন্তু, হুজুর, সেটা কি উচিত হবে? ওরা যদি...'

'চুপ, একদম চুপ!' কঠিন সুরে ধমকে উঠল ভিতেরা। 'তোমাদেরকে যা করতে বলা হবে ঠিক তাই করবে তোমরা।'

পাখির মত কিচিরমিচির আওয়াজ করে মাথা ঝাঁকাতে লাগল হোভিটস ইন্ডিয়ানরা, ভিতেরার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর কুইচুয়ারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিল ভিতেরার নির্দেশ।

ক্যাম্প তোলার নির্দেশ দিল ভিতেরা, ডক্টর জাওয়াদের কাছাকাছি থাকার একটা তাগাদা অনুভব করছে সে।

ঘাড় ফিরিয়ে আবার মন্দিরটার দিকে তাকাল রানা।

মন্দিরকে ঘিরে কুয়াশা আরও ঘন হচ্ছে; এটা যেন প্রকৃতির একটা ষড়যন্ত্র, জঙ্গল চায় না তার গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাক।

একটা গাছের দিকে ঝুঁকে বাকল থেকে কী যেন একটা টেনে তুলল বেলিয়ো। হাতটা রানার দিকে উঁচু করে ধরল সে। তার হাতে খুদে একটা বর্শা দেখা যাচ্ছে। 'বুঝতে পারছেন তো, সিনর? হোভিটস!'

রানা কিছু বলছে না।

'বিষটা এখনও তাজা–মাত্র তিনদিনের পুরানো, সিনর। তার মানে হোভিটসরা নিশ্চয়ই আশপাশেই আছে আমাদের।'

মাথা নাড়ল রানা, একমত হতে পারছে না। 'বিদেশী

দেখামাত্র হামলা করে তারা।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে চারদিকে তাকাল। 'কোথায়?'

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ওঠার পর ডক্টর জাওয়াদও এখন ভাষা ফিরে পেয়েছেন। মেয়েকে পাশে টেনে নিয়ে হাত তুলে মন্দিরটা দেখাচ্ছেন তিনি। 'কোনও এক্সপিডিশনে এত সহজে সফল হতে খুব কমই দেখা যায়, রে, মা। তোকে নিয়ে সত্যি আমি গর্বিত।'

'কথাগুলো একটু প্রলাপের মত শোনাচ্ছে না কি?' হাসি চেপে বিদ্রূপের সুরে আব্বুকে জিজ্ঞেস করল ফাহিমা। 'যতই তুমি এটাকে আমার এক্সপিডিশন বলে চালাবার চেষ্টা করো, আসলে কথাটা সত্যি নয়। এটা একা শুধু তোমার...'

মাথা নেড়ে, আবৃত্তির সুরে গেয়ে উঠলেন ডক্টর জাওয়াদ, 'তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা—টেগোর এখানে অক্ষরে অক্ষরে...'

বাপ-মেয়ের কথায় কান নেই, বেলিয়োর হাত থেকে খুদে বর্শাটা নিয়ে পরীক্ষা করছে রানা। সূক্ষ্ম কিছু না হলেও, কাজের জিনিস বটে। জংলী হোভিটসদের কথা ভাবছে ও। উগ্র আর হিংস্র হিসাবে কুখ্যাতি কিনেছে তারা, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এই মন্দিরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বহু শতাব্দীর।

কুসংস্কারের কারণে মন্দিরের কাছ থেকে দূরে সরে থাকে হোভিটসরা। নিজেরা তো ধারে কাছে ঘেঁষেই না, অন্য কাউকে এদিকে আসতে দেখলেও আগাম কিছু বুঝতে না দিয়ে খুন করার জন্য অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

'আজ আপনার স্বপ্ন পূরণের দিন, ডক্টর জাওয়াদ,' বলল রানা। 'কাজেই আমাদেরকে এবার আপনিই পথ দেখান।'

দলটা আবার রওনা হতে সামান্য পিছিয়ে পড়ল রানা। 'কথাটা যখন উঠেছেই,' বেলিয়োর কানে ফিসফিস করল ও, 'একটু দেখা দবকার হোভিটসরা সত্যি পিছু নিয়েছে কি না।'

লাইনের সামনে থাকায় ডক্টর জাওয়াদকে ঝোপ-ঝাড়, গাছের শাখা-প্রশাখা কেটে পথ তৈরি করে নিতে হচ্ছে। তবে দেখা গেল মুয়াক্কা সাহায্য করছে তাঁকে। একটু পর ফাহিমাও ঝুলে থাকা ডালপালা কাটায় হাত লাগাল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘেমে গোসল হয়ে গেল সবাই। সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে এলোপাতাড়ি ভঙ্গিতে শুয়ে থাকা অসংখ্য শিকড়, ঘ্যাচঘ্যাঁচ করে বেশ কিছুক্ষণ ছুরি না চালালে একটাও কাটা যায় না।

পিছিয়ে আসার পর দুই পেরুভিয়ানের উপর নজর রাখতে সুবিধে হচ্ছে রানার। তাদের চঞ্চল ভাব বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না ওর। চোখের কোণ দিয়ে একজন ইন্ডিয়ানকে দেখতে পেল ও, শাখা-প্রশাখা সহ বিরাট একটা গাছের ডাল ট্রেইল থেকে টেনে সরিয়ে আনছে। আরেক ইন্ডিয়ানের কথা মনে পড়ে গেল... কোথায় সে? এদিক ওদিক তাকাচ্ছে ও, এই সময় তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকারটা কানে ঢুকল।

ঘুরে তাকাতে যাবে রানা, প্রচণ্ড একটা ঝড়ের মত পাশ কাটাল ওকে ইন্ডিয়ান লোকটা, দুর্বোধ্য ভাষায় বিরতিহীন চিৎকার করছে, ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে সদ্য ছেড়ে আসা মোটা ডালটা। চোখের পলকে ঘন জঙ্গলের ভিতর হারিয়ে গেল সে।

লোকটা গায়েব হয়েছে পাঁচ সেকেন্ডও হয়নি, আরেকটা তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল সেই একই ডালের শাখা-প্রশাখার ভিতর থেকে। পাতার আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বাইরে বেরুল দ্বিতীয় ইন্ডিয়ান, সে-ও তার সঙ্গীর পিছু নিয়ে ছুটল, ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে ট্রেইলের পাশে পড়ে থাকা শাখা-প্রশাখার দিকে।

হাতের ছুরিটা বাগিয়ে ধরে ডালটার দিকে এগোল রানা ভিতরে কী এমন আছে যে ভূত দেখার মত ভয় পেল ইন্ডিয়ানরা?

কয়েকটা সরু ডাল কেটে ভিতরে তাকাল রানা, কেউ হামলা করলে সামলাবার জন্য তৈরি–ঘ্যাঁচ করে পেটে ঢুকিয়ে দেবে

ছুরিটা।

ঘন, আলোড়িত কুয়াশার ভিতর বসে আছে শয়তানটা।

পাথর কেটে তৈরি, সহস্র বছরের পুরানো, যেন কোন ভয়ানক দুঃস্বপ্ন থেকে উঠে আসা, চাচাপুয়ান দুষ্ট আত্মার মূর্তি।

এক সেকেন্ড মূর্তিটা দেখল রানা, অনুভব করল ওটার স্থির মুখে ফুটে আছে মানুষের ক্ষতি করার উদগ্র ইচ্ছা। সন্দেহ নেই এখানে এটাকে মন্দির পাহারা দেওয়ার জন্য রাখা হয়েছে, এই পথে কেউ এলে ভয় পেয়ে যাতে পালায়।

লাইনের সামনে থেকে আঁতকে ওঠার আওয়াজ ভেসে এল। মুয়াক্কা আর ফাহিমার গলা শুনতে পেল রানা। আরেকটা ভাস্কর্য দেখতে পেয়েছে ওরা। এটাও দুষ্ট কোন আত্মার প্রতিমূর্তি।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ওর সামনের মূর্তিটা যেন ওকে বলছে: 'কী? এখনও টের পাচ্ছ না?'

কী এক প্রবল আকর্ষণ অনুভব করল রানা। ইচ্ছে হচ্ছে মূর্তিটাকে একবার ছোঁয়। নিজেকে বোঝাল, এটা শুধুই একটা প্রাচীন শিল্পকর্ম, অবশ্যই এটার কোন শক্তি নেই। হাতটা লম্বা করল ও। ছুঁয়ে দিল দুষ্ট আত্মার ঠাণ্ডা কাঁধ।

হঠাৎ ব্যাপারটা উপলব্ধি করল রানা। অত্যন্ত বিপজ্জনক কিছু। এই মূর্তির চেয়ে অনেক বেশি অশুভ অনেক বেশি গা ছমছমে।

নীরবতা।

ভৌতিক নিস্তব্ধতা।

এতটুকু বাতাস নেই। কিছু নড়ছে না। কোন শব্দ হচ্ছে না—না ডাকছে কোন পশু-পাখি, না একটা পোকা। জায়গাটা যেন নিষ্প্রাণ, সব কিছু স্থির আর শব্দহীন করে দেওয়া হয়েছে।

নিজের কপাল ছুঁলো রানা। ঠাণ্ডা ঘাম। কেউ নেই, কিছু নড়ছে না, অথচ কাদের যেন অশরীরী উপস্থিতি টের পাচ্ছে ও। এ-ধরনের নিস্তব্ধতাই সৃষ্টির আগে ছিল বলে কল্পনা করে মানুষ

মূর্তিটাকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগোল রানা, দুই পেরুভিয়ান

মুয়াক্কা আর বেলিয়োকে ডক্টর জাওয়াদের সঙ্গে কথা বলতে শুনছে। দু'জনকেই ভীত-সন্ত্রস্ত বলে মনে হলো।

'ঈশ্বরের দোহাই, কী ওটা?' বেসুরো গালায় জানতে চাইল মুয়াক্কা।

অসুস্থ আর ক্লান্ত ডক্টর জাওয়াদের দুর্বল হাসির আওয়াজ ভেসে এল। 'কী আবার, তুচ্ছ একটা মূর্তি। কেন, তুমি জানো না—চাচাপুয়ানদের ঘরে ঘরে এ-ধরনের একটা করে মূর্তি রাখা হত?'

'এই একটা দোষ আপনাদের, সিনর জাওয়াদ,' মুয়াক্কাকে বলতে শুনল রানা। 'সব কিছুকে হালকা ভাবে নেন।'

'আব্বুকে আপনারা বেশি কথা বলাবেন না,' প্রতিবাদের সুরে বলল ফাহিমা। 'দেখছেন না, উনি অসুস্থ?'

'তা হলে তো বলতে হয় এরকম একটা অভিযানে আসাই উচিত হয়নি সিনরের,' বলল মুয়াক্কা।

'কোন্‌টা উচিত সেটা তোমার কাছ থেকে জানতে হবে নাকি, মুয়াক্কা?' পিছন থেকে কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

এভাবে হঠাৎ ওর ফিরে আসায় চমকে উঠল মুয়াক্কা। 'না, মানে, আমি তো সবার ভালোর জন্যেই বলছি...'

'নিজেদের কীসে ভালো, সেটা আমরা জানি,' বলে তাকে থামিয়ে দিল রানা। চোখাচোখি হতে নিঃশব্দে ফাহিমাকে একটা সঙ্কেত দিল ও, তারপর সবাইকে পাশ কাটিয়ে লাইনের একেবারে সামনে চলে এল।

কুয়াশার আচরণ আর গতিবিধি বিচিত্র। মাটি ঘেঁষে ঢেউ-এর মত ছুটছে কোথাও, কোথাও টগবগ করে ফোটার ভঙ্গি নিয়েছে, আবার দেখা যাচ্ছে নিরেট আর সচল পাঁচিল হয়ে চাপা দিতে চাইছে ওদের পাঁচজনকে।

বাষ্পের ভিতর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করল রানা, তাকিয়ে আছে মন্দিরের প্রবেশ পথের দিকে। প্রাচীন পাঁচিলের দু'পাশের মাথা

লতাপাতা, ঝোপ আর গাছের ডালে প্রায় ঢাকা। তবে দৃষ্টি কেড়ে নিল প্রবেশপথের মুখটা–খোলা ওটা, পুরোপুরি গোলাকার, ঠিক যেন একটা মরা মানুষের হাঁ করা মুখ।

নাকের ডগায় চশমাটা ভালো করে বসিয়ে নিয়ে তাকাতে ডক্টর জাওয়াদও এবার দেখতে পেলেন মুখটা। আবার তাঁর আলবার্তো টেরেলের কথা মনে পড়ে গেল–এই অন্ধকার মুখের ভিতর ঢুকে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছে সে। বেচারা!

আলোড়িত কুয়াশার ভিতর দিয়ে মন্দিরে ঢোকার প্রকাণ্ড গুহামুখ মুয়াক্কাও দেখছে। হঠাৎ রানার দিকে ঘুরে গেল সে। 'কিন্তু আপনাদেরকে আমরা বিশ্বাস করি কীভাবে, সিনর রানা? এখান থেকে প্রাণ নিয়ে কেউ ফিরে যেতে পারেনি। কী কারণে আপনাদের ওপর আস্থা রাখব আমরা?'

লোকটার দিকে চেয়ে হাসল রানা। 'মুয়াক্কা, তোমাকে শিখতে হবে, বিদেশীরাও মাঝে-মধ্যে সত্যি কথা বলে।' শার্টের পকেট থেকে ভাঁজ করা একটুকরো পার্চমেন্ট বের করল। এই বিশেষ মুহূর্তে দুই পেরুভিয়ানকে খুঁটিয়ে দেখছে ও। নগ্ন লোভে চকচক করছে দু'জোড়া চোখ। কে জানে কাকে জবাই করে মানচিত্রের বাকি অর্ধেকটা যোগাড় করেছে তারা।

মানচিত্রের দুটো অংশ এক করে মেলাবার কাজটা ডক্টর জাওয়াদকে দিয়ে করাতে চায়নি রানা, কারণ তাঁর সরলতা আর দুর্বল দৃষ্টিশক্তির সুযোগ নিয়ে পেরুভিয়ানরা কারচুপি বা প্রতারণা করতে পারে বলে সন্দেহ হয়েছে ওর।

'আশা করি এটা,' পার্চমেন্টটা মুয়াক্কাকে দেখাল রানা, 'তোমার মনে আস্থা সৃষ্টি করবে।' উবু হয়ে বসল ও, ভাঁজ খুলে মাটিতে বিছাল সেটা।

একই ধরনের একটুকরো পার্চমেন্ট বের করল বেলিয়ো, সে-ও উবু হয়ে বসে রানার পার্চমেন্টের পাশে ভাঁজ খুলল সেটার। দুটো টুকরো নিখুঁত ভাবে জোড়া লেগে গেল। একটু ঝুঁকে

বেলিয়োর টুকরোটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা। না, ঠিকই আছে।

কয়েক সেকেন্ড কারও মুখে কথা নেই; রানা জানে সতর্কতার শেষ সীমায় পৌঁছে যাওয়া হয়েছে, এবার কিছু ঘটবে; কী ঘটে দেখার জন্য অপেক্ষা করছে ও।

ওর ইঙ্গিত পেয়ে আব্বুকে নিয়ে আগেই পিছিয়ে গেছে ফাহিমা।

'তো, বন্ধুরা,' শুরু করল বেলিয়ো, 'এই মুহূর্ত থেকে আমরা পরস্পরের পার্টনার হলাম। দুই পক্ষের জন্যে প্রথমেই যেটা জরুরি ছিল, জানা গেল সেটা আমাদের কাছে আছে। এই ফ্লোর প্ল্যান ছাড়া মন্দিরে ঢোকার কথা চিন্তা করা যায় না। আমরা এমন একটা জিনিস জোড়া লাগিয়েছি, সম্ভবত গত দুই হাজার বছর ধরে যেটা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। এখন আমরা আসল কাজে হাত দিতে পারি। পিলারটাকে কোণ ধরে নিয়ে...'

বেলিয়োর কথা শেষ হওয়ার আগেই–রানা যেন স্লো মোশনে দেখতে পাচ্ছে–বেল্টে গোঁজা রুপালি বাঁট লাগানো পিস্তলটা টেনে বের করছে মুয়াক্কা।

যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে, এক লাফে সিধে হয়েই ছুঁড়ে দিয়েছে হাতের ছুরি।

ওর ক্ষিপ্রতা চোখ দিয়ে অনুসরণ করতে পারল না মুয়াক্কা। হাতল ধরে পিস্তলটা বেল্ট থেকে বের করে এনেছে সে, রানার দিকে ঘুরিয়ে ট্রিগার টানতে যাবে, এই সময় কবজিতে গেঁথে গেল ছুরির ফলা।

পিস্তলটা খসে পড়ল মুয়াক্কার আঙুল থেকে। তীব্র ব্যথায় ককিয়ে উঠে ঘন ঘন হাত ঝাপটাচ্ছে সে। ছিটকে পড়ে গেল ছুরি। হঠাৎ সেটাকে টপকে প্রাণপণে দৌড় দিল সে, যে-পথে কুইচুয়া ইন্ডিয়ানরা পালিয়েছে সেই পথে।

সবই দেখলেন, তারপর এগিয়ে এসে পিস্তলটা তুলে নিলেন ডক্টর জাওয়াদ। বেলিয়োর দিকে ফিরল রানা। ঝট করে মাথার

উপর হাত তুলল লোকটা।

'সিনর, প্লিজ,' বলল সে। 'মুয়াক্কার মনে কী ছিল না ছিল তার কিছুই আমি জানি না। আসল কথা হলো, ওটা একটা পাগল। তার কুমতলবটাও ছিল স্রেফ পাগলামি প্লিজ, সিনর, আমার কথা বিশ্বাস করুন।'

'যেভাবে একে একে সবাই পালাচ্ছে আর বেঈমানী করছে, তাতে আর কাউকে বিশ্বাস করি কীভাবে,' বলল রানা। 'সত্যি করে বলো তো, কার হয়ে কাজ করছ তোমরা? ভিতেরা, না?'

প্রায় ইঞ্চি দুয়েক জিভ বের করল বেলিয়ো। 'ছি-ছি, সিনর, না! মা মেরি আর ঈশ্বরপুত্র যিশুর কসম, আমি অন্তত কারও হয়ে কাজ করছি না। ভিতেরা? এই নামই তো আগে কখনও শুনিনি আমি।'

এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা ঝাঁকাল রানা। প্রথমে মানচিত্রের টুকরো দুটো, তারপর ছুরিটা তুলে নিল ও। 'হাত দুটো তুমি নামাতে পারো, বেলিয়ো।'

বেলিয়োর চেহারায় স্বস্তি ফিরে এল। আড়ষ্ট হয়ে ওঠা হাত দুটো ধীরে ধীরে নামাল সে।

'ফ্লোর প্ল্যান যখন জোড়া লেগেছে,' ডক্টর জাওয়াদের সামনে এসে বলল রানা, 'আমরা তা হলে এখন মন্দিরে ঢুকতে পারি, তাই না?'

'তা পারি, তবে এ-ও মনে রাখতে হবে যে এখন থেকেই শুরু হতে যাচ্ছে আসল বিপদ। গুহাটা কত লম্বা কে জানে! সহজে যাতে কেউ মন্দিরটায় পৌঁছতে না পারে, চাচাপুয়ানরা সে ব্যবস্থা ভালো ভাবেই করে রেখে গেছে—অন্তত আমার তাই বিশ্বাস।'

ফাহিমা বলল, 'আব্বু, মাসুদ ভাইকে তোমার একটা ধন্যবাদ দেয়া উচিত না? দেখলে না তোমার লোকজন পিস্তল বের করে মাসুদ ভাইকে...'

'শুধু রানাকে নয়, সুযোগ পেলে ওই ব্যাটা মুয়াক্কা

আমাদেরকেও ছাড়ত না,' বললেন ডক্টর জাওয়াদ। 'তবে ওকে আমার ধন্যবাদ দেয়ার কী আছে, ইচ্ছে করলে তুমি কৃতজ্ঞতা জানাতে পারো।'

'আ-আমি?'

'হ্যাঁ, তুমি।' হাসছেন ডক্টর জাওয়াদ। 'আমি যে রানার সিনিয়র বন্ধু–ধন্যবাদ দেয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের একদমই মানায় না। ওই কাজটা তোমাকেই সারতে হবে।'

'ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা, কিছুরই দরকার নেই,' বলল রানা। 'শুধু মনে রাখতে হবে, জায়গাটা বিপজ্জনক, যখন যা বলব সব যেন বিনা তর্কে মেনে নেয়া হয়।' কথা শেষ করে মন্দিরে ঢোকার পথটার দিকে ঘুরে গেল ও।

'কী বললে?' আহত মুয়াক্কার প্রতি সহানুভূতি জানানো তো দূরের কথা, তার রিপোর্ট শুনে ভয়ানক খেপে উঠল পল ভিতেরা। 'রানার বিরুদ্ধে তুমি পিস্তল তুলেছ? ওহ্, গড, এত সাহস তোমার হলো কী করে! এই বাস্টার্ড, তুমি ওকে চেনো? জানো রানা আমার কি উপকারে লাগতে যাচ্ছে? সে-ই একমাত্র ভরসা, ডক্টর জাওয়াদকে কেউ যদি মূর্তিটা পাইয়ে দিতে পারে, তা হলে ওই লোকটাই পারবে। সে মারা গেলে ওই মূর্তি পাওয়ার আশা চিরকালের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে আমাদেরকে।'

'না, মানে,' থতমত খেয়ে শুরু করল মুয়াক্কা, 'ভাবলাম আমি যদি তাকে মারতে পারি আপনি খুব খুশি হবেন...'

'এই, কে আছিস!' হঠাৎ হোভিটসদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল ভিতেরা। 'এই শালা বানচোতকে আগে বাঁধ! তারপর চিন্তা করে দেখছি ওর গাধামির জন্যে কী শাস্তি দেয়া যায়।'

বাতাসে সহস্র বছরের সুবাস মিশে আছে–যুগ যুগ ধরে আটকে

থাকা নিস্তব্ধতা আর অন্ধকারের খোশবু, জঙ্গল থেকে ভেসে আসা আর্দ্রতার গন্ধ, পচন ধরা লতা-গুল্মের মৃদু ঝাঁঝ।

সিলিং থেকে টপ টপ করে পানির ফোঁটা পড়ছে, শ্যাওলার ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে পথ তৈরি করে নিচ্ছে অনেকগুলো সরু ধারা। চওড়া প্যাসেজে ফিসফিস আওয়াজ–ওগুলো আসলে ইঁদুর, গিরগিটি, টিকটিকি আর কাঠবিড়ালির ছুটোছুটির শব্দ।

সূর্যের আঁচ পায়নি বাতাস, চিরকাল ছায়ার ভিতর ঘোরাফেরা, তাই খুব ঠাণ্ডা। সবার আগে রয়েছে রানা, ওর ঠিক পিছনেই বেলিয়ো। বেলিয়োর পিছনে ফাহিমা আর ডক্টর জাওয়াদ পাশাপাশি। ওদের সবার পদশব্দের প্রতিধ্বনি আসছে রানার কানে।

প্যাসেজের দেওয়াল পাথরের তৈরি। দুই দেওয়ালের নীচের দিকে, মেঝে থেকে এক ফুট উপরে, আধ হাত চওড়া কারনিস দেখা যাচ্ছে। মেঝে থেকে এত নীচে এ-ধরনের কারনিস আগে কখনও দেখেনি রানা। নিশ্চয়ই কোন কারণে এটা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু কী সেটা?

ফাহিমা আর বেলিয়োর হাতে মশাল জ্বলছে। সেই আলোয় নিজের ছায়াকে দৈত্য হয়ে উঠতে দেখছে রানা। প্যাসেজ কখনও মোচড় খেয়ে এগিয়েছে, কখনও বাঁক নিয়ে। যেভাবেই এগোক, কারনিস দুটো আছেই। মাঝে মধ্যে থামল রানা, মশালের আলোয় মানচিত্রটা দেখে নিল। খুব তেষ্টা পেয়েছে ওর, তবে দাঁড়াতে রাজি নয়। খুলির ভিতর একটা ঘড়ির টিক টিক শুনতে পাচ্ছে ও, প্রতি টিক বলে দিচ্ছে–সময় নেই, রানা! তোমার হাতে সময় নেই...

পাঁচিল কেটে চওড়া তাক তৈরি করা হয়েছে, একের পর এক ওগুলোকে পাশ কাটাচ্ছে ওরা। দু'একবার থামল রানা, তাকে সাজিয়ে রাখা আর্টিফ্যাক্টগুলো পরীক্ষা করে দেখল। খুব অল্পই পছন্দ হলো ওর. বেশিরভাগই আকারে খুব ছোট, পকেটে

অনায়াসে জায়গা করে নিচ্ছে—ধাতব মুদ্রা, পদক, মাদুলী, মৃৎপাত্রের টুকরো ইত্যাদি। এগুলোর কালেকশন ভ্যালু প্রচুর হলেও, ডক্টর জাওয়াদ যেটার জন্য এসেছেন সেই স্বর্ণমূর্তির কোন তুলনা চলে না।

শেষ পর্যন্ত স্বর্ণমূর্তি যদি পাওয়া না যায়, এগুলো দিয়ে ডক্টর জাওয়াদকে সান্ত্বনা দেওয়া যাবে।

হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল রানা, ওর সঙ্গে থাকার জন্য বেলিয়োকে প্রায় দৌড়াতে হচ্ছে। রীতিমত হাঁপাচ্ছে সে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল রানা।

ধাক্কা খেতে যাচ্ছিল বেলিয়ো, কোনরকমে সামলে নিয়ে জানতে চাইল, 'আমরা থামলাম কেন?' নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ ছাড়ছে। কোনও শব্দ করছে না রানা, দাঁড়িয়ে আছে অটল একটা মূর্তি, নিঃশ্বাস ফেলছে নাম মাত্র।

তিন

বিমূঢ় বেলিয়ো রানার দিকে এক পা এগোল, হাত বাড়াল রানার কনুই স্পর্শ করার জন্য, কিন্তু হঠাৎ সে-ও নিষ্প্রাণ হয়ে গেল, শূন্যে স্থির হয়ে আছে বাড়ানো হাতটা।

রানার পিঠে প্রকাণ্ড একটা কালো ট্যার‍্যানটিউলা হাঁটছে, পাগল করা ধীর গতিতে। ওটার পায়ের স্পর্শ অনুভব করছে রানা, গুটি গুটি এগোচ্ছে খোলা ঘাড়ের চামড়ার দিকে।

অপেক্ষা করছে রানা। মনে হলো যুগ যুগ পার হয়ে যাচ্ছে।

অপেক্ষা করছে যতক্ষণ না ওটা ওর কাঁধে উঠে আসে। বেলিয়োর আতঙ্ক টের পাচ্ছে ও, জানে যে-কোন মুহূর্তে হয় লাফ দেবে লোকটা, নয়তো চেঁচিয়ে উঠবে। দ্রুত কিছু একটা করতে হবে ওকে, তবে সাবধানে–বেলিয়ো যাতে দৌড় না দেয়।

কাঁধে উঠে আসছে বিষাক্ত মাকড়সা। এখনই সময়। নড়াচড়ায় এতটুকু বিরতি না দিয়ে কাঁধের কাছে হাত তুলল রানা, ক্ষিপ্র একটা ঝাপটায় বিপদটাকে ঝেড়ে ফেলল। ছায়ায় পড়ে হারিয়ে গেল সেটা। স্বস্তির পরশ নিয়ে সামনে এগোতে যাবে, শুনতে পেল হঠাৎ সশব্দে নিঃশ্বাস আটকাল বেলিয়ো।

ঘাড় ফেরাল রানা। দেখল পেরুভিয়ান লোকটার হাতে আরও একজোড়া মাকড়সা। এক সেকেন্ডও দেরি না করে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে সবেগে ঝাপটা মারল ও। দুটোই এক সঙ্গে ছিটকে পড়ল মাটিতে। তাড়াতাড়ি সেগুলোকে বুটের তলায় পিষল রানা।

ফ্যাকাসে বেলিয়োকে দেখে মনে হলো জ্ঞান হারাবে সে। কাঁধ ধরে তাকে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করল রানা। ভয় কাটিয়ে একটু পরেই সামলে নিল সে।

ইতিমধ্যে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ফাহিমা আর ডক্টর জাওয়াদ। হাত তুলে সামনে ছোট একটা চেম্বার দেখাল রানা ওদেরকে। চেম্বারের ভিতরটা আলোকিত হয়ে আছে এক ফালি রোদের আলোয়। সিলিঙের একটা ফাটল দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে ফালিটা। মারাত্মক ট্যার‍্যানটিউলার কথা মন থেকে মুছে গেল; রানা জানে সামনে আরও অনেক বিপদ ওত পেতে আছে।

'যথেষ্ট হয়েছে, সিনর,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল বেলিয়ো। 'চলুন, ফিরে যাই।'

রানা কিছু বলছে না। চেম্বারটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ও, মাথার ভিতর এরইমধ্যে কাজ শুরু হয়ে গেছে। কল্পনার রথে চড়ে এমন জায়গায় চলে গেছে রানা, যেখানে যাওয়ার কথা

খুব কম লোকই ভাববে। কয়েক সহস্র বছর আগে যে লোকেরা এই জায়গাটা তৈরি করেছে, ও যেন তাদের মনের ভিতর ঢুকে পড়েছে। জানা কথা, মন্দিরের গুপ্তধন রক্ষা করতে চেয়েছিল তারা। সেজন্য নানা রকম প্রতিবন্ধকতা আর ফাঁদের ব্যবস্থা করে রেখেছে, মন্দিরের মাঝখানটায় কেউ যাতে পৌঁছাতে না পারে।

চেম্বারের আরও কাছে সরে আসছে রানা, শিকারীর মত সাবধানে এগোচ্ছে, চাক্ষুষ করার আগেই টের পাচ্ছে বিপদের উপস্থিতি। ঝুঁকল ও। মেঝেটা হাতড়াল। ছোট একটা আগাছা ঠেকল হাতে, টান দিতে শিকড়সহ উঠে এল হাতে। আরেকটু সামনে এগিয়ে চেম্বারের ভিতর ছুঁড়ে দিল ওটা।

সঙ্গে সঙ্গে, আধ সেকেন্ড, কিছুই ঘটল না। তারপর অস্পষ্ট ঘড় ঘড় আওয়াজ ভেসে এল, সেই সঙ্গে চেম্বারের দু'দিকের দেয়াল ফাঁক হতে শুরু করল। সেই ফাঁক থেকে বেরিয়ে এল দৈত্যাকার মেটাল স্পাইক–খুনি হাঙরের চোয়ালের মত, চেম্বারের মাঝখানে পরস্পরের সঙ্গে খাপে খাপে মিলে গেল।

ঘাড় ফিরিয়ে ডক্টর জাওয়াদের উদ্দেশে নিঃশব্দে হাসল রানা। মন্দিরের যারা ডিজাইন করেছে, মনে মনে তাদের প্রশংসা করল ও–ভয়ানক ফাঁদটার মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় মেলে।

বেলিয়ো দেব-দেবির কাছে নিজের পাপের কথা স্বীকার করে ক্ষমা চাইছে। কিছু বলতে যাবে রানা, ওকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সামনে বাড়লেন ডক্টর জাওয়াদ, উত্তেজনায় আর পরিশ্রমে খক খক করে কাশছেন অনবরত।

'কী হলো, প্রেশারটা মাপতে দেবে না?' পিছন থেকে বিরক্ত হয়ে জানতে চাইল ফাহিমা।

'চুপ!' বলে আরেকটু এগিয়ে চেম্বারের ভিতর উঁকি দিলেন ডক্টর জাওয়াদ।

তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে এতক্ষণে রানাও খেয়াল করল ব্যাপারটা–এক কোণে লম্বা স্পাইকগুলোর মাঝখানে কী যেন

একটা আটকে রয়েছে। বেশি সময় লাগল না আকৃতি দেখেই বোঝা গেল লোহার শিকগুলোর মাঝখানে আটকে রয়েছে, ওটা একটা মানুষ।

'আলবার্তো টেরেল!' বিড়বিড় করলেন ডক্টর জাওয়াদ।

অর্ধেকটা কঙ্কাল। বাকি অর্ধেক শুকনো মাংস চেম্বারের তাপমাত্রা অত্যন্ত কম হওয়ায় বিকৃত মুখ দেখা যাচ্ছে, কাতর বিস্ময়ের ছাপ এখনও স্পষ্ট। এ-ধরনের মৃত্যু কারুরই কাম্য নয় সহানুভূতি আর শোক অনুভব করলেন ডক্টর জাওয়াদ।

তাঁকে পাশ কাটিয়ে চেম্বারে ঢুকল রানা স্পাইকের ডগা থেকে লোকটার অবশিষ্ট অংশ ছাড়াল, তারপর সেটাকে শুইয়ে দিল মেঝেতে।

'এই লোককে আপনারা চেনেন?' জানতে চাইল বেলিয়ো।

'হ্যাঁ, আমি চিনি,' বললেন ডক্টর জাওয়াদ।

বুকে আবার ক্রসচিহ্ন আঁকল পেরুভিয়ান লোকটা। 'আমি আবার বলছি, সিনর, আমাদের আর সামনে এগোনো উচিত হবে না।'

'সামান্য একটা মৃত্যু দেখে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছ, বেলিয়ো?' মেটাল স্পাইকগুলোকে ধীরে ধীরে পিছু হটতে দেখছে রানা। যেখান থেকে বেরিয়েছে সেখানেই আবার ফিরে যাচ্ছে।

কথা বলবে কি, ঠক-ঠক করে কাঁপছে বেলিয়ো। হু-হু করে ঘামছে সে। অভয় দেওয়ার জন্য তার কাঁধে একবার একটা হাত রাখল রানা, তারপর চেম্বারের ভিতর ঢুকে পড়ল। ওর পিছু নিল বেলিয়ো, আপন মনে বিড় বিড় করছে। চেম্বারটা পেরিয়ে প্রায় পঞ্চাশ ফুট লম্বা একটা প্যাসেজে বেরিয়ে এল ওরা। শেষ মাথায় একটা দরজা দেখা যাচ্ছে, উপর থেকে ঝলমলে রোদ নেমে এসেছে এখানে।

'পৌঁছে গেছি!' ফিসফিস করলেন ডক্টর জাওয়াদ। 'প্রায় পৌঁছে গেছি।'

থামল রানা। ভাঁজ খুলে আবার দেখে নিল মানচিত্রটা। সেটা রেখে দেওয়ার পরও নড়ছে না, জায়গাটার উপর চোখ ঘুরিয়ে বুঝতে চাইছে আর কোন বাধা বা ফাঁদ আছে কিনা।

'দেখে তো নিরাপদই মনে হচ্ছে,' বলল বেলিয়ো।

'সেজন্যেই ভয় পাচ্ছি।'

'দূর, এখানে কিছু নেই! চলুন, যাই,' আবার বলল বেলিয়ো। হঠাৎ ধৈর্য হারিয়ে ফেলল সে, পা বাড়াল সামনে।

ডান পা মেঝের সারফেস ভেদ করছে দেখে থেমে গেল বেলিয়ো। ওড়ার ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকছে সে, আতঙ্কে চেঁচাচ্ছে। দ্রুত এগিয়ে এসে খপ করে তার কোমরের বেল্টটা ধরে ফেলল রানা, টেনে আনল নিরাপদ জায়গায়। শক্ত মেঝেতে ঢলে পড়ল বেলিয়ো; হাঁপাচ্ছে, ফোঁপাচ্ছে।

মেঝের দিকে তাকাল রানা, যে অংশটা টেনে নিচ্ছিল বেলিয়োকে। কিছু না, অবিশ্বাস্য আকৃতির ঘন বুনোট মাকড়সার জাল। সেই প্রাচীন কাল থেকে জালের উপর তৈরি হয়েছে জাল। তার উপর পড়েছে ধুলোর আস্তরণ, ফলে মূল মেঝের সঙ্গে মিলে গেছে ধূসর রঙটা। ঝুঁকে একটা নুড়ি পাথর তুলল রানা, তারপর সেটা মাকড়সার জালের দিকে ছুঁড়ল। জাল ছিঁড়ে নেমে গেল পাথরটা। কোন শব্দ হলো না, ফিরে এল না কোন প্রতিধ্বনি।

'ভীষণ গভীর তো!' বিড়বিড় করল রানা।

কোন রকমে সিধে হলো বেলিয়ো, তার পা এখনও ঠকঠক করে কাঁপছে। সামনে কী আছে দেখার জন্য আরেকটু এগোবার চেষ্টা করছেন ডক্টর জাওয়াদ, তবে ফাহিমা তাঁর হাত ধরে থাকায় সুবিধে করতে পারছেন না।

মাকড়সার জালের উপর দিয়ে রোদ ঝলমলে দরজার দিকে ছুটে গেল রানার দৃষ্টি। মেঝে বলে যেখানে কিছু নেই, সেই জায়গাটা পেরুবে কীভাবে?

'এবার বোধহয় আমাদের সত্যি ফিরে যাওয়া উচিত, তাই না,

মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল ফাহিমা।

'পাগল নাকি!' মাথা নাড়ছেন ডক্টর জাওয়াদ।

'না, কেন?' বলল রানা। 'আমরা তো খালি হাতে ফিরব বলে আসিনি।'

'কীভাবে এগোবেন, শুনি?' জিজ্ঞেস করল ফাহিমা। 'আমাদের কি ডানা গজাবে?'

'ওড়ার জন্যে যে সবসময় ডানা লাগে, তা নয়,' বলল রানা।

কুণ্ডলী পাকানো নাইলনের রশিটা কাঁধ থেকে নামাল রানা। সিলিঙের দিকে চোখ রেখে চামড়ার দস্তানা পরছে হাতে। ছাদে নানা আকৃতির কড়িকাঠ দেখা যাচ্ছে। ওগুলো পচে গিয়ে থাকতে পারে, ভাবল রানা। আবার হয়তো এখনও যথেষ্ট শক্ত, একজন লোকের ভার অবশ্যই সইতে পারবে। অন্তত চেষ্টা করে একবার দেখতে হয়। চেষ্টাটা ব্যর্থ হলে স্বর্ণমূর্তির কথা ভুলে যেতে হবে ডক্টর জাওয়াদকে।

কয়েকবার পাক খাইয়ে রশির প্রান্তটাকে একটা কড়িকাঠ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল রানা। প্রান্তটা বার কয়েক পেঁচাল ওটার গায়ে। টেনে পরীক্ষা করল রানা। যথেষ্ট মজবুত মনে হচ্ছে কড়িকাঠটাকে।

মাথা নাড়ল বেলিয়ো, এক পা পিছাল। 'না,' বলল সে। 'আপনি উন্মাদ!'

'এ ছাড়া আর কোন উপায় আছে?'

'নাইলনের রশি ছিঁড়বে না,' বলল বেলিয়ো। 'কিন্তু পুরানো কড়িকাঠের এত শক্তি নেই যে একজন মানুষের ভার সইতে পারবে।'

'আমার ওপর ভরসা রাখো,' বলল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে ডক্টর জাওয়াদের দিকে তাকাল। 'আপনারা সবাই দস্তানা বের করে পরে নিন।'

রশিটা দু'হাতে ধরে টানছে রানা. আবার পরীক্ষা করছে।

তারপর হঠাৎ ঝুলে পড়ল, ধীরগতিতে শূন্যে উড়ছে, নীচের নকল মেঝের কথা মুহূর্তের জন্যও ভুলছে না। গায়ে বাতাসের চাপ অনুভব করছে ও

যতক্ষণ না মনে হলো খাদের কিনারা পার হয়ে এসেছে, ততক্ষণ রশি ধরে ঝুলে থাকল রানা, তারপর নিচু করল নিজেকে, পা ফেলল নিরেট মাটিতে।

সময় নষ্ট করল না, রশিটা ওপারে ছুঁড়ে দিল রানা। ইতিমধ্যে তিনজনই দাস্তানা পরে তৈরি হয়েছে। রশিটা ধরে ফেললেন ডক্টর জাওয়াদ। 'আগে তুমি–নতুন প্রজন্ম, ভবিষ্যৎ,' বলে মেয়ের হাতে ধরিয়ে দিলেন সেটা।

কথা না বাড়িয়ে রশিটা শক্ত করে ধরে ঝুলে পড়ল ফাহিমা। খাদ পার হয়ে সরাসরি রানার বুকে চলে এল সে।

এরপর ডক্টর জাওয়াদের পালা। 'সবাই চলে গেলে আমি সাহস হারিয়ে ফেলব,' বলে রশিটা ধরে ফেলল বেলিয়ো, তারপর চোখ বুজে ঝুলে পড়ল।

রানার পাশে নিরাপদেই নামল সে।

সবশেষে ডক্টর জাওয়াদ। তিনিও কোন সমস্যায় পড়লেন না।

রশির প্রান্তটা চোখা একটা পাথরে জড়াল রানা। 'ফেরার পথে আবার দরকার হবে।'

রোদ ঝলমলে দোরগোড়া পার হয়ে বড় একটা কামরায় ঢুকল ওরা। ছাদটা গম্বুজ আকৃতির, সিলিঙে স্কাই-লাইট থাকায় সাদা-কালো টাইল-এর মেঝেতে রোদ নামতে পেরেছে। চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে রানা, এই সময় 'ওহ্, গড!' বলে গুঙিয়ে উঠলেন ডক্টর জাওয়াদ। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে কামরাটার আরেক প্রান্তে তাকাতে জিনিসটা দেখতে পেল ও। সঙ্গে সঙ্গে দম বন্ধ হয়ে এল ওর।

স্বর্ণমূর্তি!

একটা বেদির উপর রয়েছে ওটা, একই সঙ্গে যেমন ভয়ানক

তেমনি সুন্দর লাগছে দেখতে, রোদের আলোয় হলুদ আগুনের মত জ্বলছে যেন।

'আমার সারাজীবনের স্বপ্ন!' ফিসফিস করলেন ডক্টর জাওয়াদ। 'চাচাপুয়ান যোদ্ধাদের দেবমূর্তি!'

রানা কিন্তু মুহূর্তের জন্যও ভুলছে না যে এই ভয়াল সৌন্দর্যকে ঘিরে রেখেছে মারাত্মক সব বাধা আর ফাঁদ। কে জানে সবশেষে কী ধরনের বিপদের ব্যবস্থা করা আছে। স্বর্ণমূর্তির সঙ্গে একটা ফাঁদ তো থাকতে বাধ্য।

ডক্টর জাওয়াদও ঠিক এই কথাই ভাবছেন। 'এই কাজটা আমাকে করতে দাও, রানা,' বললেন তিনি। 'বেদি থেকে ওটাকে আমি নিয়ে আসব।'

'কেন?'

'কারণ শেষ বিপদটাই সবচেয়ে মারাত্মক হবার কথা,' বললেন ডক্টর জাওয়াদ। 'কিছু যদি হয় তো সেটা এই বুড়োর ওপর দিয়েই হোক...'

মাথা নাড়ল রানা। 'এখানে আবেগ কোন কাজের জিনিস নয়। বিবেচনা করতে হবে প্রয়োজন। মূর্তিটাকে বেদি থেকে তুলতে হলে ক্ষিপ্রতা দরকার, সেটা আপনার চেয়ে আমার বেশি। কাজেই আপনারা সবাই দরজার কাছে অপেক্ষা করুন, আমি একা যাচ্ছি।'

কেউ আর কিছু বলল না। চোখের পাতা ফেলতে ভুলে গেছে বেলিয়ো। তার চোয়াল ঝুলে পড়েছে। হাঁ করে তাকিয়ে আছে স্বর্ণমূর্তির দিকে। তার বিস্ফারিত চোখে যে জিনিসটা ফুটে আছে সেটাকে নগ্ন লোভ ছাড়া আর কিছু বলার উপায় নেই।

ব্যাপারটা লক্ষ করে মনে মনে শঙ্কিত হলো রানা। ভাবল এই লোককে একবিন্দু বিশ্বাস করাও বোকামি হবে। চোখ ইশারায় ফাহিমাকে আরেকবার সাবধান করে দিল ও।

দরজার চৌকাঠ পেরোবার জন্য পিছু হটতে যাবে বেলিয়ো,

রানা বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আলবার্তো টেরেলের কথা মনে আছে তো, বেলিয়ো?'

'আছে,' বিড় বিড় করে জবাব দিল বেলিয়ো।

সাদা-কালো টাইলগুলো অদ্ভুত একটা প্যাটার্ন তৈরি করেছে। ছকটা কীভাবে সাজানো হয়েছে, ডিজাইনটা ঠিক কেমন, বোঝার জন্য সময় নিচ্ছে রানা।

দরজার পাশে প্রাচীন একজোড়া মশাল রয়েছে, লোহার হাতলে মরচে ধরে গেছে। মাথার উপর হাত তুলে একটা মশাল নামাল রানা, ভাবল কে জানে শেষবার এই মশাল কার হাতে ছিল। সে কি লোভী কোন চাচাপুয়ান ছিল? নাকি কোন সন্ত?

মশালটা জ্বালল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে সবাইকে একবার দেখে নিল। তারপর মশালের মাঝখানটা ধরে সামনের দিকে ঝুঁকল, হাতল দিয়ে চাপ দিল সাদা একটা টাইলে। কিছু ঘটল না। হাতলটা ওখানে ঠুকল ও। নিরেট। কোন প্রতিধ্বনি নেই। পুরোপুরি নিরেট। এরপর একটা কালো টাইলে বাড়ি মারল রানা।

হাতটা সরিয়ে নেওয়ারও সময় পাওয়া গেল না। একটা আওয়াজ শোনা গেল, বাতাস চিরে কী যেন ছুটে আসছে। পরমুহূর্তে ছোট একটা বর্শা ঘ্যাচ করে এসে বিঁধল মশালে, লোহার হাতল থেকে তিন ইঞ্চি দূরের নরম কাঠে। স্যাৎ করে হাতটা টেনে নিল রানা।

সশব্দে নিঃশ্বাস ছেড়ে হাত তুলল বেলিয়ো, কামরার ভিতরটা দেখিয়ে বলল, 'ওদিক থেকে এসেছে। গর্তটা দেখতে পাচ্ছেন? ওই গর্ত থেকে বেরিয়েছে ওটা।'

'ওরকম গর্ত তো কয়েকশো দেখতে পাচ্ছি আমি,' বলল রানা। জায়গাটা মৌচাকের মত, ছায়া ভরা গর্ত, ফোঁকর, ফাটল, তাক কিছুরই কোনও অভাব নেই। যে-কোন বা প্রতিটির ভিতর বর্শা থাকতে পারে—কালো কোন টাইলে চাপ পড়লেই ছুটে আসবে।

'ডক্টর জাওয়াদ,' ডাকল রানা। 'বুঝতেই পারছেন, বিপদ ছাড়া আর কিছু নেই এখানে। আমি চাই আপনারা অন্তত খাদটা পার হয়ে ওপারে অপেক্ষা করুন। ফাহিমা, আব্বুকে সাহায্য করো।'

'তুমি যখন চাইছ, যাচ্ছি আমি,' বললেন ডক্টর জাওয়াদ। 'তবে মনে রেখো, রানা, ওই স্বর্ণমূর্তি কিন্তু আমার চাই-ই।'

'কথা দিলাম আমি যদি বেঁচে থাকি, ওটা আপনি পাবেন,' বলল রানা। 'এবার যান, প্লিজ!'

আব্বুকে নিয়ে খাদ আর রশির দিকে ফিরে যাচ্ছে ফাহিমা। রানার নির্দেশে তাদের পিছু নিল বেলিয়ো-ও, ফাহিমা রশিটা এপারে ছুঁড়ে দিলে চোখা পাথরটার সঙ্গে জড়িয়ে রাখবে সে।

কাজটা সেরে ফিরে এল বেলিয়ো, রানা তাকে বলল, 'তুমিও চলে যেতে পারো, বেলিয়ো।'

কথা না বলে মাথা নাড়ল বেলিয়ো। তার লোভ আর মানুষের অনিষ্ট করার ইচ্ছে গোপন থাকছে না, প্রধান সাক্ষি দুই চোখ।

'ঠিক আছে, তবে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকো—আর এক ইঞ্চিও সামনে এগোবে না,' নির্দেশ দিল রানা।

ধীরে ধীরে মুখটা ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল বেলিয়ো। 'বেশ, আপনি যখন বলছেন।'

জ্বলন্ত মশালটা শক্ত করে ধরে এগোল রানা, কালো টাইলকে এড়িয়ে শুধু সাদাগুলোয় পা ফেলছে। কামরার দেয়ালে ওর ছায়া পড়ল। আধো অন্ধকার গর্তগুলো যেন বর্শা ছুঁড়ে মারার ভয় দেখাচ্ছে ওকে।

কাছ থেকে স্বর্ণমূর্তিটা বড় বেশি অদ্ভুত আর আকর্ষণীয় লাগছে। যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছে রানা। আট ইঞ্চি উঁচু, দু'হাজার বছর বয়স, সোনার একটা মূর্তি, মুখটাকে সুন্দর বলার কোন উপায় নেই—আশ্চর্যই লাগে এটার জন্য কত মানুষ পাগল হয়ে গেছে, কত মানুষ খুন হয়েছে, খুন করেছে। সত্যিই জাদু

করছে ওকে, এরকম একটা অনুভূতি হওয়ায় তাকিয়ে থাকা গেল না। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে নিজেকে রানা পরামর্শ দিল–টাইলগুলো পরীক্ষা করো। শুধু ওগুলোর কথা ভাবো।

পায়ের কাছে, সাদা টাইলের উপর, মরা একটা পাখি পড়ে রয়েছে, খুদে এক ঝাঁক বর্শা বিঁধে আছে ওটার শরীরে। ওটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা, মুহূর্তের জন্য অসুস্থ লাগল নিজেকে, উপলব্ধি করল যে-ই মন্দিরটা বানিয়ে থাকুক, ফাঁদগুলো যারই প্ল্যান হোক, লোকটা এত বেশি চালাক যে ফাঁদের কাজে শুধু কালো টাইল ব্যবহার করেনি–তাসের প্রতিটি প্যাকেটে যেমন জোকার থাকে, সেরকম অন্তত একটা সাদা টাইল দূষিত ছিল।

একটা?

তাসের সঙ্গে জোকার থাকে অন্তত দুটো।

যদি আরও সাদা টাইল দূষিত হয়?

ইতস্তত করছে রানা। ঘামছে এখন। উপর থেকে নেমে আসা রোদের আঁচ অনুভব করছে গায়ে, মশালের তাপ পাচ্ছে মুখে। সাবধানে মরা পাখিটাকে পাশ কাটিয়ে এল রানা। এই মুহূর্তে সাদা টাইলগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে–ওর আর স্বর্ণমূর্তির মাঝখানে ওগুলো প্রতিটি যেন ওর সম্ভাব্য শত্রু।

অনেক সময়, ভাবল রানা, শুধু সাবধানতা অবলম্বনেও কাজ হয় না। অনেক সময় ইতস্তত করার কারণে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়।

ঝুঁকি নেওয়ারও দরকার আছে। সাবধানতা ভালো, তবে উপস্থিত সুযোগটাও হারাতে নেই। অবশ্য প্রথমেই নিশ্চিত হতে হবে, পাল্লাটা তোমার দিকেই বেশি ভারী কি না।

স্বর্ণমূর্তিটা আবার টেনে নিয়ে চলেছে রানাকে। ওটার মধ্যে চুম্বক বা জাদু আছে। দোরগোড়ায় দাঁড়ানো বেলিয়োর কথা ভোলেনি রানা। সন্দেহ নেই এই মুহূর্তে নিজের জন্য আলাদা একটা প্ল্যান তৈরি করতে ব্যস্ত সে। বেইমানী করার বুদ্ধি আঁটছে।

কাজটা শেষ করো, নিজেকে বলল রানা। অত সাবধান না হলেও চলে!

একজন নর্তকের মত সাবলীল ভঙ্গিতে এগোল রানা। প্রতিটি টাইল এখন সম্ভাব্য ল্যান্ড মাইন, ভয়ঙ্কর ডেপথ চার্জ।

একটা তির্যক পথ তৈরি করে এগোচ্ছে রানা। কালো একটা চৌকোকে ডিঙাল ও, পা রাখল ওটার সামনের সাদা একটা টাইলে, অপেক্ষা করছে ওর শরীরের চাপে ট্রিগার মেকানিজম সচল হয়ে উঠে বাতাসে ছুঁড়ে দেবে এক ঝাঁক বর্শা।

তবে কিছুই ঘটল না।

বেদির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে রানা। স্বর্ণমূর্তিটা এখনই ওর নাগালের মধ্যে চলে আসবে। এই পুরস্কার একা শুধু ডক্টর জাওয়াদ বা বেলিয়োর নয়, রানা আর ফাহিমারও বটে। পুরস্কার আর সাফল্য, দুটোরই সমান অংশীদার তারা সবাই।

তবে শেষ একটা ফাঁদ আছে।

আছে মানে, না থেকে পারে না।

আবার থামল রানা। বুকের ভিতর লাগাম ছাড়া বুনো ঘোড়া হয়ে উঠেছে হৃৎপিণ্ডটা। কিছুতে বাড়ি মারার মত ভঙ্গিতে লাফাচ্ছে পালস। শিরায় শিরায় ছলকাচ্ছে রক্ত। ভুরুর ঘাম গড়িয়ে নামছে চোখের পাতায়, মুহূর্তের জন্য ঝাপসা করে দিচ্ছে সব। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছল। আর মাত্র কয়েক ফুট, ভাবল ও।

আর মাত্র কয়েকটা টাইল।

আবার নড়ল রানা। একটা করে পা তুলছে, ধীরে ধীরে নামাচ্ছে। ভারসাম্য যদি দরকার হয় তো এখনই। স্বর্ণমূর্তিটা যেন চোখ টিপছে, ওকে প্রলুব্ধ করতে চায়।

আরেক পা।

আরেক পা।

ডান পা সামনে বাড়াল রানা, বেদির সামনে সর্বশেষ সাদা টাইল স্পর্শ করল।

কোন বিপদ নেই। কিছুই ঘটছে না। ও সফল। পকেট থেকে চ্যাপ্টা আকৃতির ছোট একটা ফ্লাস্ক বের করে ছিপি খুলল রানা। দু'ঢোক ব্র্যান্ডি খেল। এটা আমার পাওনা, ভাবল ও। তারপর ফ্লাস্ক রেখে দিয়ে স্বর্ণমূর্তিটার দিকে তাকাল। শেষ একটা ফাঁদের কথা ভাবছে। কী হতে পারে সেটা?

অনেকক্ষণ সময় নিয়ে ভাবছে রানা। সেই প্রাচীন কালে যারা এই ডিফেন্স সিস্টেম তৈরি করেছিল, কল্পনায় তাদের একজন হতে চেষ্টা করল ও। ঠিক আছে, কেউ একজন স্বর্ণমূর্তিটা নিতে এসেছে। নিতে হলে পালিশ করা পাথর থেকে তুলতে হবে ওটাকে।

তারপর কী?

কোনও ধরনের মেকানিজমের ব্যবস্থা করা আছে, ওজনের অভাব বা অনুপস্থিতি দেখা দিলেই ট্রিগারে চাপ পড়বে? চাপ পড়লে কী হবে? আরও বর্শা ছুটে আসবে?

না, বর্শা নয়। আরও ভয়ঙ্কর, আরও বড় ধরনের বিপজ্জনক কিছু হবে সেটা।

আবার চিন্তায় ডুবে গেল রানা। কিছুক্ষণ পর ঝুঁকে বেদির গোড়াটা দেখল। গোড়ার কাছে কয়েকশো বছর ধরে পাথরের ছিলকা, টুকরো আর ধুলো জমেছে।

হয়তো, ভাবল রানা। দেখা যাক। ডান পায়ের জুতো আর মোজা খুলে ফেলল ও। জুতোটা তখনই আবার পরল, তবে মোজা ছাড়া।

পাথরের টুকরো দিয়ে মোজাটা দ্রুত ভরে ফেলল রানা। হাতের তালুতে ফুলে ওঠা মোজাটা ফেলে ওজন ঠিক আছে কিনা আন্দাজ পাওয়ার চেষ্টা করল। হয়তো, আবার ভাবল ও। কাজটা যদি যথেষ্ট দ্রুত করা যায়। ক্ষিপ্রতার গতির উপর নির্ভর করবে মেকানিজমকে পরাজিত করা যাবে কি যাবে না। ফাঁদটা যদি ঠিক সে-ধরনের হয় আর কী–যাতে একটা ট্রিগারে চাপ পড়বে। আর

তুললেই যদি অন হয়ে যায় মেকানিজম, তা হলে বিপর্যয় ঠেকাবার আর কোনও পথ নেই।

অন্য কোন পরিস্থিতি হলে ফিরে যেত রানা, অজানা বিপদের ঝুঁকি নিত না। কিন্তু এটা ডক্টর জাওয়াদের এক্সপিডিশন, হার মানার সিদ্ধান্ত একমাত্র তিনিই নিতে পারেন।

শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়াল রানা, ফুলে ওঠা মোজার ওজন নিল আবার, ভাবছে স্বর্ণমূর্তির ওজন এটার সমান কি না—হলেই ভালো। তারপর যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে।

নড়াচড়ায় এতটুকু ঝাঁকি নেই, ছোঁ দিয়ে বেদির মাঝখান থেকে স্বর্ণমূর্তি তুলে নিয়ে এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে মূর্তির জায়গায় বসিয়ে দিল পাথর ভর্তি মোজা।

কিছু হচ্ছে না। সময় গড়িয়ে চলেছে, অথচ কিছুই হচ্ছে না।

মোজাটার দিকে তাকাল রানা, তারপর চোখ ফিরিয়ে এনে হাতের স্বর্ণমূর্তির দিকে। আর ঠিক তখনই আশ্চর্য একটা শব্দ শুনতে পেল, ভেসে আসছে দূর থেকে। গুরুগম্ভীর যান্ত্রিক আওয়াজ, যেন প্রকাণ্ড কোন মেশিন চালু করা হয়েছে—সেই মেশিন কী-সব ভাঙছে, ছিঁড়ছে, ফাটাচ্ছে, গুঁড়ো করছে। মন্দিরের ভিতর সব কিছু নড়িয়ে দিচ্ছে সেই মেশিন। রানা অনুভব করল পায়ের নীচে টাইলের মেঝে থরথর করে কাঁপছে। পালিশ করা বেদির সারফেস, ঠিক মাঝখানটা, হঠাৎ নীচের দিকে ডেবে গেল পাঁচ-ছয় ইঞ্চি। পরমুহূর্তে সেই মেশিনের শব্দ দ্বিগুণ জোরালো হয়ে উঠল। চারদিক থেকে ভাঙচুরের আওয়াজ ভেসে আসছে। সব মিলিয়ে প্রচণ্ড গর্জন, কান পাতা দায়। বাড়ছে আরও।

গর্জনের সঙ্গে শুরু হলো কম্পন। সবকিছু ঝাঁকি খাচ্ছে। গোটা মন্দিরটাই ভেঙে পড়বে বলে মনে হলো। চিড় ধরছে দেয়ালে। ফাটল ধরছে সিলিঙে। ভেঙে পড়ছে দরজা। হুড়মুড় করে নীচে নেমে আসছে ইঁট, কড়িকাঠ, ধুলোর মেঘ।

ইতিমধ্যে ঘুরেছে রানা, দ্রুত পায়ে ফিরে এসেছে কামরার

দোরগোড়ায়। এখনও মেঘ ডাকার মত ভারী আওয়াজ ভেসে আসছে; হল, প্যাসেজ আর চেম্বার থেকে আসছে প্রতিধ্বনি। বেলিয়োর দিকে তাকাল ও, দরজার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, আতঙ্কে বিকৃত হয়ে গেছে মুখটা।

খাদের ওপারে অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ডক্টর জাওয়াদ, তাঁর পাশে ফাহিমা; দু'জনেই চিৎকার করে ডাকছে রানাকে।

'পালান!' কামরা থেকে বেরিয়ে এসে তাঁদের উদ্দেশে বলল রানা, চারদিক থেকে ভেসে আসা ভূমিকম্পের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল ওর চিৎকার। 'প্যাসেজ ধরে বেরিয়ে যান! ফাহিমা, আব্বুকে নিয়ে পালাও!'

'কী?' ফাহিমার কণ্ঠস্বর, কোন রকমে শুনতে পেল রানা।

'পালাও! পালাও! পালাও!' গুরুত্ব বোঝাবার জন্য একই শব্দ কয়েকবার উচ্চারণ করল রানা। তারপর দেখল আব্বুকে নিয়ে খাদের কিনারা থেকে ঘুরে গেল ফাহিমা। দু'জনেই ছুটছে।

এই মুহূর্তে রানার চারপাশে প্রতিটি জিনিস কাঁপছে। ইঁট খসে পড়ছে, কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে দেয়াল। দরজা পেরিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা, ঠিক তখনই টাইলের মেঝেতে ছাদ থেকে খসে পড়ল একটা পাথর। চোখের পলকে ঝাঁক ঝাঁক বর্শা মুক্ত হলো, ভেঙে পড়া কামরার চারদিকে হাজারে হাজারে লক্ষ্যবিহীন ছুটোছুটি করছে বর্শাগুলো।

হাঁপাতে হাঁপাতে রশিটার দিকে ছুটল বেলিয়ো। চোখা পাথর থেকে প্রান্তটা ছাড়িয়ে নিয়ে খাদের কিনারা থেকে ঝুলে পড়ল সে।

ইতিমধ্যে খাদের ওপার থেকে প্যাসেজে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন ডক্টর জাওয়াদ আর ফাহিমা।

ওপারে পৌঁছে রানাকে এক মুহূর্ত খুঁটিয়ে দেখল বেলিয়ো।

জানতাম এরকম একটা কিছু ঘটবে, ভাবল রানা।

রশির প্রান্তটা নিজের হাতের ভাঁজে পেঁচাচ্ছে বেলিয়ো। 'শর্ত

আছে, সিনর। বিনিময়ে আসুন। স্বর্ণমূর্তির বদলে রশি। আপনি স্বর্ণমূর্তিটা ছুঁড়ুন, আমি রশিটা ছুঁড়ব।'

নিজের পিছন থেকে ভেসে আসা হুড়মুড় করে সব কিছু ভেঙে পড়ার আওয়াজ শুনছে রানা, তাকিয়ে আছে খাদের ওপারে দাঁড়ানো বেলিয়োর দিকে।

'আপনার আর কিছু করার নেই, সিনর,' বলল বেলিয়ো। 'নাকি ভাবছেন আছে?'

'ধরো মূর্তিটা আমি খাদে ফেলে দিলাম?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তখন কী হবে? এক টুকরো রশি ছাড়া আর কী থাকবে তোমার কাছে?'

হাসল বেলিয়ো। 'ভেবে দেখুন, আপনার কাছে তো তা-ও থাকবে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। পিছনে আরও জোরালো হয়ে উঠল ধ্বংসকাণ্ড। পায়ের নীচ থেকে মেঝের সরে যাওয়া টের পাচ্ছে ও। 'ঠিক আছে, বেলিয়ো। মূর্তির বদলে রশিটা।' পেরুভিয়ান লোকটার দিকে ছুঁড়ে দিল হাতের স্বর্ণমূর্তি।

আর্টিফ্যাক্টটা লুফে নিল বেলিয়ো। এক পলক দেখে নিয়ে পকেটে ভরল সেটা, তারপর মেঝেতে ফেলে দিল হাতের রশি। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে। 'আন্তরিকভাবে দুঃখিত, সিনর রানা। বিদায়। ও, হ্যাঁ, গুড লাক।'

'তুমি আমার চেয়ে বেশি দুঃখিত নও,' চিৎকার করে বলল রানা, পেরুভিয়ান শয়তানটাকে প্যাসেজ ধরে হারিয়ে যেতে দেখল।

পিছন থেকে আরও পাথর খসে পড়ার আওয়াজ ভেসে আসছে। হুড়মুড় করে কয়েকটা স্তম্ভ ভেঙে পড়ল। স্বর্ণমূর্তির অভিশাপ? ভাবল রানা।

একটা কাজই করার আছে, উপলব্ধি করছে ও। অন্য কোন বিকল্প নেই। খাদ পার হওয়ার জন্য লাফ দিতে হবে।

ঝুঁকি আছে, তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে। পিছন থেকে তোমার নাগাল পেতে চলেছে প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসলীলা, সামনে অতল গহ্বর। কাজেই অন্ধকারে লাফ না দিয়ে উপায় নেই তোমার।

পিছিয়ে এল খানিকটা, তারপর বড় করে শ্বাস নিয়ে ছুটল রানা। লাফ দিল খাদের কিনারা থেকে, যত জোরে পারা যায়। খাদের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে শরীরটা, বাতাসের শোঁ-শোঁ আওয়াজ পাচ্ছে, প্রার্থনা করছে অতল গহ্বরটা যেন ওকে গিলে না ফেলে।

শুরু হলো পতন। লাফ দেওয়ার ফলে যে গতি সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা শেষ হয়ে গেছে। এবার খসে পড়ছে রানা। দ্রুত নীচে নামছে। জানে না কোথায় পড়বে। আশা করছে খাদের ওপারে কোথাও।

কিন্তু না!

নীচের অন্ধকার উঠে আসছে দেখল রানা, ভ্যাপসা গন্ধ ঢুকল নাকে। হাত দুটো ঝট করে সামনে বাড়াল যা পায় তাই আঁকড়ে ধরার জন্য–কিনারা বা অন্য কিছু, যা ধরে ঝুলে থাকা যায়।

রানা অনুভব করল খাদের কিনারায় ডেবে যাচ্ছে আঙুলগুলো। ঢালু আর ভঙ্গুর কিনারা, ক্রল করে যতই চেষ্টা করুক শরীরটাকে উপরে তুলতে, যতই আঁচড়াআঁচড়ি করুক, রাশি রাশি নুড়ি পাথর আর ধুলো সহ পিছলে নামছে ও।

পা দোলাল রানা, হাত দুটোকে থাবার মত ব্যবহার করে মাটি খামচে ধরল, গোটা অস্তিত্বের সাহায্যে শক্ত কিছু একটা নাগাল পাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

গোঙাচ্ছে রানা। ফোঁপাচ্ছে। খাদের ভিতর দিকের দেয়ালে পা ঘষছে। শরীরটাকে কিনারায় তোলার চেষ্টায় দম আটকাছে ঘন ঘন। বেঈমান পেরুভিয়ান লোকটা স্বর্ণমূর্তি নিয়ে পালিয়ে যাবে, এটা মেনে নেওয়া যায় না। তারচেয়েও বড় ভয়, পালাবার সময় ডক্টর জাওয়াদ আর ফাহিমার না কোন ক্ষতি করে।

পা দুটো আবার দোলাল রানা, ঘষল, বাড়ি মারল

দেয়ালে–আটকানোর বা বাধাবার মত কিছু একটা খুঁজছে, খাদ থেকে ওঠার কাজে যাতে সাহায্য পাওয়া যায়।

ওদিকে মন্দিরটা এখনও ভাঙছে, বিরতিহীন।

দম আটকে সরু একটা কারনিসের কিনারায় আঙুল বাধালো রানা, যতক্ষণ না মনে হলো এবার ছিঁড়ে যাবে পেশি ততক্ষণ শরীরের ভার চাপাল ওগুলোয়। এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি করে উঠছে ও। শুনতে পেল শরীরের ভারে ভাঙছে ওর নখ।

চার

নিজেকে আরও জোরালো তাগাদা দিল রানা।

পড়ে যেয়ো না! শরীরটাকে টেনে তোলো উপরে!

থামল রানা। ঘাম অন্ধ করে দিচ্ছে। কাঁপুনি ধরে গেছে স্নায়ুতে। কিছু একটা ভাঙবে এবার, ভাবল রানা। তখন জানা যাবে কী আছে খাদের তলায়। থেমে সমস্ত শক্তি জড়ো করতে চাইছে। সবটুকু আদায় করে নিতে চাইছে নিজের ক্ষমতার। তারপর আবার একবার অমানুষিক শক্তি প্রয়োগ করে শরীরটাকে উপরে তুলতে চেষ্টা করল।

অবশেষে কিনারার উপর একটা পা তুলতে পারল রানা, সমতল মেঝের নিরাপত্তা অনুভব করছে হাঁটুতে। তবে মেঝেটা কাঁপছে, ভয় দেখাচ্ছে, যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে ফাঁক হয়ে যাবে।

কিনারায় শরীরটাকে তুলে এনে নিজেকে খাড়া করল রানা। কাঁপছে ঠক-ঠক করে। হলওয়ের দিকে তাকিয়ে বেলিয়োকে

কোথাও দেখতে পেল না। আলবার্তো টেরেলকে যে কামরায় পাওয়া গিয়েছিল, সেদিকে গেছে সে। তার আগে ডক্টর জাওয়াদ আর ফাহিমাও গেছে ওদিকে। কে জানে কার ভাগ্যে কী ঘটছে!

মেঝে থেকে রশির একটা প্রান্ত তুলল রানা, টেনে নামিয়ে আনল কড়িকাঠ থেকে বাকি অংশটা, তারপর কুণ্ডলী পাকিয়ে ঝুলিয়ে রাখল কোমরের হুকে।

দ্রুত পায়ে প্যাসেজ ধরে ফিরছে রানা। হঠাৎ টরচার চেম্বারের ওদিক থেকে বেলিয়োর তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার ভেসে আসতে শুনল। ছুটল ও, কী ঘটেছে আন্দাজ করতে পারছে। স্পাইকগুলো গেঁথে ফেলেছে বেলিয়োর শরীর। নিশ্চয়ই কোথাও ভুল করেছে সে।

ছুটে টরচার চেম্বারে ফিরে এল রানা। বেলিয়োকে দেখতে পেল ও, একই সঙ্গে শুনতে পেল অনেক দূর থেকে ভেসে আসা ফাহিমার কান্নার আওয়াজ–ক্রমে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

বেলিয়ো দেয়ালের এক ধারে ঝুলে আছে, কোনও পাগলের সংগ্রহে রাখা প্রকাণ্ড একটা প্রজাপতির মত লাগছে তাকে। বেলিয়ো নয়, তার প্রাণহীন শরীরটা। লোহার স্পাইকগুলো এতটুকু দয়া দেখায়নি তাকে।

'সত্যি দুঃখিত,' বলে তার পকেট থেকে স্বর্ণমূর্তিটা বের করে নিল রানা, স্পাইকগুলোকে সাবধানে পাশ কাটিয়ে পরবর্তী প্যাসেজে বেরিয়ে এল।

এই সময় মাথার উপর থেকে যেন কেয়ামত নেমে এল। এক সঙ্গে একশো বজ্রপাত হলেও এরকম প্রচণ্ড শব্দ হওয়ার কথা নয়। মেঝেটা রানাকে যেন একটা নুড়ি পাথরের মত ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। ভাগ্যক্রমে প্যাসেজের দেয়ালের সঙ্গে মাথা ঠুকে গেল না, গেলে নির্ঘাত মগজ বেরিয়ে পড়ত।

কোন রকমে সিধে হলো রানা। পিছন ফিরল, ফিরে আসা পথের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কীসের এত শব্দ আর কাঁপুনি।

তারপর জিনিসটাকে বাঁক নিতে দেখল রানা। এতক্ষণে পরিষ্কার হলো প্যাসেজের দেয়ালে, মেঝে থেকে এক ফুট উপরে, কী কারণে সরু কারনিস রাখা হয়েছে

প্যাসেজটা গোল। সেই গোলাকৃতি প্যাসেজের প্রায় সবটুকু ফাঁক বা শূন্যতা পূরণ করে, অন্তত পাঁচ হাজার মণ ওজনের বিশাল এক পাথর দ্রুত বেগে ছুটে আসছে। পাথরটা সম্পূর্ণ গোল, ফলে ক্রমশ ঢালু প্যাসেজ ধরে নেমে আসতে কোনই অসুবিধে হচ্ছে না।

জীবনে বোধহয় এত জোরে ছোটেনি রানা। এটাই শেষ ফাঁদ, ভাবল ও। প্রাচীন ইন্ডিয়ানরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত কেউ যদি মন্দিরের ভিতর ঢুকতে পারেও, এমনই ব্যবস্থা রাখতে হবে, প্রাণ নিয়ে যাতে বেরিয়ে যেতে না পারে।

ছুটছে রানা। পাথরটা ওকে ধাওয়া করছে। নিজেকে তিরস্কার করছে ও। কারণ ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেই দেখতে পাচ্ছে পাথরটা আকারে আগের চেয়ে বড় হয়ে গেছে। তার মানে দূরত্ব বাড়ছে না, কমে আসছে!

বাঁক নিল রানা। বাঁক ঘুরল নিষ্প্রাণ দৈত্যটাও! এখন ও যদি একবার আছাড় খায়–ব্যস, ভবলীলা সাঙ্গ।

বাঁক নিতে রানার চেয়ে একটু বেশি সময় নিয়েছে পাথরটা। সেই সুযোগে দূরত্ব একটু বাড়িয়ে নিয়েছে ও, তা না হলে এতক্ষণে ওকে পিষে আরও সামনে চলে যেত পাথরটা।

কিন্তু দূরত্ব আবার কমছে!

তবে সামনে আরেকটা বাঁক।

এভাবে ছুটে চলার যেন কোন বিরতি নেই।

এতকিছুর মধ্যেও ডক্টর জাওয়াদ আর ফাহিমার কথা ভোলেনি রানা। ওদেরকে দেখতে না পেয়ে পরম স্বস্তি বোধ করছে ও। যাক, ওরা অন্তত নিরাপদে মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে যেতে পেরেছে।

সামনে মন্দিরের প্রবেশপথ দেখা যাচ্ছে, আলোর একটা বৃত্ত, আরও সামনে গাছপালার সারি।

পাথর গড়ানোর আওয়াজ এখনও ক্রমশ বাড়ছে। রানার ঘাড়ের একেবারে কাছে চলে এসেছে ওটা, প্রবল বেগে কাঁপছে মেঝে, ভয়ে পিছন ফিরে তাকাতে পারছে না।

পাথরের সঙ্গে পাথরের ঘর্ষণ ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই কানে, আওয়াজটার শক ওয়েভ শরীরটাকে প্রতিমুহূর্তে কাঁপাচ্ছে। মনে হলো বাঁচার কোন আশা নেই, পাথরটা ওকে চাপা না দিয়ে ছাড়বে না। সামনের ফাঁকটা এখনও যথেষ্ট দূরে, লাফ দিয়ে বোধহয় পার হওয়া যাবে না তা সত্ত্বেও মরিয়া হয়ে লাফ দিল রানা, সেই সঙ্গে পিছন দিকে খেল জোর এক ধাক্কা।

মন্দিরের ভিতর থেকে কামানের গোলার মত বেরিয়ে এল ও। নরম ঘাস যেন কোল পেতে দিল ওকে। ঠিক সেই মুহূর্তে দড়াম করে প্রবেশপথে বাড়ি খেল দৈত্যাকার পাথর, যেন এঁটে দিল ছিপি, চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল মন্দিরে ঢোকার পথ।

রানা ক্লান্ত, দম ফুরিয়ে গেছে। ঘাসে পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে ও। চোখ দুটো বন্ধ। হাঁপাচ্ছে হাপরের মত শব্দ করে।

একটুর জন্য বেঁচে গেছি, ভাবল ও। ঘামছে দরদর করে। অবসাদ লাগছে, ঘুম পাচ্ছে ওর। কিন্তু ঘুমালে তো চলবে না। ডক্টর জাওয়াদের হাতে তুলে দিতে হবে তাঁর অমূল্য সম্পদ।

স্বর্ণমূর্তিটা কোথায়?

চোখ মেলল রানা। তাড়াতাড়ি উঠে বসে ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরে বের করে আনল স্বর্ণমূর্তিটা।

এই সময় একটা ছায়া পড়ল ওর গায়ে।

ঝট করে মুখ তুলল রানা দু'জন হোভিটস যোদ্ধা অপলক চোখে দেখছে ওকে। তাদের মুখে উজ্জ্বল রঙ দিয়ে নকশা আঁকা। দু'জনের হাতেই বাঁশের তৈরি লম্বা ব্লোগান, বল্লম বাগিয়ে ধরার

ভঙ্গিতে রানার দিকে তাক করে রেখেছে।

তবে এই মুহূর্তে ইন্ডিয়ানদের উপস্থিতি রানাকে বিচলিত করছে না, বিচলিত করছে তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা সাফারি আর হেলমেট পরা শ্বেতাঙ্গ লোকটা। ডক্টর জাওয়াদের মুখে এই লোকের কথা এতবার শুনেছে, চিনতে মোটেও অসুবিধে হলো না ওর।

পল ভিতেরা। সে-ও একজন আর্কিওলজিস্ট, তবে গা বাঁচানো, বিপথগামী। তার কাজই হলো, নিজে কষ্ট না করে অন্যের কৃতিত্ব কেড়ে নিয়ে নিজের নামে চালানো। ডক্টর জাওয়াদের সঙ্গে তার বহু বছরের শত্রুতা।

এরপর কী হবে আন্দাজ করতে পারছে রানা।

ভিতেরার দৃষ্টি অনুসরণ করে ডান দিকে তাকাতে ঘাসের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে দেখল ডক্টর জাওয়াদ আর ফাহিমাকে। কয়েকজন হোভিটস নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাতের ব্লোগান ওদের দু'জনের দিকে তাক করা

জঙ্গলের কিনারায় এক সারিতে প্রায় ত্রিশজন হোভিটস যোদ্ধাকে দেখা যাচ্ছে। তাদের সামনে, নেতৃত্ব দেওয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুয়াক্কা।

চেহারায় বোকা বোকা ভাব, একই সঙ্গে লোভাতুর দৃষ্টি নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে। হাসছে হঠাৎ কী হলো কে জানে, হাসিটা মুছে গেল, তার জায়গায় ফুটে উঠল বিস্ময় তারপর, আরও দ্রুত, চেহারাটা হয়ে উঠল ভাবলেশহীন। এটাকে মৃত্যুর সঙ্কেত বলে চেনে রানা।

দু'পাশের ইন্ডিয়ানরা বেঈমান পেরুভিয়ানের হাত দুটো ছেড়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ল মুয়াক্কা। তার পিঠে কয়েকটা খুদে বর্শা বিঁধে রয়েছে। রানা জানে, বিষ মাখানো রয়েছে ওতে।

'মিস্টার মাসুদ রানা,' খুক করে কেশে নিজের দিকে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল পল ভিতেরা 'প্রথমেই জানিয়ে রাখি,

আপনার সঙ্গে আমার কোনও ঝগড়া বা শত্রুতা নেই।'

এক পা এগিয়ে ঝুঁকল সে, রানার হাত থেকে স্বর্ণমূর্তিটা তুলে নিল। বেশ সময় নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল ওটা, চোখে-মুখে তৃপ্তির ছোঁয়া।

রানার উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল ভিতেরা। ফ্রেঞ্চ তো, আর কিছু না হোক, ভদ্রতা জানে। স্মার্ট একটা ভঙ্গিতে পিছাতে শুরু করল সে, স্বর্ণমূর্তিটা পকেটে ভরে রাখছে।

পকেট থেকে হাতটা বের করল ভিতেরা, পিছিয়ে ইতিমধ্যে ডক্টর জাওয়াদ আর ফাহিমার পাশে চলে এসেছে। রানা উঠে দাঁড়াচ্ছে, এই সময় দেখল, পকেট থেকে বেরিয়ে আসা ভিতেরার হাতটা খালি নয়

পাশে দাঁড়িয়ে হাতের পিস্তলটা ডক্টর জাওয়াদের মাথার পিছনে তাক করল ভিতেরা।

কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে এমন এক হুঙ্কার ছাড়ল রানা, মনে হলো গোটা বনভূমি কেঁপে উঠল। আওয়াজটা প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে আসছে–

'না...না...না...'

পরমুহূর্তে লাফ দিল রানা। কিন্তু পা বাড়িয়ে দিয়ে ল্যাং মারল ওকে একজন হোভিটস। দড়াম করে আছাড় খেল রানা। তবে আওয়াজটা চাপা পড়ে গেল ভিতেরার হাতে ধরা পিস্তলটা গর্জে ওঠায়। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ডক্টর জাওয়াদের মাথার খুলিতে গুলি করেছে সে পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্য গুলি করল আরও একবার।

ইন্ডিয়ানরা মাটির সঙ্গে চেপে ধরে আছে রানাকে। তার অবশ্য দরকার নেই, কারণ রানা জানে, এই মুহূর্তে ভিতেরার উপর ঝাঁপিয়ে পড়াটা বোকামি হয়ে যাবে। তার নাগাল পাওয়ার অনেক আগে পিস্তলটা ওর খুলিও উড়িয়ে দেবে।

মাজলে ফুঁ দিয়ে ধোঁয়া ওড়াল ভিতেরা। 'শত্রুর শেষ রাখতে

নেই–বিশেষ করে পুরানো শত্রুর।' রানার দিকে তাকিয়ে হাসল সে। 'আগেই বলেছি, আপনার সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই। আপনি ভিন্ন লাইনের লোক, কোনও এক কুক্ষণে আমাদের রেষারেষির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন। আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি আমি, আপনি মুক্ত। মেয়েটিকে নিয়ে সৈকতের দিকে চলে যান। আমি জানি ওখানে আপনাদের একটা সি-প্লেন অপেক্ষা করছে।'

শুনছে, তবে তার একটা কথাও রানার মনে কোন ছাপ ফেলছে না। চোখের সামনে অকস্মাৎ একজন প্রিয় মানুষকে এভাবে খুন হয়ে যেতে দেখে মারাত্মক ধাক্কা খেয়েছে ও। হঠাৎ সমস্ত পেশি ফুলে উঠল ওর, তারপর প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল গোটা শরীর–চোখের পলকে ছিটকে পড়ল সবকটা ইন্ডিয়ান।

লাফ দিয়ে সিধে হলো রানা। নিজের ক্রোধ দমন করতে না পেরে খালি হাতেই ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে ভিতেরার উপর।

'মরতে চাইলে আসুন,' হেসে উঠে বলল ভিতেরা, 'আপনাকেও পরপারে পাঠিয়ে দিই। তবে, আগেই বলেছি, ফাহিমা বা আপনি আমার শত্রু নন, কাজেই আপনাদেরকে খুন করার কোনও ইচ্ছে আমার নেই।'

তারপরও সামনে বাড়ছে রানা।

ওর দিকে তাক করা রয়েছে পিস্তলটা, ধীরে ধীরে পিছু হটছে ভিতেরা। মাথাটা এদিক-ওদিক নেড়ে আর সামনে এগোতে নিষেধ করছে রানাকে।

নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার চেষ্টা করছে রানা। এগোবার গতি একটু কমল। 'তুমি নিরীহ, নিরপরাধ একজন বুড়ো মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছ,' হিসহিস করে বলল ও। 'মনে রেখো , এর পরিণতি তোমাকে ঠিকই ভোগ করতে হবে।' দাঁড়িয়ে পড়ল ও।

'তুমি আমাদের লাইনের লোক নও, হলে বুঝতে দুর্লভ আর্টিফ্যাক্ট সংগ্রহ করার নেশাটা কী ভয়ানক।' হেসে উঠল

ভিতেরা, ধীরে ধীরে পিছু হটছে, দূরত্ব বেড়ে যাওয়ায় গলা চড়িয়ে কথা বলতে হচ্ছে তাকে। 'ডক্টর জাওয়াদ তো আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আর শত্রু ছিল, এমন মানুষও আছে এরকম ক্ষেত্রে নিজের বাপকেও ছাড়ে না।'

'তোমাকেও ছাড়া হবে না,' বলল রানা। 'তোমার ওই নেশা চিরকালের জন্যে মিটিয়ে দেয়া হবে।'

'তুমি আমার শত্রু নও, কাজেই কথাগুলো আমি গায়ে মাখছি না...'

'সেজন্যে তোমাকে পস্তাতে হবে,' বিড়বিড় করল রানা।

স্বভাবতই রানার চেয়েও বড় শক খেয়েছে ফাহিমা। মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূর থেকে দুনিয়ার একমাত্র আপনজন প্রিয় আব্বুর মাথাটা বিস্ফোরিত হতে দেখেছে সে। তা-ও গুলিটা করেছে আব্বুর একজন বন্ধুস্থানীয় লোক, যাকে সে ছোটবেলা থেকে আংকেল বলে সম্মান করতে শিখেছে।

ইন্ডিয়ানদের নিয়ে ভিতেরা চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরেও ওদের দু'জনের কেউ নড়তে পারল না। তারপর নিস্তব্ধ জঙ্গলে হঠাৎ ফাহিমার ফুঁপিয়ে ওঠার আওয়াজ পাওয়া গেল।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা। ফাহিমার দিকে এগোবার সময় প্রতিজ্ঞা করল, পল ভিতেরাকে ছাড়বে না ও। প্রতিশোধ নেবে যেভাবে পারে।

পাঁচ

পাঁচ মাস পর।

তেল আবিব। ইজরায়েলি ইন্টেলিজেন্স।

মোসাদের ডিরেক্টর, জেনারেল (অবঃ) আতা বারাইদি-র চেম্বার। বড়সড় মেহগনি ডেস্কটার পিছনে বিরতিহীন পায়চারি করছেন মোসাদ চিফ। ব্রিফ করছেন তিনি। আর ব্রিফ করার সময় এভাবে পায়চারি করা তাঁর পুরানো অভ্যাস। ভদ্রলোকের বয়স হবে ষাট কি বাষট্টি, কার্ল মার্ক্সের মত মুখভর্তি দাড়ি–কলপ করা।

ডেস্কের সামনে দুটো চেয়ারে বসে রয়েছে তরুণ আসহাদু মিরান আর কাদিম নিশা, মোসাদ চিফের অত্যন্ত পছন্দের নতুন প্রজন্মের দুই এজেন্ট। বস্ লক্ষ করলেন একটু কাছাকাছি বসেছে ওরা। তিনি জানেন দু'জনের মধ্যে গভীর প্রেম আছে।

'বুক অভ মরমন সম্পর্কে কী জানো তোমরা?'

বসের প্রশ্নের জবাবে মিরান আর নিশা পরস্পরের দিকে তাকাল, তারপর নিঃশব্দে মাথা নাড়ল একযোগে।

'ওটা একটা আসমানী কিতাব,' বললেন আতা বারাইদি, পায়চারি থামিয়ে নিজের রিভলভিং চেয়ারের পিঠে হাত রাখলেন।

'মরমনরা একটা সেক্ট, খ্রিশ্চানিটির একটা শাখা বলা যেতে পারে, প্রতিষ্ঠা করেন জোসেফ স্মিথ নামে একজন আমেরিকান।

'চোদ্দ বছর বয়সে, নিউ ইয়র্কে আলোকপ্রাপ্ত হন তিনি ১৮২৭ থেকে ১৮৩০, এই চার বছর তাঁর জীবনে নানা রকম

অলৌকিক ঘটনা ঘটে। শুরু হয় ফেরেশতাদের আনাগোনা, ওহি নাজেল এবং দিব্য-দৃষ্টির মাধ্যমে পরম জ্ঞান আহরণ।

'এই সময় এক ফেরেশতা তাঁকে পথ দেখাল। তাঁর নির্দেশিত জায়গায় মাটি খুঁড়ে একটা সোনার তৈরি প্লেট পেলেন তিনি। তাতে বেশ কিছু বাক্য খোদাই করা ছিল–হিব্রু ভাষায়। সেগুলো অনুবাদ করা হয়। তাতে লেখা ছিল–যিশুর জন্মের ছয়শো বছর আগে ইহুদিদের একটা দল আমেরিকায় আসে। যাই হোক, এনসাইক্লোপিডিয়া দেখে এদের সম্পর্কে বাকি সব কথা জেনে নিয়ো, ঠিক আছে?'

'জী, সার।'

'গোটা ব্যাপারটা খুলে বলার আগে আরও দুটো প্রশ্ন আছে আমার,' বললেন মোসাদ চিফ।

দুই এজেন্ট নড়েচড়ে বসল।

'আর্ক অভ মোসেস বা দ্য হোলি আর্ক জিনিসটা কী?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মিরান, 'ওটাকে আর্ক অভ কাভান্যান্ট-ও বলা হয়–বড় একটা কাঠের বাক্স, মুসা নবীর আমলে যেটার ভেতর লিখিত আইন রাখা হয়েছে।'

'তবে জিনিসটা হারিয়ে গেছে,' মন্তব্য করল নিশা।

'আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছি ওই হারানো আর্ক মরমনরা উদ্ধার করতে চলেছে।'

'কেন?' একযোগে জানতে চাইল মিরান আর নিশা, দু'জনেরই শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে।

'সবাই জানে, অন্তত ইতিহাস বলে, ইহুদিদের ওই আর্ক মিরাকল ঘটাতে পারে, অলৌকিক শক্তির আধার সেটা,' মোসাদ চিফ বললেন। 'মরমনরা ওটাকে নিজেদের ধর্ম প্রচারের কাজে লাগাতে চায়।'

মিরান বলল, 'কিন্তু সার, মুসা আমাদের নবী। ওই আর্কের ওপর শুধু আমাদেরই দাবি আর অধিকার আছে।'

'ঠিক তাই,' বললেন আতা বারাইদি। 'আর্ক অভ কাভানান্ট বা আর্ক অভ মোসেস যদি কোনদিন খুঁজে পাওয়া যায়, সেটার ওপর ন্যায়সঙ্গত অধিকার একমাত্র ইজরায়েলেরই থাকতে পারে, আর কারও নয়। তবে ব্যাপারটা খুব জটিল।'

'জটিল কেন, সার?' জানতে চাইল নিশা।

'প্রথম কথা, মরমনরা অত্যন্ত একগুঁয়ে গোষ্ঠী, যা ভেবেছে তা করেই ছাড়বে। ওদের ধারণা মুসা নবী আর ঈশ্বরের স্পর্শ থাকায় আর্কটা যারা পাবে তারা দুনিয়ার বুকে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবে। অর্থাৎ যুক্তি মেনে নিয়ে আর্কটা ওরা আমাদের হাতে তুলে দেবে না।'

'সেক্ষেত্রে কৌশলে বা প্রয়োজন হলে জোর খাটিয়ে কেড়ে নিতে হবে, সার,' বলল মিরান।

'জোরাজুরি সম্ভব নয়। আমেরিকায় মরমনদের প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে। সিনেট আর কংগ্রেস অনেক বিষয়েই ওদের প্রতি সহানুভূতিশীল। বড় বড় ব্যবসা আর বিরাট সব সরকারী পদ দখল করে নিয়েছে ওরা। কাজেই ওদের সঙ্গে সরাসরি কোনও বিরোধে জড়িয়ে পড়া ইজরায়েলের জন্য ক্ষতিকর হবে।'

'তা হলে?' জানতে চাইল নিশা। 'এ সমস্যার সমাধান কী, সার?'

'সমাধান হলো,' বললেন আতা বারাইদি, 'ওই যে তোমরা বললে, যে-জিনিস জোর করে কেড়ে নেওয়া যায় না, সেটাকে আমরা কৌশলে সংগ্রহ করব।'

'কীভাবে?' উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠল মিরান।

'এখানেই আসছে আমার শেষ প্রশ্নটা। তোমরা কি জানো, মাসুদ রানা কে?'

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা, তারপর প্রায় একযোগে শুরু করল, 'জী, সার, বোধহয় জানি...'

'বলো কী!' আতা বারাইদিকে বিস্মিত দেখাল। 'তোমরা মাসুদ রানাকে চেনো? কীভাবে চেনো?'

'চিনি মানে, সার, লন্ডনে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমাদের, তাঁর নাম মাসুদ রানা,' বলল মিরান। 'যেখানেই যাই আমরা—থিয়েটার, ফ্যাশন শো, মিউজিয়াম, ফিল্ম ফেস্টিভেল, স্টেডিয়াম—কীভাবে যেন সব জায়গাতেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় আমাদের। ভদ্রলোক একজন সৌখিন আর্কিওলজিস্ট।'

বিস্ময় চেপে রেখে মোসাদ চিফ জানতে চাইলেন, 'তার সম্পর্কে আর কী জানো তোমরা?'

'অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি, সার,' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল নিশা। 'যাকে বলে নিপাট ভদ্রলোক। মাত্র একদিন কথা হয়েছে, নামেমাত্র পরিচয়, অথচ দেখা হলেই মৃদু হাসেন, ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকান...'

'প্রায়ই আমাদের দু'জনের নামে ফুল, ছোটখাট সৌজন্য উপহার ইত্যাদি পাঠান,' নিশা থামতেই শুরু করল মিরান। 'বোঝা যায়, আমাদের সম্পর্কটা এনজয় করেন ভদ্রলোক।'

'অনেক হয়েছে, এবার থামো,' ভারি গলায় বললেন আতা বারাইদি। 'তার সম্পর্কে দেখছি আসল কথাটাই তোমরা জানো না।'

'আসল কথা, সার?' একযোগে জানতে চাইল মিরান আর নিশা।

'শোনো তা হলে,' বলে মাসুদ রানা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ একটা লেকচার দিলেন মোসাদ চিফ। সবশেষে বললেন, 'মোট কথা, এই লোক ইজরায়েলের পরম শত্রু। কিন্তু এখন বিপদের সময়

এই শত্রুকে দিয়েই নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করব আমরা। আমরা খবর পেয়েছি এখন লন্ডনে আছে সে। তোমরা আজকের ফ্লাইটেই রওনা হয়ে যাবে। আমাদের কাছে মুসা নবীর ওই আর্কের গুরুত্ব কতটুকু বুঝিয়ে বলো তাকে; তারপর অনুরোধ করো। বলবে, আর্কটা সত্যি যদি উদ্ধার করা সম্ভব হয় তো একমাত্র তার পক্ষেই সেটা সম্ভব। তাতে এতটুকু মিথ্যে বলা হবে না।'

'ভদ্রলোক তা হলে স্পাই, সার?' অবাক হয়ে জানতে চাইল নিশা।

'হ্যাঁ, স্পাই,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন মোসাদ চিফ। 'দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ এসপিওনাজ এজেন্ট হিসেবে গণ্য করা হয় তাকে। তা না হলে কি শত্রু হিসেবে আমাদের সমীহ আদায় করতে পারত? তবে শুধু স্পাই নয়, তোমরা যেটা জানো সেটাও মিথ্যে নয়–সৌখিন আর্কিওলজিস্টও। তা ছাড়া উদ্ভট কিছু অ-স্পাই সুলভ দুর্বলতা আছে লোকটার মধ্যে। অসীম শ্রদ্ধা আছে তরুণ-তরুণীর ভালোবাসার প্রতি।'

'জী, তাঁর ওই পরিচয়টাই জানি আমরা,' বলল মিরান।

'তা হলে তো দেখা যাচ্ছে, ভালোই হলো, তোমাদের আবদার লোকটা ফেলতে পারবে না।'

'আমার বিশ্বাস, আমরা কোন অনুরোধ করলে তিনি সেটা রাখবেন,' মাথা ঝাঁকিয়ে মন্তব্য করল নিশা।

তাকে সমর্থন করে মিরান বলল, 'আমারও তাতে কোন সন্দেহ নেই, সার।'

মোসাদ চিফ হাসলেন, তাঁর ঠোঁটের চারপাশের রেখা আর ভাঁজগুলো রহস্যের আভাস দিচ্ছে। 'ঘটনা এমন একদিকে গড়াচ্ছে, আর্কটার পিছনে না ছুটে তার বোধহয় উপায় থাকবে না। আপাতত এটুকুই জেনে রাখো, বাকিটা পরে বলছি।

'তার আগে গুরুত্বপূর্ণ অন্য একটা প্রসঙ্গ। আগেই বলেছি, আর্কটা উদ্ধার করতে পারবে রানা। তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা

হবে, রানাকে খুন করে ওটা ইজরায়েলে নিয়ে আসা।'

চেম্বারের ভিতর আড়ষ্ট একটা নীরবতা নেমে এল। খানিক পর সেটা ভাঙল নিশা। 'ব্যাপারটা কেমন হলো, সার? চাইলেই যিনি দেবেন, তাঁকে আমরা খুন করতে যাব কেন?'

'সত্যি কি চাইলেই দেবে? তার ওপর এতটা আস্থা তোমাদের?' প্রিয় দুই এজেন্টকে তীক্ষ্দৃষ্টিতে লক্ষ করছেন মোসাদ চিফ। 'কেন দেবে, ব্যাখ্যা করো।'

'কারণ আমাদেরকে তিনি পছন্দ করেন,' ব্যাখ্যা করল মিরান। 'কারণ তিনি একজন পারফেক্ট জেন্টলম্যান।'

'পছন্দ করে, এটা তোমাদের ভুল ধারণাও হতে পারে,' নরম সুরে বললেন মোসাদ চিফ। 'হয়তো পছন্দ করার ভান করে, কারণ তোমরা যে মোসাদ এজেন্ট এটা নিশ্চয়ই জানে সে, আর তার আসল উদ্দেশ্য হয়তো সময়-সুযোগ মত তোমাদেরকে বোকা বানিয়ে ইসরায়েলের টপ সিক্রেট ইনফরমেশন জেনে নেয়া।'

মাথা নাড়ল নিশা। 'না, সার, ভদ্রলোককে কিন্তু ওই প্রকৃতির মানুষ বলে মনে হয় না।'

'আমরা, সার,' বলল মিরান, 'লোকমুখেও তাঁর অনেক প্রশংসা শুনেছি...'

'বেশ, তোমাদের কথা থেকে বোঝা গেল মাসুদ রানা সাক্ষাৎ একজন ফেরেশতা।' কাঁধ ঝাঁকালেন আতা বারাইদি, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি লেগে রয়েছে। 'কিন্তু এখন যদি তোমাদেরকে আমি বলি যে এটা আসলে দুর্ধর্ষ এজেন্ট মাসুদ রানাকে খুন করার অ্যাসাইনমেন্ট, তা হলে কী বলবে তোমরা?'

'নিজেদের দেশকে আমরা ভালোবাসি, সার,' বলল নিশা। 'আপনি নির্দেশ দিলে যে-কোন লোককে খুন করব আমরা।'

'এমনকী মাসুদ রানাকেও,' মিরানও তার কথায় সায় দিয়ে বলল।

'তবে,' বসের সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করার সময় দৃঢ় একটা ভঙ্গি নিতে দেখা গেল নিশাকে, 'সার, মারতেই যদি হয়, সেটা অন্য কোন সময়, অন্য কোন অ্যাসাইনমেন্টে। এখানে তাঁকে দিয়ে নিজেদের একটা কাজ করিয়ে নিচ্ছি আমরা, তাই জিনিসটা কেড়ে নিয়ে তাকে...' ঘন ঘন মাথা নাড়ছে সে।

'তা ছাড়া, চাইলেই তো জিনিসটা দিয়ে দেবেন তিনি,' বলল মিরান। 'আমাদের অনুরোধেই যখন আর্কটা উদ্ধার করবেন, না দিতে চাওয়ার কোন কারণ নেই, সার।'

'এরকম সিচুয়েশনে ভদ্রলোককে খুন করাটা বেঈমানী হয়ে যায়, সার!' ঘন ঘন মাথা নাড়ছে নিশা।

'ইমপসিবল, সার!'

আতা বারাইদি হাসলেন, সেই হাসিতে প্রশংসা ঝরে পড়ছে। 'কথাটা ভেবে গর্ব হচ্ছে আমার–তোমাদের দু'জনের মন সত্যি খুব বড়। ঠিক আছে, তোমরা দু'জনেই যখন ভালো মনে করছ না–থাক, এ যাত্রায় রানাকে খুন করার দরকার নেই। যদি দেয়, আর্কটা তার কাছ থেকে চেয়েই নিয়ো তোমরা। তবে জেনে রাখো, ওটা আমাদের চাই-ই চাই।'

•

আরও বিশ মিনিট পর ব্রিফিং শেষ করলেন মোসাদ চিফ। মিরান আর নিশা চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর ইন্টারকমের বোতাম টিপলেন তিনি। 'মেজর কালাহানকে পাঠিয়ে দাও এখনই!' নিজের প্রাইভেট সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিলেন। টিম কালাহান হলো বর্তমান মোসাদের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও দুর্ধর্ষ এজেন্ট।

তিন মিনিটের মাথায় বসের চেম্বারে ঢুকল কালাহান।

পায়চারি থামিয়ে আতা বারাইদি বললেন, 'তোমার অ্যাসাইনমেন্ট হলো–প্রথমে মিরান আর নিশাকে ফলো করা, তারপর মাসুদ রানাকে।'

'ইয়েস, সার!'

'মাসুদ রানা আর্ক অভ মোসেস উদ্ধার করতে যাচ্ছে। তোমার কাজ–তাকে খুন করে ওটা ইজরায়েলে ফিরিয়ে আনা।' এক মুহূর্ত থেমে আবার বললেন, 'মিরান আর নিশা যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সে বাধা তুমি যেভাবে খুশি সরিয়ে দিতে পারবে।'

ইংল্যান্ড, রানা এজেন্সির লন্ডন শাখা। কনফারেন্স রুম।

অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল রানা। এই মিষ্টি জুটি সম্পর্কে প্রায় কিছুই ওর জানা নেই, তবে কী কারণে যেন ওদের তারুণ্য আর ঘনিষ্ঠতা অসম্ভব ভালো লাগে ওর। এই ভালো লাগাটা শুরু হয়েছিল রিজেন্ট পার্কে।

কী একটা রাজনৈতিক পার্টির কোন একজন নেতা জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছিল। বেশ ভিড় ছিল চারপাশে। সবাই খুব মন দিয়ে শুনছিল। কাঁধে ক্যামেরা, অলস পায়ে ওই ভিড়টাকে পাশ কাটিয়ে পার্কের আরেকদিকে সরে যাচ্ছিল রানা। হঠাৎ একটা বেমানান দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও।

মিষ্টি চেহারার একটা তরুণী আর সুদর্শন এক তরুণ। দুনিয়ার কোনদিকে বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই তাদের। কিছুই তারা করছে না, শুধু পরস্পরের দিকে মুগ্ধচোখে তাকিয়ে আছে। নিজেদেরকে নিয়ে এভাবে মগ্ন হয়ে থাকার মধ্যে পবিত্র আর অসম্ভব সুন্দর এমন একটা কিছু ছিল, নিজের অজান্তেই টেলিফটো লেন্স দিয়ে দূর থেকে একটা ছবি তুলে নেয় রানা। ভাগ্যক্রমে ছবিটাও উঠেছিল চমৎকার।

আরও অনেক পরে, তখন ওদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, ওদের হোটেলের ঠিকানা যোগাড় করে ওই ফটোর দুটো কপি ওদের দু'জনের নামে পাঠিয়ে দিয়েছিল রানা।

সেই শুরু, তারপর থেকে টুকটাক অনেক উপহার পাঠিয়েছে

রানা ওদেরকে। তবে কখনওই সৌজন্যের বেড়া ডিঙায়নি।

ওদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার সময় স্মিত হাসি লেগে থাকল রানার ঠোঁটে। যেন কিছুই জানে না, জিজ্ঞেস করল:

'সত্যি? তোমরা মোসাদ এজেন্ট?'

কথা না বলে দু'জনেই নীরবে মাথা ঝাঁকাল ওরা।

'মোসাদকে সাহায্য করতে হবে?' এখনও হাসছে রানা, তবে চোখ-মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না। 'সরাসরি এরকম একটা প্রস্তাব দিচ্ছ তোমরা আমাকে? বিশ্বাস করতে বলছ, মোসাদ-চিফ মিস্টার আতা বারাইদির সায় আছে এতে?'

'ভেবে দেখুন না, বস্ অনুমতি না দিলে আমরা কি এরকম একটা প্রস্তাব নিয়ে আপনার কাছে আসতে পারতাম?' রানাকে নিজের হাতটা ধরতে দিয়ে গালে টোল ফেলে হাসল কাদিম নিশা। 'আপনার পরিচয়ও তো তাঁর কাছেই জেনেছি আমরা।'

ওদেরকে দুটো চেয়ার দেখাল রানা। 'বসো, প্লিজ।'

পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসল ওরা।

'আপনি অনুমতি দিলে কাজটার কথা খুলে বলতে পারি আমরা,' বলল আসহাদু মিরান।

'কফি চলবে তো?' শাখা প্রধানের সেক্রেটারিকে ডেকে কফি দিতে বলল রানা, তারপর মিরানের দিকে তাকাল। 'হ্যাঁ, শুরু করো তুমি। তবে যা বলবে যতটা সম্ভব সংক্ষেপে।'

'মাত্র কয়েকদিন আগের কথা,' শুরু করল মিরান। 'আমাদের একটা লিসনিং পোস্টে আশ্চর্য মেসেজটা ধরা পড়েছে। পাঠানো হয়েছে কায়রো থেকে আমেরিকার মিসৌরি রাজ্যে—মরমনদের হেডকোয়ার্টারে। ওদের সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনি জানেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। ওর জানা আছে জোসেফ স্মিথ নিজেকে পয়গম্বর বলে চালাবার চেষ্টা করেছিল। ১৮৪৪ সালে ষড়যন্ত্র আর

বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে উত্তেজিত জনতা তাকে আর তার ভাইকে খুন করে।

'মরমনদের একটা আর্কিওলজিক্যাল টিম বেশ কয়েক বছর ধরে দুনিয়ার এখানে-সেখানে খুঁড়ে বেড়াচ্ছে...'

'কথাটা আমার কানেও এসেছে,' বলল রানা।

'ওদের এই মেসেজটা পড়ে মনে হয় কায়রোয় খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা আবিষ্কার করেছে ওরা,' বলল মিরান। 'আপনি বরং মেসেজটা পড়ে দেখুন।' পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে।

ভাঁজ খুলে কাগজের লেখাটা পড়ল রানা।

TANIS DEVELOPMENT PROCEEDING.
ACQUIRE HEADPIECE, STAFF OF RA,
DOCTOR KASEMI'S DAUGHTER FAHIMA.

মেসেজটা আরেকবার পড়ল রানা। হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল মাথাটা। ওরা টের পেল না, উত্তেজনায় আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে রানার শরীর। মিরান আর নিশার দিকে তাকাল ও। 'মরমনরা তানিস আবিষ্কার করেছে।'

'জী, মিস্টার রানা,' বলল নিশা, অপলক চোখে রানাকে দেখছে সে। 'আমাদের এক্সপার্টরাও তাই বলছেন।'

'দেখা যাচ্ছে, তানিস সম্পর্কে জানা আছে আপনার,' নরম সুরে মন্তব্য করল মিরান।

'শুধু এইটুকু যে ওটা একটা প্রাচীন মিশরীয় শহর, হারিয়ে গেছে,' বলল রানা।

'তা হলে এ-ও নিশ্চয় আপনার জানা আছে যে হোলি আর্কটা যে-সব জায়গায় থাকার কথা, প্রাচীন তানিস শহর তার মধ্যে একটা?' জিজ্ঞেস করল মিরান।

মাথা নাড়ল রানা। 'আর্ক? তুমি নুহ নবীর নৌকার কথা বলছ না কি?'

'না, নুহ নবীর নৌকা নয়,' বলল মিরান। 'আমি আর্ক অভ কাভানান্ট-এর কথা বলছি। ওটা একটা আধার, একটা চেস্ট, ইজরায়েলিরা যেটায় করে টেন কমান্ডমেন্টস নিয়ে ঘুরে বেড়াত।'

'দ্য টেন কমান্ডমেন্টস?' রানার ভুরু জোড়া মাঝ-কপাল পর্যন্ত উঁচু হলো। 'মানে?'

'অ্যাকচুয়্যাল স্টোন ট্যাবলেটের কথা বলছি, মুসা নবী যেগুলো হোরেব পাহাড় থেকে নামিয়ে আনেন। কথিত আছে ইহুদিদের অধঃপতন দেখে ওগুলো তিনি ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলেন। তিনি যখন পাহাড়ে উঠে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলছেন, মানুষের জন্য আল্লাহর বিধি-বিধান বুঝে নিচ্ছেন, ওই সময় ইহুদিরা পাপাচারে ব্যস্ত ছিল, ব্যস্ত ছিল মূর্তি বানানোর কাজে। তাই রেগে গিয়ে ট্যাবলেটগুলো ভেঙে ফেলেন তিনি।'

মিরান থামতেই শুরু করল নিশা। 'এরপর ট্যাবলেটের ওই ভাঙা টুকরোগুলো একটা আধার বা আর্কে ভরে নেয় ইহুদিরা। যেখানেই গেছে ওরা, সঙ্গে করে নিয়ে গেছে ওটাকে। তারপর যখন থিতু হলো কানান-এ, আর্কটা রাখল সলোমন-এর উপাসনালয়ে। বহুকাল ওখানেই ছিল ওটা...তারপর জিনিসটাকে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়।'

'সরিয়ে ফেলা হয়, কেন? কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'কেউ জানে না কে কেন সরায় বা কোথায় সরানো হয়,' বলল মিরান।

'যিশুর জন্মের নয়শো ছাব্বিশ বছর পিছনে গিয়ে দেখা যাক কী ঘটছে জেরুজালেমে,' বলল নিশা। 'শিশহক নামে এক ফেরাউন ওই সময় জেরুজালেমে হামলা চালায়। আর্কটাকে সে-ই হয়তো তানিস শহরে নিয়ে গিয়েছিল–'

নিশা দম নেওয়ার জন্য থামতেই তার কথার খেই ধরে মিরান বলল, 'সেখানে হয়তো "আত্মাদের কুয়া" নামের একটা চেম্বারে সেটাকে লুকিয়ে রাখে সে।'

'এ-সবের অনেকটাই মিথ,' বলল রানা।

'সেই মিথই বলছে, অসৎ উদ্দেশ্যে যে-ই ওই আর্কে হাত দিয়েছে সে-ই ধ্বংস হয়ে গেছে। ফেরাউন শিশহক কায়রোয় ফিরে আসার কিছুদিন পরেই অসম্ভব দীর্ঘ একটা লু ঝড় শুরু হয়। বলা হয় এক বছর পর থামে বালুঝড়টা। সেই ঝড়ে চিরকালের জন্যে ঢাকা পড়ে যায় তানিস শহর।'

'হয়তো মুসা নবীর অভিশাপে!' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল নিশা।

'এ-সবই খুব ইন্টারেস্টিং,' বলল রানা, 'কিন্তু মরমন আর্কিওলজিস্টদের একটা মেসেজে একজন বিখ্যাত মিশরীয় আর্কিওলজিস্টের মেয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কী কারণে?'

'কাসেমি মানে, হ্যাঁ, ডক্টর জাওয়াদ কাসেমি,' বলল মিরান, '—এই বিখ্যাত মিশরীয় আর্কিওলজিস্ট নিখোঁজ শহর তানিস সম্পর্কে এক্সপার্ট ছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি তানিস ছিল তাঁর অবসেশন। তিনি এমনকী শহরটার প্রাচীন কিছু নিদর্শনও সংগ্রহ করেছিলেন। তবে অনেক চেষ্টা করেও শহরটা খুঁজে পাননি।'

'মরমনরা তাঁর মেয়ে ফাহিমাকে কেন খুঁজছে?'

'ওরা আসলে STAFF OF RA-র হেডপিসটা খুঁজছে। ওটা ডক্টর জাওয়াদের কাছে ছিল। তিনি মারা গেছেন, ফলে ওরা ধরে নিয়েছে এখন সেটা তাঁর মেয়ের কাছে পাওয়া যাবে। তিনিও তো আর্কিওলজির একজন ছাত্রী বলে শুনেছি।'

'এই জিনিসটা আসলে কী? স্টাফ অভ রা?'

'আমি একটা ছবি এঁকে দেখাই আপনাকে,' বলে চেয়ার ছাড়ল মিরান, কনফারেন্স রুমের মেঝের উপর দিয়ে হেঁটে এক কোণে চলে এল, ওদের দিকে পিছন ফিরে ব্ল্যাকবোর্ডে দ্রুত একটা স্কেচ আঁকছে। 'ধারণা করা হয় স্টাফ অভ রা হলো আর্কটা কোথায় আছে তা জানার একটা সূত্র। খুব বুদ্ধি খাটিয়ে সূত্রটা তৈরি করা হয়েছে। প্রথমে বড় একটা লাঠি ছিল ওটা, সম্ভবত

ছ'ফুট লম্বা–তবে নিশ্চিতভাবে কেউ জানত না। যাই হোক, লাঠির মাথায় ছিল জমকালো একটা ক্যাপ–সূর্যের আকৃতি, মাঝখানে একটা ক্রিস্টাল বা স্ফটিক সহ।

'স্টাফ বা লাঠিটাকে তানিস শহরের বিশেষ একটা ম্যাপ রুমে নিয়ে যেতে হবে–ওই কামরায় গোটা তানিস শহরের একটা খুদে সংস্করণ আছে। আপনি যখন নির্দিষ্ট সময়ে কামরার নির্দিষ্ট জায়গায় ওই স্টাফ রাখবেন তখন কী হবে জানেন?'

'হেডপিসে বসানো ক্রিস্টালের ভেতর দিয়ে ঢুকে ম্যাপের যেখানে রোদ পড়বে, ধরে নেবেন ওখানেই আছে "আত্মাদের কুয়া।"'

'আর ওই আত্মাদের কুয়ার ভেতরই লুকানো আছে আর্কটা,' মিরানের কথার খেই ধরে বলল নিশা। 'এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, মিস্টার রানা, মরমনরা কেন ওই হেডপিসটা চাইছে? আর তাদের মেসেজে কেন-ই বা ডক্টর জাওয়াদুল কাসেমির মেয়ের নাম রয়েছে?'

'হ্যাঁ, মেসেজটার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল,' বলল রানা। 'এবার বুঝিয়ে বলো, আমার কাছ থেকে ঠিক কী সাহায্য চাও তোমরা?'

'আমরা ইহুদি। মুসা আমাদের নবী। ওটা আমাদের আর্ক। আমরা আশা করছি মরমনদের হাতে পড়ার আগেই আপনি ওটা উদ্ধার করে আমাদের হাতে তুলে দেবেন।'

রানা ভাবল, আরি, এ দেখছি মামার বাড়ির আবদার!

'কাজটা আমি করব কিনা, করলেও সফল হব কিনা, এ-সবই অনিশ্চিত। তবু জানতে ইচ্ছে করছে–এই খোঁজাখুঁজিতে আমার কী লাভ।'

'বস্–মিস্টার আতা বারাইদি–বলেছেন, আপনি যা চাইবেন আমরা যেন তাতেই রাজি হয়ে যাই।'

'রানা এজেন্সিতে এসেছ তোমরা,' বলল রানা। 'এ-ধরনের একটা স্যালভিজ অপারেশনে সাধারণত চার্জ করা হয় দশ

মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নিয়ম হলো অর্ধেকটা অগ্রিম দিতে হয়। বাকি অর্ধেক কাজ শেষ হলে।'

চেয়ারের পাশ থেকে ব্রিফকেসটা কোলের উপর তুলে নিয়ে খুলছে মিরান। 'ঠিক আছে।'

'থামো,' তাড়াতাড়ি বাধা দিল তাকে রানা। 'আমি শুধু প্রচলিত নিয়মটা জানালাম, একবারও কিন্তু বলিনি কাজটা করতে রাজি হয়েছি।'

'কিন্তু, মিস্টার রানা, আমরা অনেক আশা নিয়ে এসেছি...'

মাথা নাড়ল রানা 'সত্যি দুঃখিত। তোমাদের খাতিরে কাজটা হয়তো করে দেওয়ার চেষ্টা করতাম, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার হাতে একদম সময় নেই।'

মিরান আর নিশা পরস্পরের দিকে তাকাল। চোখে চোখে কী যেন কথা হলো ওদের। তারপর নিশা বলল, 'একটা কথা, মাসুদ ভাই। এখনও আপনাকে বলিনি আমরা।'

'কী কথা?'

'আমাদের কাছে একটা তথ্য আছে। সেটা বললে আপনি হয়তো উৎসাহ বোধ করবেন। বলব?'

অস্বস্তি বোধ করছে রানা। সত্যিই ব্যস্ত ও। ভাবছে, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবে কিনা, তা হলে হয়তো বিদায় নেবে ওরা।

'মরমনরা কাকে আর্ক খোঁজার দায়িত্ব দিয়েছে, জানেন?' জিজ্ঞেস করল নিশা। নিজেই জবাব দিল, 'পল ভিতেরা নামে একজন ফরাসী আর্কিওলজিস্টকে।'

নামটা শোনা মাত্র ঝাঁকি খেল রানার শরীর। ঠিক শুনেছে কি না নিশ্চিত হতে পারছে না।

'কোন্ পল ভিতেরা?' বিড়বিড় করে জানতে চাইল ও।

'আপনি যার কথা ভাবছেন, এ সে-ই লোক, আপনার বন্ধু ডক্টর জাওয়াদকে যে খুন করেছে।'

'ঠিক জানো তোমরা?' রানার দু'চোখ থেকে যেন আগুন

ঠিকরে বেরুচ্ছে। ‘সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই?’

‘ঠিক জানি। সন্দেহের কোন অবকাশ নেই,’ দৃঢ়কণ্ঠে রানাকে আশ্বস্ত করল মিরান।

‘বেশ,’ বলল রানা। ‘তোমাদের চিফ মিস্টার বারাইদিকে জানিয়ে দাও—আমি সাহায্য করব। কোন ফি লাগবে না, মুসা নবীর আর্কটা আমি ইজরায়েলের হাতেই তুলে দেব।’

‘আমি জানতাম...জানতাম আমি!’ আবেগে নিজেকে যেন ধরে রাখতে পারছে না নিশা। ‘বস্‌কে আমি বলেছিলাম...’

ইজরায়েলি এজেন্ট দু’জন বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পর চিন্তা করতে বসল রানা।

দীর্ঘ আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয়েছে, মরমনরা আর্ক অভ মোসেস উদ্ধার করবে, তারপর রানা সেটা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবে, প্ল্যান হিসাবে এটা মোটেও ভালো নয়।

কারণ জিনিসটা উদ্ধার করতে হলে প্রথমেই দরকার হেডপিসটা। সেটা আছে...বা থাকতে পারে, ফাহিমার কাছে। রানা যদি মরমনদের প্রতিনিধি ভিতেরার আগে ফাহিমার কাছে পৌঁছাতে না পারে, নিঃসন্দেহে ধরে নিতে হয় মেয়েটি তার হাতে খুন হয়ে যাবে।

হেড়পিস ছাড়া আর্ক উদ্ধার করা সম্ভব নয়, কাজেই প্রথম কাজ ফাহিমাকে খুঁজে বের করা।

কিন্তু মুশকিল হলো, পাঁচ মাস আগে সেডাটিভ ড্রাগ খাইয়ে পেরুর রাজধানী লিমা থেকে কায়রোর প্লেনে তুলে দেওয়ার পর ফাহিমার আর কোন খবর পায়নি রানা। ওদের বাড়ির ঠিকানায়, ঈজিপশিয়ান কালচারাল হেরিটিজ আর কায়রো মিউজিয়ামে ই-মেইল করেছে, কিন্তু কোনও জবাব আসেনি।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় এজেন্সির লন্ডন শাখার অফিস থেকে রিজেন্ট পার্ক সংলগ্ন নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এল রানা।

ডক্টর জাওয়াদের ব্যক্তিগত ডায়েরিটা কীভাবে যেন রয়ে গেছে ওর কাছে। বেশ কিছু দিন আগে ওটায় চোখ বুলিয়েছিল–আজ মনে হচ্ছে ফাহিমা সম্পর্কে একটা তথ্য আছে ওটায়।

ফ্ল্যাটে ফিরে ডায়েরিটার পাতা ওল্টাচ্ছে রানা। একটু পরেই তথ্যটা পাওয়া গেল। ওয়ার্ল্ড আর্কিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের খরচে নেপালে যাওয়ার কথা ছিল ফাহিমার। দু'মাসের প্রজেক্ট, জুমলা নামে একটা শহরের পাশে আর্কিওলজিক্যাল সাইট খুঁড়ে দেখতে হবে প্রাচীন কোনও সভ্যতার হদিস পাওয়া যায় কিনা।

ডায়েরিটা বন্ধ করে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল রানা। ওয়ার্ল্ড আর্কিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের অফিসটা লন্ডনেই।

রানা কী ধরনের তথ্য চায় জেনে নিয়ে আধঘণ্টা পর আবার রিং করতে বলল ওরা।

আধঘণ্টা পর জানা গেল, অ্যাসোসিয়েশনের প্রজেক্ট আজ থেকে দু'মাস আগে শেষ হয়ে গেছে। দুঃখের বিষয়, ওটা ছিল একটা ব্যর্থ প্রজেক্ট, জুমলায় কিছুই তেমন পাওয়া যায়নি। না, প্রজেক্ট লিডার মিস ফাহিমা কাজ শেষ করে আর মিশরে ফেরেননি। প্রজেক্ট সফল হয়নি, এই রিপোর্ট তিনি জুমলা থেকে ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত কোনও কারণে এখনও সম্ভবত তিনি জুমলাতেই আছেন বলে মনে হয়।

আবার ডায়াল করল রানা। এবার একটা ট্র্যাভেল অফিসে। ফ্লাইট পেলে আজই নেপালের প্লেন ধরবে।

তবে তার আগে বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অব) রাহাত খানের সঙ্গে কথা বলাটা একান্ত জরুরি।

রানা নয়, বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল রাহাত খানই বিশেষ লাইনে যোগাযোগ করলেন তাঁর প্রিয় এজেন্ট এমআরনাইনের সঙ্গে; উদ্দেশ্য নতুন একটা অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে ব্রিফ করা।

তবে বিসিআই চিফ শুরুই করতে পারলেন না। তার আগেই রানা বলে বসল, 'সার আমার একটা আর্জি আছে।'

'আর্জি?' বিস্মিত হলেন রাহাত খান, ভাবলেন রানা তো কখনও এভাবে কথা বলে না। 'কীসের আর্জি?'

'খুবই জরুরি একটা ব্যাপার, সার,' বলল রানা। 'আমাকে পনেরো দিনের ছুটি দিতে হবে।'

'ছুটি? এরকম সময়ে? না, এখন একদমই সম্ভব নয়। কেন, তোমার তো জানার কথা কাজের পাহাড় জমে আছে...'

'জী, সার, জানি,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'কিন্তু তবু এবারের এই ছুটিটা আমার না পেলেই নয়।'

'কেন, কী ব্যাপার?' গম্ভীর হলেন রাহাত খান। 'এত করে বলা হচ্ছে কাজের প্রচণ্ড চাপ, তারপরও ছুটি তোমাকে দিতেই হবে–কী জন্যে? কোথায় যাবে তুমি?'

'প্রথমে আমাকে নেপালে যেতে হবে, সার। তবে যে কাজটায় জড়িয়ে পড়েছি সেটা মধ্যপ্রাচ্যে।'

'মধ্যপ্রাচ্যে...?' ধমকের সুরে জানতে চাইলেন বস্।

ইতস্তত করছে রানা। 'সার, এটা আমার ব্যক্তিগত একটা ব্যাপার...'

'অফিসের জরুরি কাজের চেয়ে ব্যক্তিগত কাজটা তোমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল?'

হতাশ হয়ে পড়ছে রানা, বুঝতে পারছে ছুটিটা বোধহয় পাবে না ও। মরিয়া হয়ে উঠল ও; বলল, 'সার, ছুটিটা আমার চাই-ই। যদি না পাই, জানি না তারপর কী করব আমি।'

অপরপ্রান্তে স্তব্ধ হয়ে গেলেন রাহাত খান। তিনি তাঁর প্রিয় এজেন্টকে খুব ভালো করেই চেনেন। রানার শব্দচয়ন আর সুর শুনেই বুঝে নিয়েছেন কতটা সিরিয়াস ও। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা সহজে ভাবার পাত্র মাসুদ রানা অন্তত নয়।

মধ্যপ্রাচ্যে? মধ্যপ্রাচ্যে কী? হঠাৎ মাস পাঁচেক আগের একটা

ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল বিসিআই চিফের। 'মধ্যপ্রাচ্যে…সেই ব্যাপারটা? পল ভিতেরা?'

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে বলল রানা।

'ঠিক আছে,' আশ্চর্য নরম সুরে বললেন বিসিআই চিফ। 'পনেরো দিন নয়, এক মাসের ছুটি নাও।'

রানা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। 'ধন্যবাদ, সার…'

'আই উইশ ইউ গুড লাক, মাই বয়!' বলে যোগাযোগ কেটে দিলেন বস্।

ছয়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

রাজ্যের নাম মিসৌরি, শহরের নাম ইন্ডিপেনডেন্স। মরমনদের হেডকোয়ার্টার।

ফ্রেঞ্চ আর্কিওলজিস্ট পল ভিতেরার সঙ্গে জরুরি মিটিং করছে মরমনদের তিন প্রিজাইডিং বিশপের একজন। কামরার ভিতর ওরা দু'জন ছাড়াও তৃতীয় এক লোক উপস্থিত। তার নাম পিটার ময়নিহান।

ময়নিহান মার্কিন সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কৃত একজন মেজর। ইন্ডিপেনডেন্স শহরে একটা অফিস খুলে সশস্ত্র যোদ্ধা ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা ফেঁদে বসেছে সে।

ময়নিহান নিজে একজন মরমন, তার বেশিরভাগ সৈনিকও

তাই।

'ব্যাপারটা আপনারা আমাকে খুলে বলছেন না,' অভিযোগের সুরে বলল ভিতেরা। সাফারি-সুট পরে আছে সে, মুখে কাঁচাপাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি থাকায় বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছে।

'কোন্ ব্যাপারটা, মঁশিয়ে ভিতেরা?'

'হেডপিস। আপনারা ওটা কীভাবে সংগ্রহ করতে চাইছেন, সেটা আমার জানা দরকার।'

'পাকা ব্যবস্থাই করা হয়েছে,' বলল বিশপ। 'ডিটেইলস অবশ্য আমার চেয়ে ভালো ময়নিহানই বলতে পারবে।'

'চিন্তা করবেন না,' অভয় দিয়ে হাসল মেজর ময়নিহান। 'এরই মধ্যে লোক পাঠানো হয়েছে...'

'কী ধরনের লোক, মেজর ময়নিহান? তাদের মধ্যে কি দু'একজন আর্কিওলজিস্ট আছে?'

'না, তা নেই...'

'গুণ্ডা, মেজর? আপনার মত কিছু ভাড়-খাটা সৈনিক?'

'প্রফেশনালস।' শুধরে দিল ময়নিহান।

'কিন্তু প্রফেশনাল আর্কিওলজিস্ট নয়। কী করে বুঝবে তারা হেডপিসটা পেল কিনা? কিংবা যেটা পেল সেটা নকল নয়?'

হাসল মেজর ময়নিহান। 'রহস্যটা জানা থাকলে এটা কোন সমস্যা নয়, মঁশিয়ে ভিতেরা। মূল রহস্য, কোথায় খুঁজতে হবে, সেটা আমরা জানি।'

'তবে কার কাছ থেকে জিনিসটা আদায় করতে হবে, সেটা যেন ভুলে যাবেন না, মেজর,' বলল ভিতেরা। 'ও হচ্ছে কাসেমির মেয়ে। বাপের কিছুটাও যদি পেয়ে থাকে, খুন না করে জিনিসটা আদায় করতে পারবেন বলে মনে করি না।'

আবার হাসল মেজর ময়নিহান। 'কে বলেছে ওদেরকে আমি খুন করার নির্দেশ দিয়ে পাঠাইনি?'

সন্তুষ্টচিত্তে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল ভিতেরা।

ধবধবে সাদা বরফ ঢাকা পাহাড়ী ঢালের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে ডিসি-থ্রি। মাঝে মধ্যে নিরেট পাঁচিলের মত সামনে মাথাচাড়া দিচ্ছে কুয়াশা, কিংবা আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো প্রাচীন দুর্গের মত ঘন মেঘ নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছে; দক্ষ হাতে ওগুলোকে পাশ কাটাচ্ছে পাইলট।

বিপজ্জনক একটা রুট, ভাবল রানা। জানালা দিয়ে নীচে তাকিয়ে আছে ও। গোটা নেপালই আসলে উঁচু-নিচু একটা পাহাড়ী এলাকা, যেমন দুর্গম তেমনি রহস্যময়।

নেপালে শ্রেণীশত্রু খতমের নামে মাওবাদী গেরিলারা নির্বিচারে মানুষ খুন করছে। আবার মৌলবাদী হিন্দু কট্টরপন্থীরা জাতপাতের অজুহাত দেখিয়ে শাসন ও শোষণ করছে নিচু বর্ণের লোকজনকে।

গত রাতে মাওবাদী গেরিলারা এয়ারপোর্টে হামলা চালিয়েছে, ফলে আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সগুলো তাদের সবগুলো নেপাল ফ্লাইট বাতিল করে দেয়। কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক খবর সংগ্রহের জন্য চার্টার করা একটা প্লেন নিয়ে দিল্লি থেকে কাঠমাণ্ডু যাচ্ছে শুনে তাদের সঙ্গে ভিড়ে গেছে রানা।

যাচ্ছে বটে, তবে ফাহিমাকে আদৌ নেপালে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ আছে রানার। খবর নিতে গিয়ে নিশ্চিত হয়েছে, সভ্য বা পরিচিত জগতের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক রাখছে না ফাহিমা।

এর সম্ভাব্য একটা অর্থ হতে পারে–সে বেঁচে নেই।

একটা অপরাধ-বোধ জাগল রানার মনে। আরও আগে আরও বেশি খোঁজ-খবর করা উচিত ছিল ওর। কে জানে, হয়তো অভিমান করেই নিজের পরিচিত দুনিয়া থেকে সরে গেছে সে।

হঠাৎ রানা অনুভব করল নীচে নামছে প্লেন। জানালা দিয়ে টার্মিনাল ভবনটাকে দেখতে পেল ও, সামরিক বাহিনীর লোকজন ঘিরে রেখেছে ওটা।

নিরাপদেই ল্যান্ড করল প্লেন। সামনের পকেট থেকে ব্রিফকেসটা তুলে নিয়ে সিট ছাড়ল রানা। আইল ধরে হাঁটছে।

রানার পিছনে রেইনকোট পরা এক লোককে দেখা গেল। একজন মরমন। নাম আব্রাহাম। বত্রিশ বছর বয়স লোকটার। চোখে অত্যন্ত পুরু লেন্সের চশমা। রেইনকোটের নীচে কালো সুট পরে আছে সে।

লন্ডন থেকে দিল্লি আসার পথে রানার সঙ্গে একই প্লেনে ছিল লোকটা। রানা তখনও তাকে দেখেছে, তবে একজন নিগ্রোর নিখুঁত ছদ্মবেশে, চোখে ছিল সানগ্লাস।

চার্টার করা প্লেনটায় সাংবাদিক হিসাবে জায়গা করে নিয়েছে মেজর আব্রাহাম। এখনকার চেহারা ছদ্মবেশের ফল নয়, এটাই তার আসল চেহারা–স্বাস্থ্যবান শিশুর মত ফোলা ফোলা, প্রায় গোলাকার মুখ, যেন তার মত নিরীহ ভালোমানুষ ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয়টি নেই।

কাস্টমস শেডে ঢোকার সময়ও রানার ঠিক পিছনে থাকল আব্রাহাম।

টার্মিনাল ভবনের ভিতর, একটা বুকস্টলে, রানার জন্য অপেক্ষা করছিল রঘুবীর শঙ্করজি।

ওর এজেন্সির কাঠমাণ্ডু শাখার উপর নজর রাখা হতে পারে, এই সন্দেহ থেকে ওদের সঙ্গে যোগাযোগই করেনি রানা। তার বদলে পরিচিত একটা ট্র্যাভেল এজেন্সির অফিসে ই-মেইল পাঠিয়ে জানিয়েছে, ওর একজন গাইড লাগবে, ট্র্যাভেল এজেন্সির মালিক শঙ্করজি রানাকে ভ্রমণবিলাসী একজন ভারতীয়, মিস্টার মোহনচাঁন্দ গোখলে বলে জানে।

'নমস্তে, মিস্টার গোখলে, নমস্তে,' রানাকে দেখে কপালে জোড়া হাত তুলে নমস্কার করল রঘুবীর শঙ্করজি। 'আবার দেখা হওয়ায় বড়ই তৃপ্তি বোধ করছি। প্রায় বছর তিনেক এদিকে

আপনার আসা হয়নি।' রানা দ্রুত পায়ে হাঁটছে, ওর পাশে থাকার জন্য হাড্ডিসার ছোটখাট লোকটাকে প্রায় দৌড়াতে হচ্ছে।

'হ্যাঁ, তা হবে,' টার্মিনাল ভবন থেকে বেরিয়ে এসে বলল রানা।

'মিস্টার গোখলে!' হঠাৎ থমকে দাঁড়াল শঙ্করজি, চোখ আটকে আছে রাস্তার ওপারের ব্যস্ত ফুটপাতে। 'সার, আপনাকে কি কেউ ফলো করছে?'

'ফলো···কই, আমার অন্তত জানা নেই। কেন, কী দেখলেন?'

'তা হলে বোধহয় কিছু না,' বলল শঙ্করজি, 'সন্ধ্যা হয়ে এসেছে তো, ভুলভাল দেখছি।'

শঙ্করজির দৃষ্টি অনুসরণ করে রাস্তার ওপারটা খুঁটিয়ে দেখল রানা। ফুটপাত আর সারি সারি দোকানগুলোয় উপচে পড়ছে ভিড়। বেশিরভাগই ট্যুরিস্ট। তাদের অনেকে রাস্তার এদিকে তাকিয়েও রয়েছে। এর মধ্যে সন্দেহ করার মত কিছু নেই। 'আপনাকে একটা কাজ দিয়েছিলাম ই-মেইলে,' বলল রানা। 'সেটা করেছেন?'

'জী, মিস্টার গোখলে,' বলল শঙ্করজি। 'সার, কাঠমাণ্ডু থেকে ঝাঝরকোট প্রায় আড়াইশো মাইল। ওখান থেকে জুমলা আরও পঞ্চাশ মাইল। হিমালয়ের কাছাকাছি হওয়ায় ওদিকের আবহাওয়া সবসময়েই খারাপ। এখানে-সেখানে জমে থাকা বরফ সবচেয়ে বড় বাধা। টেলিফোন লাইন কোথাও আছে, কোথাও নেই।'

'মিস ফাহিমার কোন খোঁজ পাননি?'

'দুঃখিত, সার।' মাথা নাড়ল শঙ্করজি। 'ওদিকের পাহাড়ী ঢালে স্থানীয় মাস্তানরা পপির চাষ করে। খুন, ডাকাতি, রেপ লেগেই আছে। খবর যোগাড় করা কঠিন।'

গম্ভীর দেখাচ্ছে রানাকে। 'ওরকম জায়গায় বিদেশী একটা মেয়ের কি টিকে থাকা সম্ভব?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল শঙ্করজি।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে রানা বলল, 'তবু একবার দেখে আসতে হবে আমাকে। কীভাবে যাব জুমলায়?'

'এ-ব্যাপারে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারব। ওদিকের পার্কিং এরিয়ায় তাকান। কালো রঙের একটা মার্সিডিজ দেখতে পাচ্ছেন? রেন্ট-আ-কার থেকে আপনার জন্যে আনিয়েছি। গাইড হিসেবে আমি নিজে...'

মাথা নাড়ল রানা। 'একটু ব্যাখ্যা করি, মিস্টার শঙ্করজি। এটা একান্তভাবে আমার ব্যক্তিগত একটা...কী বলব, অনুসন্ধান। অত্যন্ত গোপনীয়ও বটে। তবে আমি জানি, আপনার কাছ থেকে কেউ কিছু জানতে পারবে না।'

'অসম্ভব। ধন্যবাদ, মিস্টার গোখলে।'

রাস্তা পেরিয়ে আরও পঞ্চাশ গজ হাঁটল ওরা, তারপর পার্কিং লটে ঢুকে কালো মার্সিডিজের পাশে থামল। শঙ্করজির বাড়ানো হাত থেকে চাবিটা নেওয়ার সময় জিজ্ঞেস করল রানা, 'জুমলা থেকে মাইল পাঁচেক পশ্চিমে যেতে হবে আমাকে। জায়গাটার নাম জুমলা মেইন। ওদিকের রাস্তা সম্পর্কে একটা ধারণা দিন।'

'যতটা খারাপ হওয়া সম্ভব। আপনার কাজ হবে বরফ এড়িয়ে চলা। ম্যাপে যে পথটা দেখিয়েছে, ওটা ধরেই এগোবেন। ড্যাশবোর্ডে পাবেন ওটা।'

পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করে শঙ্করজির হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'অসংখ্য ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে।' গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল ও।

শঙ্করজির চিহ্নিত ম্যাপ ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ি চালাচ্ছে রানা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে চারদিকের পাহাড়গুলোকে সচল ভূত আর দৈত্য বলে মনে হতে লাগল। ওর নীচে একের পর এক গিরিপথ পড়ছে, অন্ধকারে সেগুলোকে দেখতে না পাওয়ায় খুশি ও।

খানিক পর পরই পথ আটকেছে জমাট বাঁধা বরফ, খাদের

কিনারা ঘেঁষে পাশ কাটাবার সময় গাড়ি খুব সাবধানে চালাচ্ছে রানা। জায়গা খুব কম থাকলে গাড়ি থামিয়ে নীচে নামতে হচ্ছে, এখানে বরফ ভেঙে রাস্তা চওড়া করে না নিয়ে উপায় নেই।

নির্জন পার্বত্য এলাকা। শেষ লোকালয়টা প্রায় তিন ঘণ্টা হলো পিছনে ফেলে এসেছে রানা। রাস্তার ধারে টেলিফোনের তার নেই, নেই লাইটপোস্ট। এরকম অবিরাম শীতের দেশে জীবনধারণ নিশ্চয়ই খুব কঠিন। পৃথিবীর ছাদ বলা হয়–সত্যি তাই। তবে বড় বেশি নির্জন ছাদ।

গাড়ি একপাশে থামিয়ে ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নিল রানা। আহ্, এক কাপ গরম কফি পেলে বড় ভালো হত! কিন্তু মাইলের পর মাইল পার হয়ে এল গাড়ি, রাস্তার ধারে দোকান-পাট বলে কিছুই চোখে পড়ল না।

তারপর হঠাৎ, কোথায় এল ম্যাপে চোখ বুলিয়ে দেখে নেওয়ার আগেই, একটা লোকালয়ে পৌঁছে গেল রানা।

কোথাও কোন সাইনবোর্ড নেই, মাইলস্টোনও চোখে পড়েনি। রাস্তার ধারে মার্সিডিজ থামিয়ে আলো জ্বালল রানা, তারপর ম্যাপটা খুলল। শঙ্করজির ম্যাপে সবুজ একটা রেখা আছে, সেটা জুমলা আর জুমলা মেইনকে পাশ কাটিয়ে কিছুটা সামনে চলে যাওয়ার পর আবার বাঁক নিয়ে জুমলা মেইনে ঢুকেছে। রাস্তা খুব খারাপ, গাড়ি চালাবার উপযোগী নয়, তাই এভাবে এগোতে বলা হয়েছে ওকে। কিন্তু ম্যাপে চোখ বুলাবার কথা মনে না থাকায় সবুজ রেখা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে এসেছে ও। তবে অন্য যেখানেই আসুক, দুই জুমলা থেকে খুব একটা দূরে নয় এই জায়গা।

মাটির পাঁচিল, ছাপড়ার ঘর, কাত হয়ে থাকা কুঁড়ে, ইঁটের দু'একটা বাড়ির মাঝখান দিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। এভাবে লোকালয়ের মাঝখানে পৌঁছাল। ইঁট বিছানো রাস্তা, চওড়া গলিই বলা উচিত। দু'একটা টং বা দোকান দেখা যাচ্ছে।

মার্সিডিজ থামাল রানা। সঙ্গে সঙ্গে একটা কর্কশ শব্দ ঢুকল কানে, যেন কাছাকাছি কোথাও থেকে একটা গাড়ির ইঞ্জিন খক্ খক্ করে উঠল।

নড়ছে না রানা, কান পেতে অপেক্ষা করছে। এ-ও কি সম্ভব, সেই কাঠমাণ্ডু থেকে ওর পিছু নিয়ে এসেছে কেউ? নাহ্, তা কী করে হয়! প্রায় দশ ঘণ্টা গাড়ি চালাচ্ছে ও, পেরিয়ে এসেছে তিনশো মাইল পাহাড়ী পথ—পিছনে কেউ লেগে থাকলে ঠিকই টের পেত।

ভুল শুনেছে ভেবে গাড়ি থেকে নামল রানা, তবে সাবধানের মার নেই ভেবে জ্যাকেটের পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখল, প্রয়োজনের সময় যেন দ্রুত নাগাল পেতে পারে।

ভাবতে আশ্চর্য লাগছে এরকম একটা দুর্গম আর প্রত্যন্ত জায়গায় কীভাবে থাকে ফাহিমা। মুক্ত মনের আধুনিক শিক্ষিতা মেয়ে সে, সভ্যতার স্পর্শ ছাড়া কীভাবে বাঁচবে। এখানে পপি চাষ হয়, কাজেই আইন-শৃংখলা না থাকারই কথা।

রাস্তা ধরে কেউ একজন এদিকে আসছে। আধখানা চাঁদের নিষ্প্রভ আলোয় সন্দেহ হলো, প্রকাণ্ডদেহী লোকটা টলছে। হ্যাঁ, একজন মাতাল; এলোমেলো পা ফেলে হেঁটে আসছে। বাতাসে হাত নেড়ে কাকে যেন হুমকি দিচ্ছে লোকটা, বিড়বিড় করে বোধহয় গালিও দিচ্ছে। লোকটার গায়ে পশমের তৈরি ঢোলা একটা কোট। কাছাকাছি আসতে বাতাসে টক-টক একটা গন্ধ পেল রানা। সম্ভবত চোলাই করা দেশী মদ গিলেছে।

হঠাৎ রানাকে দেখতে পেয়ে ভয় পেল লোকটা, থমকে দাঁড়িয়ে সন্দেহের দৃষ্টিতে মাপল ওকে, তারপর সাবধানে পাশ কাটাবার চেষ্টা করল। হাসি মুখে একটা হাত বাড়িয়ে দিল রানা, তালু চিৎ করে রেখেছে—অভয়দানের একটা সঙ্কেত।

দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা, তবে ভয় কাটিয়ে কাছে এল না।

'এক মিশরীর মেয়েকে খুঁজছি আমি,' নেপালী ভাষায় বলল রানা। 'আর্কিওলজিস্ট। তার নাম হিমা—ফাহিমা। চেনেন?'

কথা না বলে এখনও সন্দেহের দৃষ্টিতে রানাকে দেখছে লোকটা। তারপর হঠাৎ বলল, 'নিশ্চয়ই পুলিশ!'

মাথা নাড়ল রানা। 'ভুল করছেন। আমি পুলিশ নই। মিস ফাহিমার বন্ধু। এ এলাকায় ওই নামে বিদেশী কোন মেয়ে আছে কিনা আপনি জানেন?'

'অ। বুঝেছি।' আবার টলছে মাতাল লোকটা। 'তা হলে আফিম কিনতে এসেছে।'

'আরে না! বলছি না মিস ফাহিমা...'

'ওই দিকে!' হঠাৎ ডানদিকের একটা গলি দেখিয়ে বলল লোকটা। 'জুমলা নাইটক্লাবে চলে যান।'

রানা হতবাক—এখানে আবার নাইটক্লাব? সেদিকে তাকাতে সাদা একটা আলো দেখতে পেল ও। ও তাকিয়েছে, এই সুযোগে ওকে পাশ কাটিয়েই দৌড় দিল লোকটা।

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিতে যাবে রানা, পঞ্চাশ কি ষাট গজ পিছন থেকে এক লোকের কাতর চিৎকার ভেসে এল। সম্ভবত মাতাল লোকটাই, ভাবল রানা। হয়তো কোন গর্তে পড়ে ব্যথা পেয়েছে।

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বাঁক নিল রানা। গলির ভিতর ঢুকে লম্বা একটা বাড়ির সামনে থামল। বাড়িটা পাকা নয়; গাছের পাতা, ডাল, বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি। তিনটে বড় আকারের কামরা নিয়ে বাড়িটা। দরজার মাথায় ছোট্ট একটা তোবড়ানো সাইনবোর্ডে সত্যি সত্যি লেখা রয়েছে—'জুমলা নাইট ক্লাব।'

মার্সিডিজের দরজা খুলে নীচে নামছে রানা, এই সময় কানে লাগল আওয়াজটা—কেউ নিঃসঙ্গ এক বিষণ্ন বেদুইন উটচালকের মর্মবেদনা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে গিটারে। কুঁড়ের ভিতর হ্যাজাক বাতি জ্বলছে, দেয়ালের ফাঁক-ফোকর দিয়ে বেরিয়ে

আসছে তারই সাদা আলো।

কয়েক পা এগিয়ে তথাকথিত নাইটক্লাবে ঢুকে পড়ল রানা, মনে দুরাশা–এখানে হয়তো কেউ বলতে পারবে কোথায় পাওয়া যাবে ফাহিমাকে।

প্রথম কামরায় ছ'টা টেবিল ফেলা হয়েছে, চব্বিশজন লোক চুপচাপ যে যার নিজের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। আরেক দরজা দিয়ে পাশের ঘরটাও দেখা গেল। সেখানে মদ্যপানের সঙ্গে নৃত্যও চলছে। কুঁড়ে হলে কী হবে, মেঝেতে লম্বা এক ফালি কার্পেটও দেখা যাচ্ছে।

খদ্দেররা সবাই পুরুষ। তাদের উপর চোখ বুলাতে গিয়ে বিস্মিত হলো রানা। শহর বা আধুনিক সুযোগ-সুবিধে থেকে এত দূরে কীভাবে এখানে এল এরা!

আসার কারণটাই বা কী?

এদের মধ্যে পাহাড়ী গাইড শেরপা, স্থানীয় মাস্তান, মঙ্গোলিয়ান, চাইনিজ, ভারতীয়, পাকিস্তানী, তিব্বতী, সিকিমিজ আর ভুটানী ট্যুরিস্ট থেকে শুরু করে সুইস, সুইডিশ, জার্মান, ফ্রেঞ্চ আর ব্রিটিশ পর্বতারোহী পর্যন্ত সবাই আছে।

এরকম একটা অভিশপ্ত জায়গায় লোকগুলো কেন ভিড় করেছে আন্দাজ করতে পারল রানা। সীমান্ত কাছাকাছি হওয়ায় ড্রাগ আর আর্মস ডিলারদের জন্য ছোটখাট একেকটা স্বর্গ জুমলা শহরের বাইরে এই নগণ্য গ্রামগুলো। ঘুষ দিয়ে পাহাড়ে চড়ার অনুমতি সংগ্রহ করে তারা, তারপর এখানে এসে অবৈধ পণ্য কিনে অন্য কোন দেশে পাচার করে।

দ্বিতীয় কামরার দরজায় এসে দাঁড়াল রানা। এটা বেশ বড়। ছোট্ট একটা স্টেজে দাঁড়িয়ে রয়েছে গিটারিস্ট–একটা মেয়ে। অন্যদিকে তাকাতে যাবে ও, হঠাৎ চুম্বকের মত আটকে গেল ওর দৃষ্টি। হার্টবিট বেড়ে গেছে।

জিনসের প্যান্ট আর লাল গেঞ্জি গায়ে গিটারিস্ট ডক্টর

জাওয়াদের মেয়ে–ফাহিমা! নাহ্, কোন সন্দেহ নেই। কোঁকড়ানো কালো চুল ফরসা মুখটাকে অলংকৃত ফ্রেমের মত বেঁধে রেখেছে।

গিটার বাজানো বন্ধ করে বার কাউন্টার-এর দিকে তাকাল ফাহিমা। বারম্যান একজন বেঁটেখাট চ্যাপ্টা মুখো নেপালি। তার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে যেন একটা সঙ্কেত দিল সে।

'দুটো বাজতে চলেছে। ক্লাব এখন বন্ধ হয়ে যাবে,' বারম্যান প্রথমে ইংরেজিতে, তারপর নেপালি ভাষায় বলল। 'দয়া করে আজকের মত আসুন আপনারা।'

ধীরে ধীরে টুল আর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াচ্ছে খদ্দেররা। সবাই যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, রানা তখন ভিতরে ঢুকে একপাশে দাঁড়াল।

দ্বিতীয় কামরা খদ্দেরশূন্য হয়ে গেল। ক্লান্ত পায়ে হেঁটে বার-এর পিছনে চলে গেল ফাহিমা, হাতের গিটারটা নামিয়ে রাখল বারে। তারপর মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল। হ্যাজাক বাতির তীব্র আলো কাছ থেকে চোখে লাগায় ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা রানাকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না সে। 'এই যে, শুনছেন? আপনি কালা নাকি? ক্লাব বন্ধ হয়ে গেছে, এবার কেটে পড়ুন।'

রানা কিছু বলছে না বা নড়ছেও না।

বার ঘুরে বেরিয়ে আসছে ফাহিমা। আলোর উৎস তার পিছনে পড়তে এবার রানাকে পরিষ্কার দেখতে পেল সে। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'হাই, ফাহিমা,' বলল রানা।

ফাহিমা নড়ছে না।

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে শুধু। 'কেমন আছ?' পা বাড়াল রানা। একটা বার টুলে বসল।

ব্যাপারটা এমন আচমকা ঘটে গেল, বাধা দেওয়ার সময়ই পেল না রানা। হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলে গেছে ফাহিমার শরীরে। পরমুহূর্তে ঠাস করে একটা চড় এসে লাগল রানার গালে।

টুল থেকে পড়েই যাচ্ছিল রানা, বার কাউন্টার ধরে শেষ

মুহূর্তে কোনরকমে সামলে নিয়েছে। গালে হাত বুলাল ও। 'কারণটা জানতে পারি?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল।

'চলে যান। কে আপনি? আপনাকে আমি চিনি না! প্লিজ, গো।'

'নিশ্চয়ই এখানে কোন ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার আছে,' বলল রানা। 'নাকি এটা তোমার জমে থাকা এক ধরনের ক্ষোভ?'

'আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই না।' পাথরের নিষ্প্রাণ মূর্তির মত স্থির হয়ে আছে ফাহিমা, শুধু ঠোঁট জোড়া নড়ল। 'কাউকে আমার কিছু বলার নেই।'

'কিন্তু কেউ চড় মারলে তার কারণটা জানার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে।' রানা সচেতন, নেপালী বারটেন্ডার একটা খাটো কুড়ালের হাতলে অনবরত হাত বুলাচ্ছে। লোকটার চ্যাপ্টা চেহারা আর ছোট ছোট চোখ রীতিমত ভীতিকর।

'ঠিক আছে, দর্জি। ব্যাপারটা আমি সামলাচ্ছি,' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে রানাকে দেখাল। 'তুমি বাড়ি যাও।'

কুড়ালের হাতলটা বার-এর উপর নামিয়ে রাখল দর্জি। ফাহিমা মাথা ঝাঁকাতে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

দর্জি চলে যেতেই ফাহিমা বলল, 'চড় মেরেছি...সেজন্যে আমি ক্ষমা চাইছি। এবার দয়া করে আপনি চলে যান।'

'কিন্তু কারণটা তো আমার জানা হলো না। বোধহয় কোন অন্যায় করেছি আমি। কী সেটা?'

'আচ্ছা? কী অন্যায় করেছেন আপনি জানেন না?' হঠাৎ হেসে উঠল ফাহিমা। 'শুনুন, আপনার আসল পরিচয় আব্বু আমাকে দু'বছর আগেই জানিয়েছিলেন। আপনি একজন দুর্ধর্ষ স্পাই, নির্বিকারচিত্তে পটাপট মানুষ মারেন। ঠিক কিনা?'

'স্পাই, হ্যাঁ,' বলল রানা। 'তবে পটাপট মানুষ মারি, এটা মিথ্যে অভিযোগ। যাই হোক, তাতে কী হলো?'

'তাতে কী হলো? তাতে এই হলো যে নিরীহ নিরপরাধ

একজন মানুষ, যিনি কিনা আপনাকে জুনিয়র বন্ধু হিসেবে গভীর স্নেহ করতেন, আপনার চোখের সামনে খুন হয়ে যাওয়ায় সবাই আশা করেছিল আপনি অবশ্যই তার প্রতিশোধ নেবেন। কিন্তু প্রতিশোধ নেয়া তো দূরের কথা, আপনি সেই প্রিয় ব্যক্তির একমাত্র মেয়েটি কেমন আছে কোথায় আছে সে খবরটা পর্যন্ত রাখার প্রয়োজন বোধ করেননি!' তারপরই ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল ফাহিমা।

টুল ছেড়ে দাঁড়াল রানা, এগিয়ে এসে তার সামনে থামল। দোষ যদি কাউকে দিতে হয় তো ওর এই পেশাকে। দেশ যখন ডাকে, ভুলে যেতে হয় সব–মনে থাকে না আর কে কী আশা করছে ওর কাছ থেকে, কে অভিমানে দূরে সরে গেল, কে ভুল বুঝে ব্যথা পেল। 'কিন্তু ফাহিমা, আমি তোমার খোঁজ করিনি এটা তো সত্যি নয়। কত জায়গায় যে ই-মেইল পাঠিয়েছি...'

'তখন আর খোঁজ করে লাভ কী? ততদিনে আমি বুঝে গেছি পল ভিতেরা আপনার হিট লিস্টে নেই, তাই সাড়া দেয়ার প্রয়োজন বোধ করিনি।'

'আমাকে তুমি ভুল বুঝেছ, ফাহিমা,' মৃদু কণ্ঠে, তবে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল রানা। 'যে-কোনও কাজের জন্য উপযুক্ত সময় আর সুযোগের দরকার হয়। ব্যস্ত একজন লোকের পক্ষে এ দুটোকে এক সঙ্গে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। পল ভিতেরা আমার তালিকায় ছিল না, বা নেই, এটা তোমার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।'

'কী বলতে চাইছেন পরিষ্কার হচ্ছে না...' রানার দিকে নয়, অন্যদিকে তাকিয়ে রয়েছে ফাহিমা।

'বলতে চাইছি এবার পল ভিতেরার সময় ফুরিয়েছে। আমি তোমার কাছে একটা জিনিসের খোঁজে এসেছি। প্রতিশোধ নিতে হলে ওটা আমার দরকার। কিন্তু তার আগে বলো, এখানে কী করছ তুমি?'

'মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে অভিশাপ দিচ্ছি ভাগ্যকে' বলল

ফাহিমা। 'সেই সঙ্গে ভুলে থাকার চেষ্টা করছি আব্বুর এমন একজন বন্ধু ছিল যে ইচ্ছে করলেই তার খুনের বদলা নিতে পারত।'

'আগেই বলেছি, চাইলেই প্রতিশোধ নেয়া যায় না,' বলল রানা। 'সুযোগের অপেক্ষা করতে হয়। ওর চুরি করা স্বর্ণমূর্তিটার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার? ওটা আর ওর কাছে নেই।'

'বেচে দিয়েছে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'কেড়ে নেওয়া হয়েছে।'

'কোথায় ওটা এখন?'

'যার কাছে থাকা উচিত, তারই কাছে। ফাহিমা নামে একটা মেয়ের ফ্ল্যাটে, ওয়ারড্রোবের ভেতর, জামা-কাপড়ের নীচে।' কিছু বলতে যাচ্ছিল ফাহিমা, হাত তুলে থামাল ওকে রানা। 'উনি তোমার বাবা ছিলেন, আমার ছিলেন বাবা ও বন্ধু। ভুলেও ভেবো না, ভিতেরাকে আমি ছেড়ে দেব। ওকে জন্মের মত শায়েস্তা করার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম, হঠাৎ এসে গেছে সে সুযোগ।'

হাঁ করে চেয়ে রানার কথাগুলো শুনল ফাহিমা। তারপর চট্ করে রানার পা ছুঁয়ে হাতটা কপালে ঠেকাল।

'মাফ চাই, মাসুদ ভাই!'

'ব্যস, চাওয়া মাত্র পেয়ে গেছ।'

'কী আছে আমার কাছে, যা নিতে এসেছেন, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল ফাহিমা। 'কবেই তো আমি সব জিনিস বিক্রি করে দিয়েছি।'

'সব? স-ব বেচে দিয়েছ?' মুখ শুকিয়ে গেল রানার।

'আপনাকে হতাশ লাগছে। অনুভূতিটা কেমন, মাসুদ ভাই?'

কথা না বলে তাকিয়ে থাকল রানা।

'আপনাকে এরকম অসহায় দেখে মায়া লাগছে আমার,' বলল ফাহিমা। 'এতদিন ঠিক এমনি অসহায় লেগেছে আমার। গলা ভেজাবেন? কিছু দেব?'

'একটা বিয়ার দিতে পারো।'

'শুধু বিয়ার? আমার তো সবই চলে—স্কচ, ভোদকা, জিন।'

'নিজের স্বাধীনতার মাত্রা বোধহয় একটু বেশিই বাড়িয়ে নিয়েছ,' সামান্য তিরস্কারের সুরে বলল রানা।

'আমি মনে করিনি কখনও কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এখন দেখছি সত্যিই তা হলে আছে একজন!'

'কতবার বলব, দেরি হয়ে যাওয়ায় আমি দুঃখিত?'

গ্লাসে বিয়ার ঢেলে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল ফাহিমা। তারপর বারে একটা কনুই রেখে ঝুঁকে তাকাল। 'জিনিসটা কী, মাসুদ ভাই? আছে তো ওটা আমার কাছে?'

'আছে।'

'তা হলে বলুন কী জিনিস। কে জানে, যার কাছে বেচেছি তাকে হয়তো খুঁজে বের করতে পারব।'

'একটা ব্রোঞ্জ পিস, সূর্যের আদলে তৈরি। গায়ে একটা ফুটো আছে, মাঝখান থেকে সামান্য দূরে। লাল একটা স্ফটিকও আছে ওটায়। অনেকটা তোমার গলার ওই লকেটটার মত। অনেক পুরনো জিনিস, কোনও স্টাফ বা লাঠির মাথা থেকে খোলা হয়েছে। শুনে পরিচিত মনে হচ্ছে?'

'হচ্ছেই তো!' হাসল ফাহিমা। গলা থেকে চেন খুলে লকেটটা দেখাল, 'দেখুন তো এই রকম কি না?'

'আমি তো আসলে চিনি না। তোমার আব্বুর জিনিস ওটা, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস; এরকম হেলাফেলা করে গলায় পরে বেড়াবার মত জিনিস নয়।'

হেসে উঠল ফাহিমা। বার কাউন্টারে রাখা এক কুৎসিতদর্শন তামার মূর্তির গলায় পরিয়ে দিল ওটা।

'মনে হচ্ছে আপনার খুবই দরকার জিনিসটা।'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, কাল সকালে এসে নিয়ে যাবেন ওটা। তবে তার

আগে আমাকে জানাতে হবে, কেন দরকার ওটা আপনার।'

'ঠিক আছে।'

'কাল ঠিক দশটায়, কেমন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল রানা।

গাড়িতে বসে শীতে কাঁপছে রানা। ভাবল আশপাশে নিশ্চয়ই কোথাও হোটেল বা সরাইখানা আছে, ফাহিমাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেওয়া উচিত ছিল কোন্ দিকে যেতে হবে। ওর পক্ষে খুঁজে বের করা সহজ হবে না। এত রাতে রাস্তায় কোন লোকজন নেই, কে ওকে পথ দেখাবে?

কয়েক মিনিট পর গাড়ি নিয়ে ধীর গতিতে এগোল রানা। ফিরতি পথ না ধরে সামনে যাচ্ছে।

রাস্তার ওপারে একটা আধ পাকা দালান। সেটার পাশে গাঢ় ছায়ার ভিতর রেইনকোট পরা সেই মরমন লোকটা, আব্রাহাম, লুকিয়ে রয়েছে। রানা মার্সিডিজ নিয়ে চলে যেতেই রাস্তায় নেমে এল সে, তার পিছু নিয়ে বেরিয়ে এল সাতজন ভাড়াটে সৈনিক–একজন আমেরিকান মেজর, একজন গুর্খা ক্যাপটেন, সাবমেশিন গান হাতে একজন মঙ্গোলিয়ান হাবিলদার আর তার অধীনে চারজন সিপাই। তিনজনই সেনাবাহিনী থেকে পলাতক বা বিতাড়িত। আমেরিকান মেজরের এক চোখে কালো পট্টি বাঁধা।

ফাহিমার নাইটক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে মার্সিডিজের লাল টেইল লাইটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তারা।

সাত

কয়লার গনগনে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফাহিমা, হাতে একটা পোকার। আগুনটাকে খোঁচাচ্ছে, ছোট হয়ে আসা শিখাগুলো আবার লকলকিয়ে উঠল। হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

এ কান্না তার নিজের প্রতি করুণাবশত। শিক্ষিত মেয়ে, দেরিতে হলেও পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পেরেছে মাসুদ রানার প্রতি রাগ বা অভিমান করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ছিল না তার। ব্যাপারটা ঘটে গেছে স্রেফ আবেগের রশি টেনে রাখতে ব্যর্থ হওয়ায়।

রাতটা রানা কোথায় কাটাবে ভেবে এখন খুব খারাপ লাগছে ফাহিমার। এই গ্রামে রাত কাটানোর কোন জায়গা নেই দেখে মাসুদ ভাই কি ফিরে আসবে? না কি খোলা আকাশের নীচে গাড়িতেই ঘুমাবার চেষ্টা করবে?

অলস পায়ে বারের সামনে চলে এল ফাহিমা। তারপর বারের উপর শো পিস হিসাবে রাখা মূর্তির গলায় ঝুলানো চেনের লকেটটা একটু দুলিয়ে দিল।

খাটো তামার মূর্তির গলায় ঝুলে থাকা বিচিত্র লকেটটার দিকে আরেকবার তাকাল সে। এই সময় শব্দ হলো দরজায়। ঝট্ করে ঘুরেই চমকে উঠল। একজন বা দু'জন নয়, দ্বিতীয় ঘরের ভিতর একে একে আটজন লোক ঢুকে পড়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিল ফাহিমা, এরা বিপদ। আর এই বিপদ সম্ভবত মাসুদ ভাই-ই সঙ্গে করে এনেছে। 'দুঃখিত,' বলল সে। 'আমরা বন্ধ করে দিয়েছি।'

রেইনকোট পরা লোকটা, আব্রাহাম, হাসল। 'আমরা গলা ভেজাতে বা ফুর্তি করতে আসিনি, ম্যাডাম,' বলল সে।

'মানে?' সাবমেশিন গান বাগিয়ে ধরা মঙ্গোলিয়ান লোকটার দিকে তাকাল ফাহিমা। ঢোক গেলার ঝোঁকটাকে অনেক কষ্টে দমিয়ে রাখছে। তামার মূর্তিটার কথা ভাবল সে। বার-এ রয়েছে, গলায় ঝুলছে চেইনসহ লকেটটা। চোখে পট্টি বাঁধা শ্বেতাঙ্গ ওটার খুব কাছে হেঁটে গেল। 'কী চান আপনারা?' জানতে চাইল সে।

'ঠিক যে জিনিসটা তোমার বন্ধু মাসুদ রানা খুঁজছে,' এক চোখো লোকটা জবাব দিল। 'ওটার কথা নিশ্চয়ই তোমাকে জিজ্ঞেস করেছে সে।

'কই, না তো।'

'না? তারমানে কি জিনিসটা পেয়ে গেছে সে?' জানতে চাইল আব্রাহাম।

'আপনাদের কথা কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।' পালা করে লোকগুলোকে আরেকবার দেখছে।

রেইনকোট খানিকটা গুটিয়ে নিয়ে একটা টুলে বসল আব্রাহাম। 'আমার নাম আব্রাহাম—মেজর আব্রাহাম। রানা তোমাকে একটা মেডেলের মত জিনিসের কথা বলেছে। ঠিক?'

'কে আমাকে কি বলেছে না বলেছে, আপনারা জানতে চাওয়ার কে?' পিস্তলটার কথা ভাবছে ফাহিমা—কীভাবে ওটার নাগাল পাওয়া যায়। দেরাজের ভিতর আছে...

'আমরা মার্সেনারি,' কঠিন সুরে বলল আব্রাহাম। 'খুন করে অভ্যস্ত। আমাদের সঙ্গে শয়তানি করলে ফল ভালো হবে না।'

'বেশ, বুঝলাম। কাল ফিরে আসছেন তিনি, আপনারাও তাই আসুন। এখানে আমরা জিনিসটাকে নিলামে তুলি—এতই যখন

আগ্রহ আপনাদের।'

মাথা নাড়ল আব্রাহাম। 'না। জিনিসটা আজ এখনই চাই আমাদের।' টুল ছেড়ে দাঁড়াল সে, আগুনটার দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর ঝুঁকে গনগনে আগুন থেকে পোকারটা টেনে বের করল।

হাই তোলার ভান করল ফাহিমা। 'আমার কাছে নেই ওটা। কাল আসুন। এখন আমি ক্লান্ত।'

'তুমি ক্লান্ত? তাতে আমার কী?' মাথা ঝাঁকিয়ে সঙ্কেত দিল আব্রাহাম।

সাবমেশিন গান কাঁধে ঝুলিয়ে তৈরি হয়েই ছিল দশাসই মঙ্গোলিয়ান হাবিলদার, পিছন থেকে ফাহিমাকে খপ করে ধরল সে, ধরেই তার হাত দুটো মুচড়ে পিছন দিকে নিয়ে এল।

আব্রাহামের হাতে পোকার। ডগাটা টকটকে লাল হয়ে আছে। ফাহিমার দিকে এগিয়ে আসছে সে।

'দেখুন, আপনারা কী চান বুঝতে পারছি আমি,' তাড়াতাড়ি বলল ফাহিমা। 'বেশ, ঠিক আছে, এ নিয়ে আলাপ করতে রাজি আছি আমি।'

'বেশ, বেশ।' এমন একটা শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল আব্রাহাম, যেন ভায়োলেন্স সহ্যই করতে পারে না সে। অথচ তারপরও ধীরে ধীরে ফাহিমার দিকে এগিয়ে আসছে, পোকারটা লম্বা করে তার মুখের কাছাকাছি সরিয়ে আনছে।

মুখের চামড়ায় আগুনের আঁচ পাচ্ছে ফাহিমা। ছ্যাঁকা খাওয়ার ভয়ে মুখটা একবার এদিকে ঘুরিয়ে নিচ্ছে সে, একবার ওদিকে; একই সঙ্গে চলছে হাবিলদারের কঠিন বাঁধন থেকে ধস্তাধস্তি করে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা। কিন্তু লোকটার গায়ে অসম্ভব জোর।

'থামো!' চেঁচিয়ে উঠল ফাহিমা। 'বলছি কোথায় আছে ওটা!'

হাসল আব্রাহাম। 'সুযোগটা তুমি হারিয়েছ, ম্যাডাম।'

লোকটা স্যাডিস্ট, বুঝল ফাহিমা। তার কাছে ওই জিনিসটার

কোনও গুরুত্ব নেই, গুরুত্বপূর্ণ হলো ওই গরম পোকার আমার মুখটা কীভাবে পোড়ায় সেটা দেখা।

হঠাৎ মরিয়া হয়ে মঙ্গোল হাবিলদারের হাতে কামড় দেওয়ার চেষ্টা করল ফাহিমা। কোন লাভ হলো না, গালে চড় খেয়ে কেঁদে ফেলল সে।

পোকারটাকে একেবারে নাকের সামনে সরে আসতে দেখে কান্নাও ভুলে গেল ফাহিমা। এত কাছে যে ইঞ্চি দিয়ে মাপা যায়।

পাঁচ ইঞ্চি। চার। তিন। দুই।

গরম লোহার অসুস্থকর গন্ধ ঢুকল নাকে।

কিন্তু তারপর–

তারপর সবকিছু এত দ্রুত ঘটতে শুরু করল যে অন্তত কয়েক মুহূর্ত দৃষ্টি দিয়ে কিছুই ভালোভাবে অনুসরণ করতে পারল না ফাহিমা–যেন রঙ-তুলি দিয়ে সদ্য আঁকা ছবির উপর বৃষ্টি পড়ছে।

হাতের পোকারটা বল্লমের মত করে ধরে ছিল আব্রাহাম, হঠাৎ তার জুতোর নীচে কার্পেটে টান পড়ায় হোঁচট খাওয়ার ভঙ্গিতে টলে উঠল সে। আত্মরক্ষার জন্য সাঁৎ করে একপাশে সরে গেল হাবিলদার, তার দেখাদেখি ফাহিমাও। আব্রাহামের হাত থেকে ছুটে গেল পোকারটা–ওটার যেন ডানা গজিয়েছে!

মুখ থুবড়ে পড়ে গেল আব্রাহাম। পোকারটা উড়ে গিয়ে পড়ল বারের পিছনে, ব্রোকেডের ভারী পরদায় জড়িয়ে গেছে, ধোঁয়া উঠছে সামান্য।

ফাহিমা উপলব্ধি করল দশাসই লোকটা ছেড়ে দিয়েছে তাকে। তারপর দেখল দোরগোড়ায় সিধে হচ্ছে মাসুদ রানা, হাতে একটা পিস্তল। বুঝতে বাকি রইল না যে কার্পেট ধরে টানটা ও-ই দিয়েছিল।

এরপর লম্বা কামরার ভিতর নরক ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো। লাফ দিয়ে বার টপকাচ্ছে ফাহিমা, এই সময় কার্পেটে শোয়া অবস্থা থেকে গুলি করল আব্রাহাম। ভালো করে লক্ষ্যস্থির

করতে পারেনি সে, গুলিটা লাগল না ফাহিমাকে। বার টপকে এসে মেঝেতে শরীরটা গড়িয়ে দিল ফাহিমা, ঝনঝন শব্দে কাঁচ ভেঙে পড়ার শব্দ শুনতে পেল।

তারপর হঠাৎ শুরু হয়ে গেল রীতিমত প্রলয়কাণ্ড! কেউ জানে না কোত্থেকে এল তারা, কী-ই বা তাদের পরিচয়। কালো কাপড়ের তৈরি আলখেল্লা পরে আছে, মুখে সাদা মুখোশ। জানালা আর দরজা দিয়ে ক্ষিপ্র ঘূর্ণির মত ভিতরে ঢুকে যাকে সামনে পাচ্ছে তার উপরই ঝাঁপিয়ে পড়ছে তারা। খুন করছে না, মেরে অজ্ঞান করে দিচ্ছে।

তাদের মধ্যে প্যান্ট-শার্ট পরা একটা মেয়েও আছে। তার হাতে চকচকে একটা পিস্তল দেখা যাচ্ছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে গোটা দলটাকে নেতৃত্ব দিচ্ছে এক তরুণ। শুধু ওরা দু'জনই আলখেল্লা পরেনি, শুধু মুখোশ পরে আছে।

সবকিছু ঘটছে একই সঙ্গে। মঙ্গোলিয়ান লোকটা রানার দিকে সাবমেশিন গান তাক করছে। দেখতে পেয়ে কী করা যায় ভাবছে ফাহিমা। তারপর খপ করে বারম্যানের রেখে যাওয়া কাঠের মোটা হাতল ওয়ালা কুড়ালটা তুলে নিয়ে দড়াম্ করে বসিয়ে দিল হাবিলদারের চাঁদিতে। তবে তার আগেই দেখতে পেল, কুড়ালের দরকার ছিল না, কপালের ঠিক মাঝখানে গুলি খেয়ে লোকটা ঢলে পড়ে গেল মেঝেতে।

সবকিছু নিয়ন্ত্রণে চলে আসছে যখন, ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা আর দেয়াল ভেঙেচুরে ভিতরে ঢুকল কেউ একজন, ওগুলো যেন কাগজের তৈরি। মুখ তুলে তাকাতে দৈত্যাকার লোকটাকে চিনতে পারল ফাহিমা—স্থানীয় একজন শেরপা সে, দু'গ্লাস মদ খাইয়ে যে-কেউ তাকে দলে টানতে পারে।

একটা ঘূর্ণির মত বারের ভিতরে ঢুকল, পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার উপর। পিঠে তার দুই হাতের ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল রানা।

এই সময় গর্জে উঠল আব্রাহাম। 'ফেলে দাও! গুলি করে ফেলে দাও দুটোকেই!'

তার গর্জন শুনে চোখে পট্টি বাঁধা লোকটা যেন লাফ দিয়ে জ্যান্ত হয়ে উঠল। পিস্তল ধরা হাতটা লম্বা করে ঘুরছে সে, টার্গেট খুঁজছে। আতঙ্কে চিৎকার দিতে যাবে ফাহিমা, এই সময় দেখতে পেল, প্রাণ বাঁচানোর বেপরোয়া তাগিদে মেঝেতে পড়ে থাকা ওয়ালথারটা লক্ষ্য করে ডাইভ দিয়েছে রানা। পিছনের শেরপাও একই কারণে ওটা হাতে পেতে চায়, তাই একই সঙ্গে ঝাঁপ দিয়েছে সে-ও।

দুজনের হাতই নাগাল পেল অস্ত্রটার। দু'জনেই ধরেছে ওটাকে। কাড়াকাড়ি শুরু হতে ঠাস করে বেরিয়ে গেল একটা গুলি। লক্ষ্যহীন বুলেটটা সরাসরি গিয়ে আঘাত করল একচোখো মার্কিনির গলায়। গুলির ধাক্কায় কামরার আরেক মাথায়, বারের গায়ে ছিটকে পড়ল সে। মেঝেতে পড়ে ফাটল কয়েকটা হুইস্কির বোতল। তাতে আগুনের তেজ বাড়ল আরও।

কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে রানা আর শেরপার হাত থেকে পড়ে গেল ওয়ালথারটা। দু'জনেই আবার সেটার নাগাল পাওয়ার চেষ্টায় গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেতে।

তবে ইতিমধ্যে রানাকে গুলি করার জন্য পরিষ্কার একটা ফাঁক পেয়ে গেছে আব্রাহাম। তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে দাঁতে দাঁত চাপল ফাহিমা, বোঝার চেষ্টা করছে এই মাত্র কুড়িয়ে নেওয়া সাবমেশিন গানটা কীভাবে কাজ করে।

কীভাবে আবার! ট্রিগারে আঙুল পেঁচিয়ে টান দিলেই তো হয়!

তাই করল ফাহিমা। কিন্তু জ্যান্ত প্রাণীর মত ঝাঁকি খাচ্ছে আর লাফ দিচ্ছে অস্ত্রটা। এক ঝাঁক বুলেট আব্রাহামকে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল, তার গায়ে ঘষাও খেল না এক-আধটা। এই সময় হঠাৎ ফাহিমার চোখে পড়ল কমলা রঙের কয়েকটা শিখা। বারের পিছনে ঝুলে থাকা মোটা ব্রোকেডের পরদায় আগুন ধরে গেছে।

শুধু পরদা নয়, লম্বা বার কাউন্টারের একটা দিকও পুড়ছে। পাশেই কুঁড়েঘরের দেয়াল, তাতেও লেগেছে আগুন।

কালো আলখেল্লা পরা লোকগুলো এরই মধ্যে দু'জন সিপাইকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাদের কারও কারও হাতে পিস্তল দেখা গেলেও, রানা আর ফাহিমা আহত হবে ভেবে কেউ তারা গুলি করছে না। ইতিমধ্যে অন্তত রানার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে লোকগুলো আসলে মোসাদের এজেন্ট। আত্মরক্ষার কাজে ব্যস্ত থাকায় ভালো করে তাকাবার সুযোগ না পেলেও, একবার চোখ বুলিয়েই মিরান আর নিশাকে চিনতে পেরেছে ও।

চোখের কোণ দিয়ে ফাহিমা খেয়াল করল, লাফ দিয়ে বার টপকে আগুনের মাঝখানে পড়ল আব্রাহাম। উবু হয়ে বসে আঁচ থেকে গা বাঁচাবার চেষ্টা করছে সে, তাকিয়ে আছে জ্বলন্ত বার-এর উপর বসিয়ে রাখা তামার কুৎসিতদর্শন মূর্তিটার দিকে। আগুন নাগাল পেয়ে যাওয়ায় লালচে হয়ে উঠেছে ওটা।

ফাহিমা বুঝতে পারল, মূর্তিটা নয়, লোকটার চোখ পড়েছে মূর্তির গলায় ঝুলে থাকা চেইনসহ হেডপিসটার উপর। ওর ভালো করেই জানা আছে জিনিসটা কী।

জ্বলন্ত বার-এর দিকে সাপের মত এগোল আব্রাহামের হাত, তারপর খপ করে লকেটটা মুঠোয় ভরে টান দিল সে। চোখে মুখে তৃপ্তির ভাব ফুটল। তবে তা নিমেষের জন্য। তারপরই শোনা গেল তার বুকফাটা আর্তচিৎকার। গরম আগুন হয়ে থাকা মেডেলটা তার তালুর চামড়া পুড়িয়ে দিয়েছে–গালার উপর সিল দেওয়ার মত গভীর ছাপ ফেলেছে ওর হাতের তালুতে।

ব্যথাটা অসহ্য, তাই কিছুতেই জিনিসটা ধরে রাখতে পারল না আব্রাহাম। হোঁচট খেতে খেতে দরজার দিকে এগোল সে, পোড়া হাতের কবজিটা চেপে ধরে রেখেছে।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে শেরপা লোকটার সঙ্গে রানাকে হাতাহাতি লড়াই করতে দেখল ফাহিমা। মোষের মত শক্তিশালী

নেপালীটা রানার চারপাশে চক্কর দিচ্ছে, মাঝে মাঝেই কারাতে কিক আর জুডো চপের প্রচণ্ড আঘাত হানছে সে, কিন্তু প্রতিটা মার হয় ঠেকিয়ে দিচ্ছে রানা অদ্ভুত কৌশলে, নয়তো এড়িয়ে গিয়ে পালটা আঘাত হানছে।

সাবমেশিন গানের ট্রিগার টেনে বা সেটাকে ঝাঁকিয়ে কোন লাভ হলো না, কারণ অস্ত্রটা নিঃশেষ হয়ে গেছে। ফাহিমা ভাবল, এবার তা হলে পিস্তলটা বের করতে হয়। সেটা আছে বার কাউন্টারের একটা ড্রয়ারে।

আগুনের শিখা আর আঁচ থেকে গা বাঁচিয়ে বারের পিছনে চলে এল ফাহিমা দেরাজ খোলার সময় শুনতে পেল তার চারপাশে মদের বোতলগুলো মলোটভ ককটেলের মত বিস্ফোরিত হচ্ছে।

পিস্তলটা হাতে পেয়ে নেপালী লোকটার দিকে তুলল ফাহিমা। একটা নির্ভুল গুলি, প্রার্থনা করল সে।

কিন্তু বেজন্মাটা স্থির হবে না!

ইতিমধ্যে ধোঁয়া ফাহিমাকে অন্ধ করে দিচ্ছে, গলায় আটকে বিষম খাওয়াচ্ছে।

শেরপাকে ঝেড়ে একটা লাথি মারল রানা, শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে সরে এল তার কাছ থেকে। আর ঠিক তখনই নেপালী লোকটার অপেক্ষার অবসান ঘটল, একটা লাশের গায়ে পা বেধে পড়ে গেল রানা–কোমর থেকে ভোজালিটা বের করে তুলল সে মাথার উপর, এক কোপে আলাদা করে দেবে ধড় ও মাথা। কিন্তু কোপ দেওয়ার জন্য যেই ঝুঁকল রানার দুপায়ের জোড়া লাথি খেল সে তলপেটে। শূন্যে উঠে গেল।

এখনই! গুলি করো!–নিজেকে বলল ফাহিমা।

ট্রিগার টানল ও।

শূন্যে উঠে সবে একটা পাক খাচ্ছিল নেপালী, চুরমার হয়ে গেল ওর মাথাটা, ছিটকে বেরিয়ে পিছনের দেওয়ালে গিয়ে লাগল ওর হলুদ মগজ। ধোঁয়া আর কমলা শিখার ভিতর দিয়ে ফাহিমার

অবস্থা চট্ করে দেখে নিয়ে নিজের ওয়ালথারটা তুলে হুঙ্কার ছাড়ল ও, 'চলো, জলদি বেরিয়ে পড়া যাক!'

'তোমার ওটা না নিয়ে নয়!'

'কোথায় সেটা?'

এই সময় আবার গুলির আওয়াজ হলো, পরপর দুটো।

ঝট করে সেদিকে ঘাড় ফেরাল রানা আর ফাহিমা

পাশের ঘরে উল্টে পড়া একজোড়া চেয়ারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রানা আর ফাহিমার দিকে পিস্তল তাক করছিল মরমনদের দু'জন সিপাই। দোরগোড়া থেকে সেটা দেখতে পেয়ে তাদের আগে গুলি করেছে মিরান আর নিশা।

সিপাই দু'জন বুক খামচে ধরে শুয়ে পড়ল মেঝেতে।

দলের লোকজন আগেই বেরিয়ে গেছে সরাইখানা থেকে, রানার উদ্দেশ্যে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে এবার মিরান আর নিশাও বেরিয়ে গেল।

লাথি মেরে জ্বলন্ত একটা চেয়ার এক পাশে সরিয়ে দিল ফাহিমা। উপর থেকে, অগ্নিশিখার দর্শনীয় একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে, কাঠের একটা কড়িকাঠ ভেঙে পড়ল, জ্বলন্ত কয়লা আর আগুনের ফুলকি বৃষ্টি শুরু হলো।

'ভুলে যাও!' গলা চড়িয়ে মানা করল রানা। 'এক্ষুনি ওখান থেকে বেরিয়ে চলে এসো। এখনই!'

কিন্তু ওর কথায় কান না দিয়ে ছুটল ফাহিমা, যেদিকে আব্রাহাম মেডেলটা ফেলে দিয়েছিল। গলায় ধোঁয়া লাগায় খক খক করে কাশছে সে, চেষ্টা করছে শ্বাস না নিতে। তার চোখ জ্বলছে, পানি বেরুচ্ছে হড়-হড় করে। গলার স্কার্ফ হাতে জড়িয়ে নিয়ে মেডেলটা ধরল সে। তারপর সিধে হয়ে হাত বাড়াল ক্যাশ বাক্সটার দিকে।

স্থির হয়ে গেল হাতটা।

'এ কী হলো!' দাউ-দাউ করে জ্বলছে টাকাগুলো।

ছুটে এসে খপ করে ফাহিমার একটা কবজি চেপে ধরল রানা, আগুনের ভিতর দিয়ে দরজার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। 'এসো! আর দেরি করা যায় না!'

গোটা কাঠামো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে, এই সময় রাতের হিম বাতাসে বেরিয়ে এল ওরা। ওদের পিছনে আগুন আর ধোঁয়া যেন আকাশের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছে। রাস্তা পার হয়ে দৃশ্যটা দেখে কেঁদে ফেলল ফাহিমা। কাঁদছে আকস্মিক বিপদটার কথা ভেবে। কাছে টেনে তাকে সান্ত্বনা দিল রানা।

'মাসুদ ভাই, আপনি ফিরে না এলে আল্লাহই জানে কী হত আজ,' মৃদুকণ্ঠে বলল ফাহিমা। 'আপনি আমাকে ঋণী করে রাখলেন।'

'ঠিক আছে, মনে করে এক সময় শোধ দিয়ে দিয়ো,' মৃদু হেসে বলল রানা।

'এই নিন, শুরু করলাম,' বলে লকেটটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল ফাহিমা। 'তবে একটা শর্ত আছে, ভাই!'

'বলে ফেলো। কী শর্ত?'

'আব্বুর জীবনের খুব বড় একটা স্বপ্ন ছিল প্রাচীন তানিস শহরটা খুঁজে বের করবে, তারপর দেখবে সত্যি সেখানে মুসা নবীর নিখোঁজ আর্কটা পাওয়া যায় কিনা। আব্বু নেই, তার মেয়ে হিসাবে তার হয়ে আমি আপনার অভিযানে থাকতে চাই।'

'কে বলল আমি কোন অভিযানে বেরিয়েছি? কিংবা মুসা নবীর আর্ক উদ্ধার করতে যাচ্ছি?'

'কাউকে বলতে হবে কেন, এটার জন্য এত দূর এসেছেন দেখে আন্দাজ করা যায় না?'

'এটার জন্য এসেছি, এটা আংশিক সত্য। আরও জোরাল একটা কারণ আছে। তানিস আবিষ্কৃত হোক, সেটা আমিও চাই, কিন্তু ওটা আমার এক্সপিডিশন নয়, ফাহিমা।'

'তা হলে?'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শুধু বলল, 'আমার টার্গেট পল ভিতেরা।'

চমকে রানার মুখের দিকে চাইল ফাহিমা। মেডেলটা রানার হাতে গুঁজে দিল। 'বলুন, আমাকে সঙ্গে রাখছেন তো?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' মৃদু হেসে বলল রানা।

আগুনটার দিকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওরা। তারপর ফাহিমা জিজ্ঞেস করল, 'এবার আরও জোরাল কারণটা শোনা যাক। কী সেটা?'

'বোনটাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।'

দরদর করে পানি নামল ফাহিমার দু' চোখ বেয়ে। আর একবার নিচু হয়ে রানার পা ছুঁলো ও।

'অধচ...অথচ আমি ভেবেছিলাম, কেউ বুঝি নেই আমার! আল্লার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছি, মাসুদ ভাই।'

'কিন্তু শীতে যে মেরে ফেলল আল্লাহ্! এদেশে আজ রাতে থাকার জন্যে একটা জায়গা মিলবে না কোথাও?'

'মিলবে। আসুন আমার সঙ্গে।'

গাড়িতে উঠে বসল ওরা। দু'জনের কেউই খেয়াল করল না চোরের মত চুপিচুপি মূল রাস্তা থেকে সরু একটা গলির ভিতর ঢুকে পড়ল আব্রাহাম।

আট

মিশর, প্রাচীন তানিস শহর।

উত্তপ্ত সূর্য বালি পোড়াচ্ছে, এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত

পর্যন্ত বিস্তৃত অনুর্বর প্রান্তরকে তাতিয়ে তুলছে। এ-ধরনের একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে, ভাবল পল ভিতেরা, মানুষ কল্পনা করে গোটা দুনিয়া নিষ্ফলা–গাছপালাহীন, ঘর-বাড়িহীন, মনুষ্যবিহীন একটা গ্রহ।

মানুষবিহীন!

চিন্তাটার মধ্যে ভিতেরাকে খুশি করার মত কিছু আছে। মানুষবিহীন গ্রহ? না, ভাবাই যায় না! মানুষ ছাড়া ভিতেরার চলবে না। মানুষ না থাকলে সে, পল ভিতেরা, ঠকাবে কাকে?

তার উপলব্ধি: মানবজাতির প্রধান পুঁজি বিশ্বাসঘাতকতা। তাই যতটা পারা যায় নিজের জন্য এই পুঁজি বাড়িয়ে নিয়েছে সে। তার আরেকটা উপলব্ধি: বেঈমানী যেখানে কাজ করে না, লোকে সেখানে রক্তপাত আর মারামারি অর্থাৎ ভায়োলেন্সের সাহায্য নেয়। এটা থেকেও সবক গ্রহণ করেছে সে।

কপালে হাত তুলে চোখ দুটোকে রোদ থেকে বাঁচাল ভিতেরা, তারপর ধীর পায়ে সামনে এগোল–খোঁড়াখুঁড়ির কাজ কীভাবে এগোচ্ছে দেখবে বলে।

বিরাট জায়গা জুড়ে বিশাল আয়োজন। আমেরিকানদের যা স্বভাব আর কী! সূর্যের দিকে পিছন ফিরে হাত দুটো ট্রাউজারের পকেটে ভরল ভিতেরা–ট্রাক আর বুলডোজারের বহর, অসংখ্য আরব খনক, মরমন সুপারভাইজার আর মার্কিন মার্সেনারিদের উপর চোখ বুলাচ্ছে।

মেজর ময়নিহানের উপর স্থির হলো দৃষ্টি, শুনতে পেল খেপে ওঠা কুকুরের মত ঘেউ-ঘেউ করে নিজের লোকজনকে নির্দেশ দিচ্ছে সে, এত দ্রুত জায়গা বদল করছে যেন একটা ঘূর্ণিঝড় তাড়া করেছে তাকে।

চোখ বুজে কর্কশ আর উত্তপ্ত বর্তমান ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করল ভিতেরা। আর্ক, ভাবল সে। মরমনরা যতই লোভ করুক, কোনও ব্যক্তি বা বিশেষ কোনও গোষ্ঠির জিনিস নয় ওটা। ওই

আর্কের যদি কোন রহস্য থেকে থাকে, ওটার সাহায্যে আদৌ যদি কোন অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন করা যায়, সেটার একমাত্র মালিক হব আমি–যেহেতু আমি ইহুদি।

চোখ মেলে সদ্য খোঁড়া বিশাল আকৃতির গর্তগুলোর দিকে তাকাল ভিতেরা। আশ্চর্য একটা কম্পন অনুভব করছে সে। খুব খেয়াল না দিলে বোঝা যায় না। লোকজনের মুখের দিকে তাকাল, তারাও কি কম্পনটা অনুভব করছে?

মনে হলো না। কিন্তু নিজের অনুভূতি ভিতেরা অস্বীকার করে কীভাবে? এই কম্পনই জানিয়ে দিচ্ছে, এত পরিশ্রমের পুরস্কারটা কাছাকাছি কোথাও আছে।

শুধু কম্পন নয়, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ওটার গুঞ্জনও শুনতে পাচ্ছে ভিতেরা, যে গুঞ্জন খানিক পরেই বিকট গর্জনে পরিণত হতে পারে। পকেট থেকে ডান হাতটা বের করে চোখের সামনে তুলল সে, তালুর মাঝখানে তাকিয়ে দেখছে মেডেলের মত জিনিসটা।

ঐশ্বরিক ক্ষমতার কথা ভাবল ভিতেরা। অনেক পয়গম্বরই তো ঈশ্বরের কৃপায় অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। মুসা নবীর আর্কটায় সত্যি যদি সৃষ্টিকর্তার স্পর্শ থেকে থাকে, আর উদ্ধার করার পর আমি যদি সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করি ওটাকে, তা হলে নিশ্চয়ই খানিকটা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হতে পারব আমিও!

কেন নয়! আপনমনে হাসল ভিতেরা। গভীর গর্তগুলোর কিনারা ঘেঁষে এগোল সে, পাশ কাটাচ্ছে বুলডোজার আর ট্রাকগুলোকে। হঠাৎ মুঠোটা শক্ত করে মেডেলটাকে খামচে ধরল সে। মনে পড়ে গেছে নেপালে পাঠানো মেজর ময়নিহানের লোকজন কি লেজেগোবরে অবস্থা করে এসেছে। রাগে পিত্তি জ্বলে গেল তার।

তবে অকর্মার ধাড়িগুলো সঙ্গে করে এমন একটা জিনিস নিয়ে

এসেছে যে, কাজ চালিয়ে নিতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

নেপাল থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে অসুস্থ আর কাতর আব্রাহাম নিজের হাতের তালুটা দেখায় ভিতেরাকে, সন্দেহ নেই সহানুভূতি পাওয়ার আশায়। তার মাথায় ঢোকেনি হাতের মাংসে গেঁথে গেছে যে জিনিসটা সঙ্গে করে আনতে পারেনি তারই হুবহু একটা প্রতিচ্ছবি।

পরের দৃশ্যটা খুব মজার লেগেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হয়েছে আব্রাহামকে, তার তালুর ছাপ দেখে ধীরে ধীরে নিজ হাতে একটা মেডেল তৈরি করেছে ভিতেরা। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে কাজটা করেছে সে, চেষ্টা ছিল হুবহু আসলটার মত আরেকটা তৈরি করার। যেটা বানাতে পেরেছে তাতে কোন খুঁত নেই, তারপরেও জিনিসটা নকল, 'ঐতিহাসিক' সাচ্চা জিনিস নয়। ম্যাপ রুম বা আত্মাদের কুয়া খুঁজে বের করার কাজ চালাবার মত নিখুঁত হয়েছে ঠিকই, তবু আসলটা না পাওয়ার খেদ এখনও ভুলতে পারছে না সে কিছুতেই।

মেডেলটা পকেটে রেখে দিয়ে মেজর ময়নিহানের পাশে এসে দাঁড়াল ভিতেরা। দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত কিছুই বলল না সে। মরমন মেজর তার উপস্থিতিতে অস্বস্তি বোধ করে, এটা জানে বলেই ব্যাপারটা উপভোগ করে সে।

অবশেষে মেজর ময়নিহানই মুখ খুলল, 'সব ঠিকঠাক মতই এগোচ্ছে, কী বলেন?'

মাথা ঝাকাল ভিতেরা, হাত তুলে রোদ ঠেকাল আবার। এই মুহূর্তে অন্য একটা প্রসঙ্গে ভাবছে সে, যে প্রসঙ্গটা অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে তাকে। ছোট্ট একটা তথ্য, আব্রাহামের অযোগ্য লোকেরা নেপাল থেকে নিয়ে এসেছে সেটা। মাসুদ রানা।

এ প্রসঙ্গে নিজের একটা মারাত্মক ভুলের কথা মনে পড়ে গেল ভিতেরার। মাস পাঁচেক আগে পেরুর জঙ্গলে মাসুদ রানা আর ডক্টর কাসেমির মেয়েটিকে খুন করার চমৎকার একটা সুযোগ

হাতছাড়া করেছে সে। তখন আসলে এই লোক সম্পর্কে পরিষ্কার কোনও ধারণা ছিল না তার। ডক্টর কাসেমির জুনিয়র বন্ধু, ভিন্ন পেশার লোক, সৌখিন অ্যাডভেঞ্চারার বলে মনে করেছিল।

• ভুলটা তার পরে ভাঙে। বন্ধু মহল থেকে তাকে জানানো হয় মাসুদ রানা যখন যে কাজ করে তখন সেই কাজেই একজন প্রফেশনাল, তা সে এসপিওনাজ হোক, অ্যাডভেঞ্চার হোক, ইনভেস্টিগেশন হোক বা স্পোর্টস হোক। কেউ যদি তাকে ঢিল মারে, পাটকেলটি তার খেতেই হবে। লোকটা ভয়ঙ্কর।

একটা পাটকেল ইতিমধ্যেই খেয়েছে সে। কাউকে বলতেও পারছে না, সইতেও পারছে না। অত কষ্ট করে সংগ্রহ করা অত সাধের স্বর্ণমূর্তিটা খোয়া গেছে তার ব্যক্তিগত লকার থেকে। গত চার মাসে কেউ ওটা বিক্রিও করেনি কারও কাছে। কাজটা কি ওই মাসুদ রানার? তার ভিলার কাছে অবশ্য কদিন ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে ভুল-ভাল ইংরেজি বলা বেঁটে-খাটো এক লোককে, কিন্তু তার সঙ্গে মাসুদ রানার কোনও সম্পর্ক আছে কি না জানা যায়নি। তবে ওর মন গাইছে: এ-কাজ মাসুদ রানারই।

কাজেই ভিতেরার ধরে নেওয়া উচিত ছিল আগে হোক বা পরে, দৃশ্যপটে মাসুদ রানার আগমন ঘটবেই। ঘটেছেও ঠিক তাই। খবর পেয়েছে সে, ডক্টর কাসেমির মেয়েটিকে নিয়ে কায়রোয় পৌঁছে গেছে রানা। এখন সাবধানতার সময়।

ঘাড় ফিরিয়ে ভিতেরার দিকে তাকিয়ে মেজর ময়নিহান জানতে চাইল, 'যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম, ওটার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে এলেন?'

'হ্যাঁ।'

'নিশ্চয়ই আমার ধারণার সঙ্গে মিলে গেছে আপনার সিদ্ধান্ত?'

'এভাবে আন্দাজ করাটা অনেক সময় অসৌজন্যের পর্যায়ে পড়ে যায়, মেজর।'

ভিতেরার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল মেজর ময়নিহান।

হাসল ভিতেরা। 'এই কেসটায়, যদিও, আপনার আন্দাজ বোধহয় সঠিক বলেই প্রমাণিত হতে চলেছে।'

'আপনি চান ব্যাপারটা আমি দেখি?'

মাথা ঝাঁকাল ভিতেরা। 'কীভাবে কী করবেন, সব আমি আপনার হাতে ছেড়ে দিলাম।'

'তা তো দেবেনই।'

নয়

কায়রো,শহরতলি।

উষ্ণ অন্ধকার, এতটুকু নড়াচড়া নেই বাতাসের। দিনের রোদ যেন সমস্ত জলকণা নিঃশেষে শুষে নিয়েছে। ফাহিমাকে নিয়ে একটা কফিহাউসে বসে রয়েছে রানা, দরজার দিক থেকে চোখ প্রায় সরাচ্ছেই না।

কায়রোর পুরানো শহরের গলি-উপগলি দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটেছে আজ ওরা, সযত্নে এড়িয়ে থেকেছে মূল শহর, অথচ তারপরেও রানার মনে হয়েছে নজর রাখা হচ্ছে ওদের উপর। শহর থেকে ক্রমশ অনেক দূরে সরে এসেছে ওরা, অথচ সন্দেহটা দূর হচ্ছে না। কোনও সন্দেহ নেই, নজর রাখছে কেউ। কিন্তু কে!

ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ফাহিমাকে, তার লম্বা চুল ঘামে ভিজে গেছে। হাবভাবেই বোঝা যায়, রানার উপর বিরক্ত হয়ে আছে মেয়েটি। এই মুহূর্তে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে সে, কিনারার উপর দিয়ে চোখে অভিযোগ নিয়ে তাকিয়ে আছে রানার

দিকে। এখনও দরজার দিকে চোখ রানার, খদ্দেরদের আসা-যাওয়া খেয়াল করছে, মাঝেমধ্যে সিলিঙের দিকে চোখ তুলে মন্থরগতি ক্যাঁচক্যাঁচে ফ্যানটার দিকে তাকাচ্ছে।

'দয়া করে বলবেন; এভাবে চোরের মত আর কতক্ষণ লুকিয়ে বেড়াতে হবে?'

'আমরা কি তাই বেড়াচ্ছি?' হাসল রানা।

'একজন অন্ধও বুঝতে পারবে কারও কাছ থেকে লুকিয়ে আছি আমরা, মাসুদ ভাই। ভেবে সত্যি অবাক হচ্ছি আমি নেপাল ত্যাগ করলাম কেন!'

'ঠিক ধরেছ। সত্যিই লুকিয়ে আছি আমরা। সেই জোকারদের কাছ থেকে, নেপালে যারা তোমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দিয়েছে।'

'কিন্তু আর কতক্ষণ?'

'যতক্ষণ না আমার মনে হয় বাইরে বেরুনো নিরাপদ।'

'বাইরে বেরিয়ে কোথায় যাব আমরা? আপনার প্ল্যানটা কী?'

'কায়রোয় আমার বিশ্বস্ত লোকজন আছে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে কফিটুকু শেষ করল ফাহিমা, তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজল। 'আপনার সময় হলে আমাকে জাগাবেন, ঠিক আছে?'

চেয়ার ছেড়ে ফাহিমার হাত ধরে দাঁড় করাল রানা। 'সময় হয়েছে,' বলল ও। 'চলো, বেরিয়ে পড়ি।'

কফিহাউস থেকে অন্ধকার গলিতে বেরিয়ে এল ওরা। কায়রো শহরের উপকণ্ঠে, পাহাড়ী ঢালের মাথায় এটা একটা বাজার এলাকা। গলিটা প্রায় ফাঁকা দেখল ওরা। খানিক দূর হেঁটে এসে থামল রানা, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তারপর আবার ফাহিমার কবজি ধরে হাঁটতে থাকল।

'একটা ধারণা পেলে ভালো হত ঠিক কোন্দিকে যাচ্ছি আমরা।'

'আলালের বাড়ি।'

'কোন আলাল?' আগ্রহে সঙ্গে জানতে চাইল ফাহিমা। 'অব্বার একজন ভক্ত ছিলেন বলে শুনেছি, তার নামও আলাল, তিনি...'

'মিশরের সবচেয়ে দক্ষ খনক,' শূন্যস্থান পূরণ করল রানা, ভাবছে—আলাল তার আগের ঠিকানায় থাকলে হয়। ওর মনের গভীরে আরও একটা শঙ্কা নড়াচড়া করছে—আলালকে এরইমধ্যে তানিস খোঁড়ার কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়নি তো?

একটা চৌরাস্তায় এসে আবার থামল রানা। চারদিক ভালো করে দেখে নিয়ে টান দিল ফাহিমার হাতে। 'এদিকে।'

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল ফাহিমা, তারপর মুখের সামনে হাত উঠিয়ে একটা হাই তুলল।

ওদের পিছনের গাঢ় ছায়ায় কী যেন নড়ে উঠল। একটা মানুষ হতে পারত ওটা। এতটুকু শব্দ না করে এগোচ্ছে। পাথর দিয়ে বাঁধানো রাস্তায় খুদে পা পড়ছে কি পড়ছে না, যেন উড়ে চলেছে। ওটার উপর নির্দেশ আছে ওদের দু'জনকে পিছন থেকে অনুসরণ করতে হবে।

কয়েক বছর পর দেখা হলেও, রানাকে এমন আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাল আলাল, যেন মাত্র কয়েক হপ্তা দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। রানা লক্ষ করল আলাল বদলেছেও খুব সামান্যই। রোদে পোড়া তামাটে মুখে সারাক্ষণ হাসি লেগে আছে, চোখ দুটোয় বুদ্ধির ছাপ, নড়াচড়ায় প্রাণচঞ্চল সতেজ ভাব। আন্তরিক ভাবে কোলাকুলি করল রানা আর আলাল। আলালের স্ত্রী ওদেরকে ভিতরে নিয়ে এল, ধরার পর ফাহিমার হাতটা ছাড়ছেই না।

কীভাবে যেন খুব দ্রুত সাজানো হয়ে গেল ডাইনিং টেবিলটা। মুরগীর রোস্ট, চিংড়ির কোপ্তা আর ভাজা স্যামন খেল ওরা নানরুটি দিয়ে। লম্বা কামরার আরেক টেবিলে বসেছে আলালের

ছেলেমেয়েরা।

'একদম কিছুই বদলায়নি, এ-কথা ঠিক নয়,' খাওয়ার ফাঁকে এক সময় বলল রানা, মাথা ঝাঁকিয়ে বাচ্চাদের দিকে ইঙ্গিত করল।

'ও, হ্যাঁ,' বলে হাসল আলাল। তার স্ত্রী নার্গিসকেও দেখা গেল সগর্বে হাসছে। 'গতবার সংখ্যাটা আরও কম ছিল, মিস্টার রানা।'

'আমার মাত্র তিনটের কথা মনে পড়ছে, আলাল।'

'এখন ওরা দশজন,' বলল আলাল। 'সবকটাই ছেলে।'

'দশজন!' বিস্ময়ে মাথা নাড়ল রানা। 'সত্যি কিছু মানুষ দুনিয়ায় আসেই দুঃসাহস দেখাতে।'

নিজেদের টেবিল ছেড়ে ছোট বাচ্চাগুলোর কাছে চলে গেল ফাহিমা। ওদের সবার সঙ্গে কথা বলে ঘাড়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে একটু পরই আবার ফিরে এল সে। গুনেছে–বাড়িতে সবগুলো ছেলে নেই। সম্ভবত বড় তিনজন বাইরে কোথাও গেছে।

'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি দশটার পর আর নয়,' বলল আলাল।

'এটা একটা কাজের কাজ করেছ।'

একটা খেজুর কিছুক্ষণ চুষল আলাল, তারপর বলল, 'মিস্টার রানা, আপনি আমার বাড়িতে মেহমান হওয়ায় সত্যি আমি ভীষণ খুশি হয়েছি। এত তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করাটা অভদ্রতা, তবে কৌতূহল চেপে রাখতে সত্যিই খুব কষ্ট হচ্ছে আমার। আপনি নিশ্চয়ই কোনও কাজে এসেছেন কায়রোয়, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

হঠাৎ বেশ আত্মবিশ্বাসী দেখাল আলালকে, বড় করে শ্বাস টেনে ফুসফুস ভরল সে, তারপর বলল, 'আমি বোধহয় জানি কী কারণে এসেছেন আপনি।'

পুরানো শুভানুধ্যায়ীর দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, হাসছে, তবে কিছু বলছে না।

'খাওয়ার টেবিলে বসে কাজের কথা তোলা উচিত নয়,' মনে করিয়ে দেওয়ার সুরে স্বামীকে বলল নার্গিস।

'পরে,' ফিসফিস করল রানা, চট করে একবার ফাহিমার দিকে তাকাতে দেখল চেয়ারে বসে ঘুমে ঢুলছে সে।

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল আলাল।

কামরার ভিতরটা এক কি দু'সেকেন্ড নীরব থাকার পর হঠাৎ তুমুল হইচই শুরু হয়ে গেল, যেন বাচ্চাদের টেবিলে কিছু একটা গজিয়েছে।

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে বাচ্চাদের চুপ করতে বলল নার্গিস। কিন্তু বাচ্চারা তার কথা শুনছে না, কারণ তারা অন্য কিছু নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত। চেয়ার ছাড়ল সে, বলল, 'বাড়িতে মেহমান এসেছেন। তোমরা দেখছি আদবকায়দা ভুলে গেছ।'

তারপরও তার কথা শুনছে না তারা। অগত্যা বাধ্য হয়ে মারমুখো হয়ে তেড়ে গেল নার্গিস। আর তখনই বাচ্চাদের টেবিলের মাঝখানে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে থাকা ছোট্ট বাঁদরটাকে দেখতে পেল সে, মনের আনন্দে একটুকরো রুটি চিবাচ্ছে।

নার্গিস জিজ্ঞেস করল, 'এই জানোয়ারটাকে কে আনল এখানে? আমি জানতে চাই, কার কাজ এটা?'

বাচ্চারা কেউ জবাব দিল না। ছোট্ট প্রাণীটাকে পেয়ে আনন্দে-উল্লাসে ফেটে পড়ছে তারা। অবশিষ্ট রুটির টুকরোটা পায়ের ধাক্কায় একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে পাঠাচ্ছে চঞ্চল বাঁদর, তাই দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ছে ছোট ছেলেমেয়েরা।

তারপর হঠাৎ লাফ দিয়ে মেঝেতে পড়ল ওটা, ক্ষিপ্র বেগে দূরত্বটুকু পার হয়ে আরেক লাফে উঠে বসল ফাহিমার কোলে, বসেই আদর করার ভঙ্গিতে তার গালে একটা চুমো খেল।

হেসে উঠল ফাহিমা। 'আরে, এ তো দেখছি একটা কিসিং মাঙ্কি!' বাঁদরটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল সে। 'আমারও

তোমাকে পছন্দ হয়েছে, বুঝলে!'

নার্গিস জানতে চাইল, 'এটা এখানে ঢুকল কীভাবে?'

ছেলেরা ঘাড় ফিরিয়ে বাঁদরটাকে দেখছে, কেউ জবাব দিল না। তারপর বড় ছেলেটা বলল, 'জানি না কীভাবে ঢুকল। হঠাৎ দেখলাম লাফ দিয়ে টেবিলে পড়ল।'

বড় ছেলের দিকে চোখ গরম করে তাকাল নার্গিস। ব্যাপারটা লক্ষ করে ফাহিমা তাড়াতাড়ি বলল, 'আপনি যদি বাড়িতে পোষা প্রাণী রাখতে না চান...'

'না-না!' তাকে থামিয়ে দিল নার্গিস। 'আপনার ভালো লাগলে আমার কোন আপত্তি নেই।'

আরও কিছুক্ষণ কোলে রাখার পর বাঁদরটাকে মেঝেতে নামিয়ে দিল ফাহিমা। চোখে-মুখে রাগ আর অসন্তোষ নিয়ে তার দিকে তাকাল ওটা, পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে আবার চড়ে বসল কোলে।

'দেখা যাচ্ছে তোমাকে ভালোবাসে,' বলল রানা। এ-ধরনের প্রাণীকে খুব ঝামেলার জিনিস বলে মনে করে ও।

ছোট্ট শয়তানটাকে আলিঙ্গন করল ফাহিমা।

'আমরা উঠানে বসতে পারি,' বিড়বিড় করল আলাল।

তার পিছু নিয়ে চৌকাঠ পেরুল রানা। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা উঠানে সারাদিনের সমস্ত তাপ যেন আটকা পড়ে আছে, ক্লান্তি বোধ করল রানা। তবে জানে আরও কিছুক্ষণ জেগে থাকতে হবে ওকে।

ইঙ্গিতে একটা বেতের চেয়ার দেখাল আলাল। নিজেও বসল একটায়। 'আপনি তানিস সম্পর্কে আলাপ করতে চান, মিস্টার রানা।'

'ঠিক ধরেছ।'

'জানতাম।'

'তার মানে কি ওখানে তুমি কাজ করছ?'

মাথা নাড়ল আলাল। 'পল ভিতেরাকে চিনি আমি, তার উদ্দেশ্য কখনও ভালো হতে পারে না। কেন খুঁড়তে এসেছে, কী পেতে চায়, সব আমি জানি। বুড়ো হয়ে গেছি, একথা বলে তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছি আমি। তবে ওদের কাজ কতটুকু এগোল খবর রাখার লোভটা সামলাতে পারিনি।'

'মানে?'

'আমার বড় ছেলে বিল্লাল কাজ করছে ওখানে,' বলে হাসল আলাল। 'কাজেই ওখানে কী ঘটছে না ঘটছে সবই আমি জানি।'

'কী জানো শোনাও দেখি।'

'মিস্টার রানা, আজ বিকেলে আমার ছেলে নিজে মাটি খুঁড়ে তানিসের ম্যাপ রুম বের করেছে।'

এ-ধরনের কিছু একটা ঘটবে বলে জানা থাকলেও খবরটা ঝাঁকি দিয়ে গেল রানাকে। আলালের দিকে ফিরে বলল, 'খুবই দ্রুত এগোচ্ছে দেখছি ওরা।'

'মরমনরা সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে নেমেছে, মিস্টার রানা। তা ছাড়া, ওরা খুব সুশৃংখল।'

'হুম।'

'চার্জে রয়েছে সেই খুনিটা—ফ্রেঞ্চ আর্কিওলজিস্ট পল ভিতেরা।

শিরদাঁড়া খাড়া করে চেয়ারটায় বসে আছে রানা। হাত দুটো শক্ত মুঠো হয়ে গেল। তৈরি থাকো, মনে মনে বলল ও, আমি আসছি। তারপর পকেট থেকে মেডেলটা বের করে আলালের হাতে ধরিয়ে দিল।

'কী এটা?'

'ম্যাপ রুম হয়তো আবিষ্কার করেছে,' বলল রানা, 'কিন্তু এটা না পেলে বেশি দূর যেতে পারবে না।'

'বোধহয় জানি কী এটা। দ্য হেডপিস অভ দ্য স্টাফ অভ রা, তাই না?'

'হ্যাঁ। তবে গায়ের মার্কিংগুলো অর্থ আমার জানা নেই। ভালো করে দেখে বলো তো, কিছু বুঝতে পারছ?'

মাথা নাড়ল আলাল। 'এ-সব সাংকেতিক চিহ্নের অর্থ উদ্ধার করা আমার কর্ম নয়, মিস্টার রানা। তবে আমি একজনকে চিনি, এ-সব ব্যাপারে এক্সপার্ট। আপনাকে আমি কাল তার কাছে নিয়ে যাব।'

'ধন্যবাদ, আলাল,' বলল রানা। আলালের কাছ থেকে মেভেলটা চেয়ে নিয়ে পকেটে রেখে দিল ও। ভাবল, এটা ছাড়া ভিতেরাকে অন্ধই বলা যায়। আসলে ওরা নয়, বরং আমরাই এগিয়ে আছি। এখন যদি এমন একটা ব্যবস্থা করা যায়...মরমনদের পাশ কাটিয়ে তানিসে ঢুকতে পারলে...। জানতে চাইল, সব মিলিয়ে সাইটে আমেরিকান ক'জন হবে?'

'একশোর কম নয়, প্রায় সবাই মরমন,' বলল আলাল। 'সরকারের অনুমতি নিয়েই খোঁড়াখুঁড়ি করছে ওরা।'

'সঙ্গে নিশ্চয় অস্ত্রও আছে?'

'তা তো আছেই, তবে সবই লুকিয়ে রেখেছে–কারণ তারা খুব ভালো করে জানে যে আর্কিওলজিক্যাল সাইটে কারও কাছে অস্ত্র দেখা গেলে তাকে জেল খাটতে হবে।' একটু থেমে প্রসঙ্গ বদলাল আলাল। 'যাই হোক, জিনিসটাকে নিয়ে আমি খুবই চিন্তিত, মিস্টার রানা।'

'জিনিসটা?'

'আর্কটার কথা বলছি। ওটা যদি সত্যি তানিসে থেকে থাকে...' থেমে ঢোক গিলল আলাল, চোখে-মুখে ভয়-ভয় একটা ভাব ফুটে উঠল, তারপর আবার বলল, 'ওটা এমন একটা জিনিস, নাড়াচাড়া করা উচিতই নয় মানুষের। কী-কী সব ভয়ঙ্কর ঘটনার

কথা শুনেছি। ওটার প্রতি লোভ করলেই মৃত্যু এসে বংশ উজাড় করে দেয়। দুর্ভিক্ষ লাগে, বন্যা হয়, আকাশে আগুন ধরে যায়, নদীর সমস্ত পানি নাকি রক্ত হয়ে যায়...আরও কত কী! অসম্ভব নয়, মিস্টার রানা। ওটা তো এই দুনিয়ার জিনিস নয়। মানে, আমি বলতে চাইছি...'

'জানি তুমি কী বলতে চাইছ।'

'আর ওই ব্যাটা ফ্রেঞ্চ লোকটা...পরিষ্কার বুঝতে পারি আমি, জিনিসটা তাকে জাদু করেছে। মিস্টার রানা, ওদিকে হাঁটতে গিয়ে ওই লোকের চোখে এমন কিছু দেখেছি আমি, যার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। মরমনরা তাকে পছন্দ করে না। ব্যাপারটা কেয়ার করে না সে। কোনও কিছুই কেয়ার করে না, সারাক্ষণ আর্কটার কথা ভাবছে।'

'ভাল হত যদি বোঝা যেত ঠিক কী ভাবছে সে।'

'তারপর যখন ম্যাপ রুমে ঢুকল,' বলে চলেছে আলাল, রানার কথা বোধহয় শুনতে পায়নি, '...কী বর্ণনা দেব তার চেহারার? এমন একটা জায়গায় চলে গেছে সে, যেখানে মরে গেলেও যেতে রাজি হব না আমি।'

পাঁচিলের মাথা টপকে হঠাৎ একটা দমকা বাতাস কিছু কাঁকর আর প্রচুর বালি নিয়ে ওদের গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর আবার স্থির হয়ে গেল পরিবেশ।

'এবার আপনার ঘুম দরকার,' বলল আলাল। 'গেস্টরুমগুলো কোনদিকে আপনি জানেন।'

'সত্যি আমি কৃতজ্ঞ।'

অন্দরমহলে ফিরে এল ওরা; গোটা বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে আছে। একটা গেস্টরুমে ঘুমাচ্ছে ফাহিমা, সেটাকে পাশ কাটাবার সময় কয়েক সেকেন্ডের জন্য থামল রানা, কান পেতে নিয়মিত ছন্দে তার নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ শুনল। তারপর আবার করিডর ধরে এগোল, আরেকটা গেস্টরুমে ঢুকে বন্ধ করে দিল

দরজা।

ড্রেসিংরুমের ভিতর ব্যস্ততার সঙ্গে কাজ করছে ওটা। রানা আর ফাহিমা এখানেই নিজেদের সুটকেস আর অন্যান্য জিনিস রেখেছে। দ্রুত অথচ নিঃশব্দে দেরাজ আর ব্যাগ খুলছে, কাপড়চোপড়ের ভাঁজে উঁকি দিচ্ছে, খুঁটিয়ে দেখছে কাগজ-পত্র। একটা নির্দিষ্ট জিনিস খুঁজে বের করার ট্রেনিং দিয়ে এখানে পাঠানো হয়েছে ওটাকে, দেখলেই চিনতে পারবে। একটা ড্রইং হতে পারে, হতে পারে নির্দিষ্ট আকৃতির সঙ্গে মিল রেখে অন্য কিছু। কিন্তু অনেক খুঁজেও যখন পাওয়া গেল না, বুঝতে পারল খুব হতাশ হবে মালিক। এর পরিণতিতে উপোস থাকতে হবে। এমনকী কঠিন শাস্তিও জুটতে পারে কপালে। শেষবারের মত আরেকবার জিনিসটার আকৃতি স্মরণ করল ওটা—অবিকল সূর্যের আদল, দু'ধারে খুদে চিহ্ন, মাঝখানে একটা গর্ত। আবার ওটা জিনিস-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করল।

তবে এবারও কিছু পেল না।

বিড়ালের মত নিঃশব্দে করিডরে বেরিয়ে এল বাঁদরটা, ডাইনিং রুমে ঢুকে টেবিল থেকে কিছু খাবার নিয়ে খেল, তারপর খোলা একটা জানালা গলে বেরিয়ে পড়ল বাইরের গাঢ় অন্ধকারে।

দশ

বিকেলটা গরম রোদে ভাজা ভাজা হচ্ছে, আকাশ প্রায় ধবধবে সাদা। সাদাটে একটা প্রতিফলন বেরুচ্ছে দেয়াল, কাপড়চোপড়, কাঁচ ইত্যাদি থেকে—আলো যেন কুয়াশায় পরিণত হয়ে সারফেসে লেপ্টে আছে।

'বাঁদরটা কি আমাদের, না হলে চলে না?' জিজ্ঞেস করল রানা। বাজারের ব্যস্ত অলিগলি ধরে দ্রুত এগোচ্ছে ওরা, চারদিক লোকে লোকারণ্য। কিছু আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করেছে ফাহিমা, সেই সুযোগে দরকারী কিছু কেনাকাটাও সেরে নিয়েছে।

'আমি তো ডাকিনি, নিজের ইচ্ছেয় আমার পিছু পিছু আসছে,' বলল ফাহিমা।

'ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে কী যেন একটা সম্পর্ক আছে তোমার সঙ্গে ওটার।'

'সেরকম একটা সম্পর্ক, মাসুদ ভাই, বোধহয় আপনার সঙ্গেও আছে।' একটু থেমে কৌতুকটাকে আরও একটু লম্বা করল ফাহিমা, 'অন্তত আপনার চেহারার সঙ্গে যে খানিকটা মিল আছে, এটা অস্বীকার করতে পারবেন না।'

'আমার চেহারা, তোমার বুদ্ধি।'

উত্তর দেওয়ার আগে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল ফাহিমা। 'আচ্ছা, বয়স তো বসে নেই, বিয়ে থা করে দশটা বাচ্চাকাচ্চার বাপ হচ্ছেন না কেন?'

'কে বলল হইনি?'

রানার দিকে তাকাল ফাহিমা, মুখে চোখ বুলিয়ে কী যেন খুঁজল। 'আপনি আসলে সংসারের দায়িত্ব নেয়ার মত মানুষ নন। আপনি আসলে ভবঘুরে–আপনার শরীরে সম্ভবত কোন বেদুইনের রক্ত বইছে।'

'ধন্যবাদ,' বলে হাঁটার গতি একটু বাড়িয়ে দিল রানা।

তবে ফাহিমা ওর পাশেই থাকছে। 'মাসুদ ভাই, এখনও আপনি বলেননি এরপর আপনার প্ল্যানটা কী।'

'আপাতত আলালের কাছে ফিরছি,' জবাব দিল রানা। 'সে আমাকে একজন ইমামের কাছে নিয়ে যাবে।'

'কেন? ইমামকে আবার কী দরকার?'

'আলালকে আমি ওই হেডটা দেখিয়েছি,' বলল রানা। 'দুই পিঠের লেখাগুলোর অর্থ জানার জন্যে ওই ইমাম ভদ্রলোকের কাছে আমাকে নিয়ে যাবে সে।'

'ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছি, সব জায়গায় যেভাবে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন আপনি,' গলার শান্ত ভাব শুনে বোঝার উপায় নেই ফাহিমা খোঁচা মারছে কিনা। 'আব্বুর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ছোটবেলায় আমাকে নিয়ে গোটা দুনিয়া চষে বেড়িয়েছে।'

রাস্তার একটা মোড়ে পৌঁছাল ওরা। হঠাৎ কী হলো, ফাহিমার হাত ছেড়ে দিয়ে ভিড়ের ভিতর দিয়ে খিঁচে দৌড়াতে শুরু করল বাঁদরটা। লাফাতে লাফাতে একটা গলির ভিতর ঢুকে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।

'কী আশ্চর্য!' চেঁচিয়ে উঠল ফাহিমা, দাঁড়িয়ে পড়েছে। 'অ্যাই! ফিরে আয়!'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে রানা বলল, 'যায় যাক না।'

'ঠিক যখন মায়া জন্মাতে শুরু করেছে...' ম্লান মুখে কাঁধ

ঝাঁকাল ফাহিমা।

কথা না বলে তার হাত ধরে টান দিল রানা।

ভিড়ের ভিতর দিয়ে নাচতে নাচতে ছুটছে বাঁদরটা। লোকজন হাত বাড়িয়ে ছুঁতে চাইলেও, প্রত্যেককে এড়িয়ে গেল ওটা। আরেকটা গলির ভিতর ঢুকল, এদিক-ওদিক না তাকিয়ে একটা দোরগোড়ায় পৌঁছে লাফ দিয়ে চড়ে বসল ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির বাড়িয়ে দেওয়া হাতে।

লোকটার পরনে সাদা রঙের ঢোলা আলখেল্লা, ওই একই কাপড় দিয়ে মাথা আর মুখের দু'পাশ ভালোভাবে ঢাকা। সে-ই ট্রেনিং দিয়েছে বাঁদরটাকে।

পোষা প্রাণীটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করল লোকটা, ওটার মুখে একটা বিস্কিট গুঁজে দিল। তারপর দোরগোড়া থেকে বেরিয়ে এল সে। তার এই বাঁদর যে-কোন ব্লাডহাউন্ডের চেয়ে দক্ষ, একশো গুণ বেশি বুদ্ধিমান।

গলির মুখটা ভালো করে একবার দেখে নিয়ে চোখ তুলে ছাদের দিকে তাকাল লোকটা, তারপর একটা হাত তুলে নাড়ল।

কাছাকাছি একটা ছাদ থেকে হাত নেড়ে সঙ্কেত দিল অন্য এক লোক। বাঁদরটার গালে চুমো খেল প্রথম লোকটা। নিজের দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করেছে ওটা। খুন করা হবে এমন দু'জন মানুষের পিছু নিয়ে এদিকে ফিরে এসেছে।

লোকটা ভাবল, এবার শুধু ওদেরকে ঘিরে ফেললেই হয়।

এগারো

ফাহিমাকে নিয়ে একটা চৌরাস্তায় চলে এল রানা। চারদিকে একই দৃশ্য, রাস্তা আর ফুটপাত দখল করে দোকান বসানো হয়েছে। হকার, ভ্যানগাড়ির ফেরিওয়ালা আর খদ্দেরদের ঠাসাঠাসি ভিড়। এরকম অসম্ভব ভিড়ের কারণেই কোন ট্যাক্সি এদিকে আসতে চায় না।

আরেকটা জিনিস খেয়াল করল রানা, সবার পরনে রক্ষণশীল আরবী পোশাক, ঢোলা আলখেল্লা থাকায় কে যে ক্রেতা আর কে বিক্রেতা সহজে তা বোঝা যায় না। হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়ল ও।

সেই পুরানো খুঁতখুঁতে ভাবটা হঠাৎ আবার ফিরে এসেছে। কে যেন লক্ষ করছে ওকে। কিছু একটা ঘটবে বলে মনে হয়!

ভিড়ের ভিতর দিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল রানা। কী ঘটবে?

'আমরা থামলাম কেন?'

রানা কথা বলছে না।

চারদিকের আঁটসাঁট ভিড়। এতসব লোকের মধ্যে কার কী উদ্দেশ্য কীভাবে বুঝবে ও? জ্যাকেটের বোতাম খুলে পিস্তলের বাঁটটা একবার ছুঁলো, বেল্টের সঙ্গে কোমরে গোঁজা রয়েছে। তারপর খেয়াল করল ভিড়ের মধ্যে থেকে ছোট একটা গ্রুপ ওর দিকে এগোচ্ছে, বাকি সব লোকজনের চেয়ে এদের হাবভাব আর গতিবিধি একটু যেন অন্যরকম।

কয়েকজন আরবের ছোট একটা গ্রুপ, তবে তাদের সঙ্গে ওই

একই আলখেল্লা পরা দু'তিনজন শ্বেতাঙ্গও আছে।

ভিড়ের মধ্যে একটা ছুরি দেখল রানা, ফলায় রোদ লাগায় ঝিক করে উঠল। ঝট করে পিস্তলটা টেনে নিয়ে সেদিকে তাক করল ও, গর্জে উঠল আরবী ভাষায়, 'খবরদার! সাবধান!'

পিস্তল বেরিয়ে আসায় ভোজবাজির মত কাজ হলো। সাধারণ খদ্দের হকার আর ফেরিওলারা যে যেদিকে পারল ছুটল।

তবে বিপদের আসল চেহারাটা এবার পরিষ্কার হয়ে উঠল। শত্রুদের গ্রুপ একটা নয়। তারা তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে ওদেরকে—ধীর, দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হলো রানাকে। 'চলো পালাই!' বলে ফাহিমাকে ধাক্কা দিল ও। 'দৌড়াও!'

কিন্তু ফাহিমা দৌড়াচ্ছে না। পাশের দোকান থেকে লম্বা একটা ঝুলঝাড়ার ঝাঁটা টেনে নিয়ে সেটাকে চরকির মত ঘোরাল সে, ছুরি হাতে ছুটে আসা একজন আরবের গলায় আঘাত করল। ছিটকে তিন হাত দূরে গিয়ে পড়ল লোকটা।

'ছোটো!' আবার বলল রানা। 'ফাহিমা, দৌড়াও!'

'দাঁড়ান! কী ভেবেছে ওরা!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ফাহিমা। 'ওরা আমাকে চেনে? আমি এই এলাকারই মেয়ে!'

গ্রুপগুলোর উপর চট করে আরেকবার চোখ বুলাল রানা। বেশিরভাগই এরা ভাড়া করা স্থানীয় গুণ্ডাপাণ্ডা। শুধু ছুরি নয়, কারও কারও হাতে চাইনিজ কুড়ালও দেখা যাচ্ছে। প্রতিটি গ্রুপে অন্তত দু'জন করে শ্বেতাঙ্গ মার্সেনারি রয়েছে। তাদের হাতেও শুধু ছুরি দেখল রানা। অন্তত এখন পর্যন্ত কারও কাছে কোন আগ্নেয়াস্ত্র দেখেনি ও। হয়তো আলালের ধারণাই ঠিক, মোটা টাকার বিনিময়ে পুলিশের সঙ্গে একটা সমঝোতায় এসেছে মরমন মার্সেনারিরা—সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র রাখতে পারবে, তবে তা শো-পিস হিসাবে, কোন কারণেই গুলি করতে পারবে না।

গ্রুপগুলো দ্রুত কাছে চলে আসছে দেখে তিনদিকে তিনটে

গুলি করল রানা। হামলাকারীরা সঙ্গে সঙ্গে ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, কিন্তু একজন দুঃসাহসী মার্সেনারি ঝাঁপিয়ে পড়ল ওকে লক্ষ্য করে–উদ্দেশ্য ওর হাতের পিস্তলটা কেড়ে নেওয়া। উপর দিকে পা ছুঁড়ল রানা, লোকটার বুকটা যেন থেঁতলে দিল ওর পায়ের জুতো। বুক চেপে ধরে পিছনদিকে আছাড় খেল লোকটা, পড়বি তো পড় সরাসরি একটা ফলমূলের দোকানে। আপেল, কমলা, নাশপাতি, আঙুর, পাকা পেঁপে আর খেজুর রাস্তায় গড়াচ্ছে। দেয়ালে একটা গেট দেখল রানা, সঙ্গে সঙ্গে ফাহিমাকে টেনে নিয়ে ঢুকিয়ে দিল সেটার ভিতর। তারপর, ফাহিমা যাতে বেরুতে না পারে, বাইরে থেকে বোল্ট টেনে বন্ধ করে দিল গেট–তার চিৎকার চেঁচামেচি কানে তুলল না।

গেটের দিকে পিছন ফিরে চৌরাস্তার চারদিকে চোখ বুলাল রানা। যেদিকেই চোখ গেল, দেখল সব এলোমেলো হয়ে আছে। ফুটপাত আর রাস্তার উপর সাজানো দোকান একটাও অক্ষত নেই। ভ্যানগাড়িগুলোও কাত হয়ে পড়ে আছে। যে যেদিকে পারে ছুটে পালাবার সময় হিতাহিত জ্ঞান ছিল না লোকজনের, তাদের ধাক্কায় তছনছ হয়ে গেছে সব। আর তাই দেখে শুরু হয়ে গেছে পাইকারি লুটপাট আর ছিনতাই।

আচমকা বড় একটা ছোরা নিয়ে ছুটে এল নোংরা আলখেল্লা পরা এক লোক। ঝট করে শরীরটাকে ধনুকের মত বাঁকা করে নেওয়ায় ছুরির ফলাটাকে কোন রকমে এড়াতে পারল রানা।

লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় হোঁচট খেয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল লোকটা। তারপর ঘুরে তাকাল রানার দিকে। পিস্তলটা বাঁ হাতে চালান করে দিয়ে ডান হাতটা ঝাঁকাল রানা, সঙ্গে সঙ্গে তালুতে চলে এল ছুরিটা। আরেকবার কবজি ঝাঁকাল ও, ঝাপসা একটা ঝলকের মত ছুটল ছুরি। লোকটার ঠিক কণ্ঠার নীচে গেঁথে গেছে চকচকে ফলা, একটু একটু কাঁপছে।

লোকটা ঢলে পড়ছে, ছুটে এসে হাতলটা ধরল রানা, টান

দিয়ে খুলে নিল ছুরি। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে ক্ষতটা থেকে। রাস্তায় পড়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে আততায়ী লোকটা।

চারদিকে চোখ বুলাল রানা। কিছু লোক কপাল চাপড়ে কাঁদছে, কিছু ব্যস্ত নিজের দোকানের জিনিস-পত্র কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করতে, আরেক দল লুটেরা আর ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে একজোট হচ্ছে। ইতিমধ্যে সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে তাদের এই সর্বনাশের জন্য কারা দায়ী। কয়েকজন শ্বেতাঙ্গের প্ররোচনায় এক বিদেশীকে খুন বা অপহরণ করার চেষ্টায় ছিল স্থানীয় কিছু গুণ্ডা। ওই গুণ্ডাদের দু'একজন লুটেরাদের দলেও যোগ দিয়েছে।

ব্যবসায়ীরা একজোট হয়ে ধাওয়া করল তাদের। এই সুযোগে পিছু হটে গেটটার কাছে ফিরে এল রানা, পিছন দিকে হাত নিয়ে গিয়ে বোল্টটা খুলবে। কাঠের কবাটে ঘুসি মারছে ফাহিমা, শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু বোল্টটা খোলার সুযোগ পাওয়া গেল না, চাইনিজ কুড়াল নিয়ে একজন লোককে তেড়ে আসতে দেখল ও।

হামলা ঠেকাবার জন্য হাত তুলল রানা। খপ করে তার কবজি ধরে ফেলল। শুরু হলো শক্তির লড়াই আর ধস্তাধস্তি।

দরজায় ঘুসি মারা বন্ধ করে পিছু হটতে শুরু করল ফাহিমা, এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে দেখছে চৌরাস্তায় বেরুনোর আর কোন উপায় আছে কিনা। ছোট একটা বাগান পেরিয়ে এসে সরু প্যাসেজে ঢুকল সে, কিন্তু মাত্র বিশ ফুটের মত এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। আলখেল্লায় চেহারা ঢাকা একজন লোক দ্রুত হেঁটে আসছে তার দিকে, নড়াচড়ায় মারমুখো ভাব। সামনে একটা বাঁক রয়েছে, সেটা ঘুরে আরেক প্যাসেজ ধরে ছুটল সে।

পিছন থেকে ভেসে আসা লোকটার পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ফাহিমা। প্যাসেজটা বেশ লম্বা, পাহাড়ী ঢালের উপর বড় একটা সরকারী কলোনিকে ঘিরে তৈরি করা হয়েছে। দু'তিনবার বাঁক নিল সে, কোথায় যাচ্ছে কোন ধারণা নেই। আতঙ্ক যেন

পিষে ফেলবে তাকে। লোকটা ঠিক পিছনেই চলে এসেছে।

এই সময় ফাহিমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। প্যাসেজটা কানাগলি। সামনে পাঁচিল। পিছনে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা।

ছোটার গতি হঠাৎ বেড়ে গেল ফাহিমার, তারপর পাঁচিলটার মাথা লক্ষ্য করে লাফ দিল।

পাঁচিলের কিনারা ধরে ঝুলে পড়ল সে, আঁচড়ে-পাঁচড়ে মাথায় উঠল, শুনতে পেল হাঁপাতে হাঁপাতে পাঁচিলের গোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে লোকটা।

লাফ দিয়ে নীচে পড়ল ফাহিমা। কয়েক পা ছুটে দুটো দালানের মাঝখানে একটা দোরগোড়ায় লুকাল।

আলখেল্লা পরা গুণ্ডাও পাঁচিল টপকে নীচে পড়ল, কোন রকম সন্দেহ না করে ছুটছে সে, ফাহিমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

খানিক পর উঁকি দিয়ে তাকাতে ফাহিমা দেখতে পেল ফিরে আসছে লোকটা, এবার তার সঙ্গে একজন শ্বেতাঙ্গ রয়েছে। ঝট্ করে দোরগোড়ার আরও ভিতরে সরে এল সে, এখনও হাঁপাচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতে কী করা উচিত ভাবছে সে। কী আবার, যতক্ষণ পারা যায় গা ঢাকা দিয়ে থাকা উচিত। দোরগোড়ার আরও ভিতর দিকে, গাঢ় ছায়ায় সরে এল সে। আরে, এদিকে এটা কী? ভালো করে তাকাতে চেনা গেল জিনিসটাকে। বেতের তৈরি বিরাট একটা ঝুড়ি। এই এলাকায় এই ঝুড়ি খুবই জনপ্রিয়। পাঁচ-সাত মণ করে জিনিস ধরে, মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দু'জন লোক লাগে।

সন্দেহ নেই লোকগুলো এই দোরগোড়ার ভিতর খুঁজবে তাকে। বেশি কিছু চিন্তা না করে ঝুড়িটার ডালা তুলে ভিতরে ঢুকে বসে পড়ল ফাহিমা, তারপর ডালাটা টেনে নিল মাথার উপর। নোড়ো না, সাবধান করল নিজেকে, শান্ত থাকো।

বেতের ফাঁক দিয়ে ভেসে আসা জুতোর আওয়াজ পরিষ্কার

শুনতে পাচ্ছে ফাহিমা, তার খোঁজে আশপাশেই হাঁটাহাঁটি করছে লোক দু'জন। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথাও বলছে, যদিও কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না। তবে কিছু একটা নিয়ে দু'জনের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে বলে মনে হলো। ফাহিমা আন্দাজ করল শ্বেতাঙ্গ লোকটা বলছে, এই দোরগোড়ার ভিতরটা ভালো করে দেখো। আর উত্তরে স্থানীয় গুণ্ডা বলছে, আগেই দেখেছি–ওদিকে কেউ নেই।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত আওয়াজ ঢুকল ফাহিমার কানে। দৃশ্যটা সে দেখতে পাচ্ছে না, দেখার কোন উপায় নেই–রাস্তার ওপারের একটা পাঁচিলে বসে দোরগোড়াটার ভিতর তাকিয়ে রয়েছে সেই বাঁদরটা। আচমকা সেটাই চেঁচামেচি শুরু করেছে।

একটু খেয়াল করতেই কী ঘটছে বুঝতে পারল ফাহিমা। বাঁদরটা! প্লিজ, ভাই, বিদায় হ! কিন্তু তার আবেদন কোন কাজে লাগল না। হঠাৎ অনুভব করল, ঝুড়ি সহ উপরে তোলা হচ্ছে তাকে।

বোনা বেতের ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাল ফাহিমা। সেই লোক দু'জনই–স্থানীয় আর বিদেশী শ্বেতাঙ্গ–কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

চিৎকার শুরু করল ফাহিমা। 'বাঁচাও! বাঁচাও! কিন্তু কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে না। হাত-পা ছুঁড়ছে, ঘুসি মারছে ডালার গায়ে–বৃথা চেষ্টা, কারণ ডালাটা বাইরে থেকে আঁটো করে বেঁধে ফেলা হয়েছে।

বাজারের ভিতর চৌরাস্তায় পরিস্থিতি দ্রুত রানার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। স্যাঁৎ করে সরে গিয়ে চাইনিজ কুড়াল আর তার পিছনের লোকটাকে ফাঁকি দিল ও, তারপর একটা পা বাড়িয়ে ল্যাঙ মারল–ছিটকে দূরে পড়ল সে।

ওদিকে শ্বেতাঙ্গ মার্সেনারি আর স্থানীয় গুণ্ডাদের ধাওয়া করে

দূরে সরিয়ে দেওয়ার পর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা কী কারণে বলা মুশকিল রানার উপরও খেপে উঠল। 'ওই শালাই যত নষ্টের গোড়া!' বলে তেড়ে এল তারা।

এই সুযোগে গুণ্ডাদের একজন, ল্যাং খেয়ে ছিটকে পড়া সেই চাইনিজ কুড়ালের মালিক, উত্তেজিত ব্যবসায়ীদের দলে ভিড়ে গেল—দেখা গেল সে-ই নেতৃত্ব দিচ্ছে।

একটা গুলি করল রানা। সামনের সারির লোকজন থমকালেও, লিডার মোটেও ভ্রূক্ষেপ করছে না—এরকম ফাঁকা গুলি করতে আগেও দেখেছে রানাকে।

হঠাৎ তার দিকে ছুটে এল রানা, তারপর অকস্মাৎ থেমে একপাশে বাঁকা করল শরীর সবুট ডান-পা তুলে প্রচণ্ড এক লাথি মারল লোকটার বুকে। লোকটার বুক যেন নিরেট একটা পাঁচিলের সঙ্গে ধাক্কা খেল।

ফিরে গিয়ে ভিড়ের গায়ে বাড়ি খেল লোকটা । পিছিয়ে এসে এবার রানা দরজার বোল্ট খুলে ফেলল। ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বাগানের ভিতর দিয়ে ছুটল ও। ফাহিমার মতই সরু প্যাসেজটায় ঢুকে পড়ল।

কয়েকটা বাঁক ঘুরে কানাগলিতে পৌঁছাল রানাও। পাঁচিলের গায়ে শ্যাওলার উপর আঁচড়াআঁচড়ির দাগ দেখে যা বোঝার বুঝে নিল, পাঁচিল টপকে রাস্তায় নেমে এদিক-ওদিক ফাহিমার খোঁজে তাকাচ্ছে।

তারপর ছুটল রানা। জায়গাটা বাজারের পিছন দিক। ভ্যানগাড়ি, ট্রাক, হাফ-ট্রাক, ঠেলা আর গরুর গাড়ির ভিড় লেগে আছে। আরও খানিক সামনে এগোবার পর ফাহিমার ক্ষীণ চিৎকার শুনতে পেল: 'বাঁচান! বাঁচান! মাসুদ ভাই!'

অথচ চারদিকে চোখ বুলিয়ে কোথাও ফাহিমাকে দেখতে পাচ্ছে না রানা। তারপর দু'জন লোকের তাড়াহুড়ো ভাব লক্ষ করে সন্দেহ হলো রানার। কাঁধে একটা বিরাট বেতের ঝুড়ি নিয়ে

ছুটছে তারা, একটা বাঁক ঘুরে দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

ছুটল রানা সেদিকে, এই সময় ঝুড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে শুনল ফাহিমার চিৎকার। 'মাসুদ ভাই! বাঁচান!'

বাঁক ঘুরে হারিয়ে গেছে ঝুড়িসহ লোক দু'জন। সেদিকে ছোটার সময় আরেকটা আওয়াজ ঢুকল রানার কানে। তারপর চিনতে পারল–একটা বাঁদর চেঁচামেচি করছে। বাঁকের কাছে, একটা পাঁচিলের মাথায়, দেখতেও পেল সেটাকে।

বাঁদরটাকে দেখেই গুলি করতে ইচ্ছে হলো রানার। ইচ্ছেটাকে দমন করে বাঁক ঘুরল ও, দেখল ঝুড়ি নিয়ে ছুটছে লোক দু'জন।

ফাহিমার ভার মাথায় নিয়ে অত জোরে কীভাবে দৌড়াচ্ছে ওরা, ভাবল রানা। এরপর প্রতিটি বাঁক ঘোরার পরই দেখা গেল রানার চেয়ে এগিয়ে আছে তারা।

বাজারের এদিকটাও যথেষ্ট ভিড় দেখা যাচ্ছে। একই রকম দেখতে ঝুড়ি চারদিকে আরও অনেক রয়েছে, ফলে ফাহিমাকে অনুসরণ করতে সমস্যা হচ্ছে রানার। দ্রুত এগোবার জন্য লোকজনকে গুঁতো মারছে, নির্দিষ্ট ঝুড়িটাকে চোখের আড়াল করতে রাজি নয়। ওর ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ছে লোকজন। তাদের চিৎকার আর প্রতিবাদ কানে তুলছে না। ফাহিমাকে হারানো চলবে না! ঝুড়িটাকে চোখে চোখে রাখতে হবে।

হঠাৎ আশ্চর্য একটা গুঞ্জন শুনতে পেল রানা। প্রথমে অস্পষ্ট, যেন একদল মৌমাছি ভন ভন করছে। তারপর একটু স্পষ্ট হতে নিজের ভুল বুঝতে পারল। মৌমাছি নয়, মানুষের নিচু কণ্ঠস্বর, সুরটা খুব বেশি বিষণ্ন। কারা এরকম আওয়াজ করছে, কোনদিক থেকে ভেসে আসছে, প্রথমে কিছুই বোঝা গেল না। তবে বিচিত্র শব্দটা দাঁড় করিয়ে ফেলেছে ওকে। এই মুহূর্তে নিজেকে দিক্‌ভ্রান্ত দিশেহারা বলে মনে হচ্ছে।

আবার যখন রানা নড়ল, উপলব্ধি করল ফাহিমাকে হারিয়ে

ফেলেছে। ঝুড়িটাকে দেখতে পাচ্ছে না কোথাও।

ভিড় ঠেলে আবার ছুটল রানা। সেই আশ্চর্য সুর আরও করুণ রসে সিক্ত হয়ে যেন কাছে সরে আসছে।

একটা গলির মুখে থমকে দাঁড়াল রানা।

ওর সামনে দু'জন স্থানীয় লোক, একটা ঝুড়ি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হাতে পিস্তল নিয়ে তাদের পথ আটকাল ও। ওকে নয়, পিস্তল দেখে আঁতকে উঠল তারা, কাঁধের ঝুড়ি ফেলে দিয়ে খিঁচে দৌড়াল।

দ্রুত এগিয়ে এসে কাত হয়ে পড়া ঝুড়িটাকে সিধে করল রানা, উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইছে, 'ব্যথা পেয়েছ, ফাহিমা?'

বাঁধনটা ছিঁড়ে ডালা খুলল রানা। কোথায় ফাহিমা, ঝুড়ির ভিতর থরে থরে সাজানো রয়েছে বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল আর অ্যামুনিশন।

এ অন্য ঝুড়ি! ফিরতি পথ ধরে কিছু দূর আসার পর ডান দিকে বাঁক ঘুরল রানা, বাজার এলাকার বাইরেটা ঘুরেফিরে দেখতে চায়, বিশেষ করে ট্রাক স্ট্যান্ডটা।

হাঁটছে রানা, সেই করুণ গুঞ্জন ধ্বনি আবার জোরাল হয়ে উঠল। হাঁটতে হাঁটতে একটা চৌরাস্তায় চলে এল ও, তারপরই নিজের চারপাশে দুঃখের বন্যা বয়ে যেতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। এটা ফকির-মিসকিন, ল্যাংড়া-নুলো, পঙ্গু-প্রতিবন্ধী, অন্ধ-কানা আর কুষ্ঠরোগীদের গলি–সবাই কাঁদছে, হাহাকার করছে, সাহায্যের আশায় হাত পেতে আছে। এদিকের বাতাসে মলমূত্র আর ঘামের তীব্র দুর্গন্ধ।

ওদের সবাইকে এড়িয়ে গলির মুখটা পার হয়ে এল রানা। কিন্তু আবারও ওকে থমকাতে হলো।

করুণ গুঞ্জন ধ্বনির কারণটা এতক্ষণে পরিষ্কার হলো। চৌরাস্তার আরেক প্রান্তে লাশ নিয়ে একটা শোক মিছিল দেখা গেল। বেশ বড় মিছিল, নিশ্চয়ই এলাকার গণ্যমান্য কেউ মারা

গেছে। সওয়ারবিহীন ঘোড়া টেনে নিয়ে আসছে কফিনটাকে। এটা খ্রিস্টানদের মিছিল, প্রিস্টরা বাইবেল থেকে পাঠ করছেন। স্কার্ফ দিয়ে মাথা ঢাকা মহিলারা রয়েছে মিছিলের সামনে, প্রত্যেকের পরনে কালো পোশাক। চাকরবাকররা আসছে পিছু পিছু। সবশেষে বলি দেওয়ার জন্য টেনে আনা হচ্ছে প্রকাণ্ড আকারের একটা কালো মোষ।

মিছিলের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, ভাবছে ওটার ভিতর দিয়ে গলিটায় ঢুকবে কীভাবে।

কফিনটার দিকে তাকাল রানা–অলঙ্কৃত, জমকালো, উঁচু করে তুলে ধরা হয়েছে। তারপর, শোকাচ্ছন্ন মানুষের ভিড়ের ভিতর অকস্মাৎ একটা ফাঁক তৈরি হওয়ায়, আবার একটা ঝুড়ি দেখতে পেল রানা। দু'জন লোকের কাঁধে রয়েছে. লোক দু'জন যত দ্রুত পারা যায় ছুটছে।

এত সব কাতর মানুষের বিলাপধ্বনির মধ্যে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়, তবে রানার মনে হলো ঝুড়িটার ভিতর থেকে ফাহিমার চিৎকার ভেসে আসছে।

মরিয়া হয়ে ভিড় ঠেলে এগোবার চেষ্টা করছে রানা, দেখল ক্যানভাস ঢাকা একটা ট্রাকে তোলা হচ্ছে ঝুড়িটা।

ভিড় থেকে কোনরকমে বেরিয়ে এসেছে রানা. এই সময় ঘটনাটা ঘটল।

ট্রাকের পিছন থেকে গর্জে উঠল একটা মেশিন গান, চৌরাস্তা জুড়ে শুরু হলো বিরতিহীন বুলেট বর্ষণ।

প্রথমে ফাঁকা আওয়াজ হলো, বুলেটগুলো ঝাঁক বেঁধে উড়ে গেল ফকির মিসকিন আর শবযাত্রীদের মাথার উপর দিয়ে। যিশুর অনুসারী ধর্মযাজকরা প্রথম ঝাঁক গুলির পরেও নির্বিকার থাকার চেষ্টা করলেন, তারপর সটান শুয়ে পড়লেন রাস্তার উপর।

এরপর আর এক ঝাঁক বুলেট ছুটে এসে কফিনে লাগল। চারদিকে ছুটল কাঠের টুকরো, কফিন থেকে পিছলে রাস্তায় নেমে

পড়ল সাদা কাপড় মোড়া লাশ। তাই দেখে ক্রন্দনরত শোকাতুর মানুষগুলো প্রাণ নিয়ে ছুটল যে যেদিকে পারল।

আঁকাবাঁকা একটা পথ তৈরি করে ছুটছে রানা, লক্ষ্য চৌরাস্তার আরেক প্রান্তের বৃত্তাকার আইল্যান্ড। ছুটতে ছুটতে ট্রাকের দিকে দুটো গুলি করল। তারপর আইল্যান্ডের আড়াল পেয়ে ক্রল করে আরও খানিকটা সামনে এগোল। হঠাৎ মাথা তুলে উঁকি দিল ও, দেখল ট্রাকের পিছনে ছুঁড়ে দেওয়া হলো বেতের ঝুড়িটা। ঠিক এই সময়, প্রায় ওর দৃষ্টিপথের বাইরে, কোন রকমে দেখা গেল, কালো একটা সিডান স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করল। একই সঙ্গে ট্রাকটাও সচল হলো

ঢাল বেয়ে উঠে যাওয়া রাস্তায় পড়ল ট্রাক। ওটার সামনে ধনুকের মত বেঁকে গেছে রাস্তাটা। দৌড়ে ওটার সঙ্গে পারা যাবে না। আশপাশে অন্য কোন গাড়ি নেই যে পিছু নেবে। মুহূর্তের জন্য অসহায় বোধ করল রানা।

তারপর সিদ্ধান্ত নিল। জানে কী করতে হবে এখন।

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সাবধানে, সময় নিয়ে লক্ষ্যস্থির করল রানা; এতটা আত্মবিশ্বাস আর দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে খুব কমই টার্গেট প্র্যাকটিস করেছে ও।

অবশেষে ট্রিগার টানল। ট্রাকের ড্রাইভার ঢলে পড়ল সামনে, হুইলের উপর। ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একবার পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেতে যাচ্ছে, আরেকবার খাদের কিনারায় নেমে যেতে চাইছে।

আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে রানা। মারাত্মক বোকামি করে ফেলেছে ও।

অবশেষে কিনারা থেকে গভীর খাদে লাফ দিল ট্রাক। কিছুই করার থাকল না, শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতে হলো ফাহিমার করুণ পরিণতি।

কিনারা থেকে ঢাল বেয়ে খাদের তলায় নেমে যাওয়ার সময় চারবার ডিগবাজি খেল পাঁচটনী ট্রাকটা। বডিটা ভেঙে চুরমার হয়ে

গেল নীচের নদীতে পানি খুব কম, সেখানে কাত হয়ে পড়ে থাকল যন্ত্রদানব, ঝুড়িটা ওটার নীচে চাপা পড়েছে। তারপর শুরু হলো গোলা-বারুদের বিরতিহীন বিস্ফোরণ। বোঝা গেল, ফাহিমাকে সহ ঝুড়িটা তোলা হয়েছিল একটা অ্যামিউনিশন ট্রাকে।

উপরে, রাস্তার কিনারায় দাঁড়িয়ে, অপরাধ বোধে জর্জরিত হচ্ছে রানা। তীব্র একটা ব্যথায় অসহ্য কষ্ট পাচ্ছে।

ফাহিমা মারা গেছে। বিশ্বাস করা যায় না, অথচ এটাই নির্মম সত্য। বলতে গেলে রানা তাকে নিজের হাতে খুন করেছে।

ছি, এরকম একটা ভুল কী করে করল ও!

বারো

অকুস্থল থেকে সরে এসে উদ্দেশ্যবিহীন বেশ কিছুক্ষণ হাঁটল রানা, বারবার সেই বিশেষ মুহূর্তটিতে ফিরে যাচ্ছে অস্থির মনটা, লক্ষ্যস্থির শেষ করে যখন ওয়ালথারের ট্রিগারটা টানল ও, খুন করল ড্রাইভারকে। কেন? কেন এই কথাটা ওর মনে হলো না যে ট্রাকটায় বিপজ্জনক কিছু থাকতে পারে।

হঠাৎ একটা বার দেখে ভিতরে ঢুকল রানা। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। আবার শোক কাটিয়ে ওঠার জন্য খুব কড়া কিছু হওয়া চাই। বারের একটা টুলে বসে নির্জলা ব্র্যান্ডি চাইল রানা।

চল্লিশ মিনিটের মধ্যে চার আউন্স খেয়ে ফেলল। নিজেকে চোখ রাঙাল রানা—খবরদার, আর নয়। মানি ব্যাগের জন্য পকেটে

হাত ভরতে যাবে, কনুইটা কে যেন ছুঁলো।

ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল রানা। দেখল ওর পাশে, বারে বসে রয়েছে পাজিটা। ফাহিমার ন্যাওটা সেই বাঁদর।

ফাহিমা ওটাকে পছন্দ করত। কাজেই রানা বিরক্ত হচ্ছে না বা কিছু বলছে না। মাথাটা কাত করে একদৃষ্টে দেখছে ওকে বাঁদরটা।

হঠাৎ রানা খেয়াল করল বারম্যান অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, ও যেন স্থানীয় কোন পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে এসেছে। তারপরই দেখা গেল আলখেল্লা পরা তিনজন শ্বেতাঙ্গ ওকে ঘিরে ফেলছে।

'এক ভদ্রলোক তোমার সঙ্গ পেতে চাইছেন,' তাদের একজন বলল, উচ্চারণে আমেরিকান টান।

'দেখছ না আমি ব্যস্ত?' ইঙ্গিতে বাঁদরটাকে দেখাল রানা। 'বন্ধুর সঙ্গে গলা ভেজাচ্ছি।'

'তোমার সঙ্গ কামনা করা হয়নি, রানা। দাবি করা হয়েছে।'

তিনজন মিলে টুল থেকে টেনে তুলল রানাকে, দ্রুত পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে এল বারের পিছনদিকের একটা কামরায়। কিচকিচ শব্দ তুলে পিছু নিয়ে ভিতরে ঢুকল বাঁদরটাও। কামরায় আলো খুব কম। চুরুটের ধোঁয়া ভেসে আছে বাতাসে।

এক কোণে ফেলা টেবিলটার ওপাশে বসে আছে কেউ।

রানা উপলব্ধি করল, এর সঙ্গে দেখা হতই।

ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে কুখ্যাত ফ্রেঞ্চ আর্কিওলজিস্ট পল ভিতেরা, কোলের উপর একটা পিস্তল পড়ে রয়েছে। একটা চেইন ঘুরিয়ে আঙুলে জড়াচ্ছে সে, চেইনের মাথায় একটা পকেট ঘড়ি। 'শেষ পর্যন্ত একটা বাঁদর?' হেসে উঠল ভিতেরা। 'বন্ধু নির্বাচনে রুচির ছাপ আছে, এ-কথা মানতে পারলাম না, মিস্টার মাসুদ রানা।'

রানা জবাব দিল, 'ইউ বাস্টার্ড!'

'তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, এই বিপজ্জনক অভিযানে মিস কাসেমিকে আমি নিয়ে আসিনি। বুঝতে পারছি বিবেকের কামড়টা বেশ ভোগাচ্ছে তোমাকে, কারণ ঘটনাটার জন্য নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দায়ী করতে পারছ না যে।'

ভিতেরার উল্টোদিকের চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়ল রানা। 'তুমি একটা নরকের কীট, ভিতেরা।'

সামনের দিকে ঝুঁকল ভিতেরা। 'কে নয়, বন্ধু, নরকের কীট কে নয়? জবাব দাও, তুমি এখানে কেন? আর্কের লোভে, তাই না? আর্টিফ্যাক্ট সংগ্রহের সেই আদি ও অকৃত্রিম স্বপ্ন। স্বপ্ন? নাকি রক্তের সঙ্গে মিশে থাকা রোগজীবাণু? ভাইরাস?'

হাসছে ভিতেরা, চেইনের মাথায় আটকানো পকেটঘড়িটা এখনও ঘোরাচ্ছে। 'ঘড়িটা দেখছ, রানা? সস্তা। নগণ্য। মরুভূমিতে নিয়ে গিয়ে বালির নীচে পুঁতে রাখো এক হাজার বছর, ব্যস অমূল্য রতন হয়ে উঠবে। এটার জন্য খুন করবে মানুষ–আমার আর তোমার মত মানুষেরা।'

'রোগজীবাণুটা তোমার রক্তে আছে, ভিতেরা, আমার নয়,' বলল রানা। 'আর্টিফ্যাক্টের জন্যে তুমি খুন করবে, আমি না।'

'আর্কটার কথা আলাদা, আমি স্বীকার করছি,' বলল ভিতেরা, রানার কথা তাকে যেন স্পর্শই করেনি। 'লাভ ছাড়াও এটা পেতে চাওয়ার অন্য কারণ আছে।'

'এখানে আমাকে নিয়ে আসার কারণ কী?' জানতে চাইল রানা।

'আর্কটা আসলে কী, তুমি কি তা বোঝো, রানা? জিনিসটা আসলে একটা ট্র্যান্সমিটারের মত। একটা রেডিওর মতও বলতে পার, যেটার মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা যায়। শুনলে বিস্মিত হবে, ওই পর্যায়ের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি আমি। অতি নিকটে, হে! অতি নিকটে! এরকম কাছে আসার জন্য বছরের পর বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি আমি।

'এই মুহূর্তে লাভ বা লোভবিহীন একটা বিষয়ে কথা বলছি আমি। আর্কটার ভেতর যে শক্তি লুকিয়ে আছে সেটার সঙ্গে যোগাযোগের কথা বলছি।'

'এ-সব বুজরুকি তুমি বিশ্বাস করো?' রানার গলায় বিদ্রূপের হাসি।

রানা যেন লোকটাকে চড় মেরেছে। চেয়ারে সিধে হয়ে বসল সে। সবগুলো আঙুলের ডগা এক করল। 'ও, আচ্ছা, আর্কটার অলৌকিক ক্ষমতায় তোমার বিশ্বাস নেই?'

কথা না বলে কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'তারমানে, তুমি নিশ্চিত নও,' গলার আওয়াজ নিচু করল ভিতেরা। 'আমি শুধু নিশ্চিত নই, তারচেয়েও বেশি–পজিটিভ। এখন আর এক মুহূর্তের জন্যেও আমি সন্দেহ করি না। আমার গবেষণা সব সময় আমাকে এদিকটায় টেনে এনেছে। আমি জানি।'

'তুমি উন্মাদ হয়ে গেছ,' বলল রানা।

'সে-ও আমার কম ভাগ্য নয়,' বলল ভিতেরা, কোল থেকে হাতে চলে এল পিস্তলটা। 'ভেবে দেখো, আমি এমন একটা জিনিসের সন্ধান পেয়েছি যেটার জন্যে পাগল হওয়া যায়। তা ছাড়া, পাগল হতে না পারলে ডক্টর জাওয়াদকে কি আমি খুন করতে পারতাম? তোমাকে খুন করতে পারব?'

'খুন করার জন্যে এটা যথেষ্ট নির্জন জায়গা হলো না।'

মনে মনে হাসল ভিতেরা–না, হে, এখনই তোমাকে আমি খুন করতে চাইছি না। 'তাতে কিছু আসে যায় না। এই আরবরা বিদেশীদের ব্যাপারে নাক গলায় না। আমরা পরস্পরকে মেরে ফেলছি দেখলে টু-শব্দটিও করবে না।' চেয়ার ছাড়ল ভিতেরা, হাসছে। ছোট্ট করে মাথাটা একবার ঝাঁকাল।

রানা ধারণা করল নিজের লোকদের নির্দেশ দিল ভিতেরা। সময় পাওয়ার জন্য বলল, 'আশা করি, যোগাযোগ সম্ভব হলে

খোদা এক চড়ে তোমার দাঁত কটা ফেলে দেবেন।'

'তিনি পরম করুণাময়, রানা, আমি ক্ষমা চেয়ে নেব।'

নিজেকে শক্ত করল রানা। এখন আর দ্রুত পিস্তল বের করার সময় নেই। ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে মার্কিনিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়াটাও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না—সংখ্যায় ওরা তিনজন। 'কোত্থেকে, কীভাবে ক্ষমা করবেন তিনি, ডক্টর জাওয়াদ যদি অভিযোগ প্রত্যাহার করে না নেন?' জিজ্ঞেস করল ও।

পকেট ঘড়িটা দেখছে ভিতেরা। 'কিছু দিন না হয় নরকবাস করলামই, রানা। বেশিরভাগ ভালো ভালো মানুষগুলোকে ওখানেই দেখতে পাব বলে আশা রাখি। সময়টা খুব মন্দ কাটবে বলে মনে করি না।'

বাইরে কোথাও থেকে একটা শোরগোলের আওয়াজ ভেসে এল। উত্তেজিত শিশুদের সম্মিলিত চেঁচামেচি বলে মনে হলো। ছোটছোট অনেক ছেলেমেয়ে আনন্দে টগবগ করলে এরকম আওয়াজ হওয়া সম্ভব। তবে ডেথ চেম্বারে এ-ধরনের কিছু রানা আশা করেনি।

দরজার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ভিতেরা। আলালের ছেলেরা, নয়জন, রানার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে কামরার ভিতর ঢুকে পড়ছে। রানা হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল, বাচ্চাগুলো ওকে ঘিরে ফেলেছে। একদম ছোটরা উঠে বসছে ওর হাঁটুতে, বাকি সবাই ওকে ঘিরে এমন ভঙ্গিতে চক্কর দিচ্ছে, উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার বোঝা গেল—ওকে আড়াল করার জন্য একটা মানববন্ধন তৈরি করা হয়েছে। একজন রানার গলা ধরে ঝুলে পড়ল। আরেকজন ওর হাঁটুর নীচটা আলিঙ্গন করছে।

রানার হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে দেখে ভুরু কোঁচকাল ভিতেরা। 'এটা তোমার একটা নোংরা কৌশল, রানা। দুগ্ধপোষ্য শিশুদের ফিট করে রেখেছিলে, বিপদ দেখা দিলে যাতে বাঁচাতে আসে? ছি-ছি! কী মনে করো, আমি যদি চাই তোমাকে খুন করব,

৮

এই মানববন্ধন তোমাকে বাঁচাতে পারবে?' মাথা নাড়ল সে। 'মিছে ভয় পেয়েছ, হে। তোমাকে আমি এখনই খুন করতে চাইছি না।'

ভিতেরার কথা শোনার বা জবাব দেওয়ার সময় কোথায় রানার। বাচ্চাগুলো এখন দরজার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। তবে আড়ালটা ভাঙেনি, যত্নের সঙ্গে নজর রাখছে মানববন্ধনে যাতে কোন ফাঁক তৈরি না হয়।

শত্রুদের নড়াচড়ার উপর নজর রাখছে রানাও। তবে এই মুহূর্তে আলালের কথা ভাবছে ও। এটা নিঃসন্দেহে তার প্ল্যান—মারাত্মক ঝুঁকি আছে জানার পরও নিজের ছেলেদের বারে পাঠিয়েছে নিরাপদে ওকে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এটা মেনে নেওয়া যায় না। এরকম জঘন্য একটা ঝুঁকি কীভাবে নিতে পারল আলাল?

চেয়ারটায় আবার বসল ভিতেরা, পিস্তলটা কোলের উপর ফেলে হাত দুটো বুকের নীচে ভাঁজ করল। 'আন্তর্জাতিক শ্রম আদালতে মামলা করব আমি, শিশুশ্রম-বিরোধী আইনকে তুমি বুড়ো আঙুল দেখিয়েছ!'

'মঁশিয়ে ভিতেরা,' আমেরিকানদের একজন প্রশ্ন করল, 'আপনি ওকে চলে যেতে দিচ্ছেন?'

ইঙ্গিতে ওদেরকে যার যার অস্ত্র সরিয়ে রাখতে বলল ভিতেরা। 'কুকুর আর শিশুদের প্রতি খানিকটা দরদ আছে আমার,' বলল সে। 'তবে ওকে চলে যেতে দিচ্ছি অন্য একটা কারণে।' কী কারণে তা আর ব্যাখ্যা করল না সে।

এই মুহূর্তে ওদের উপর চোখ রেখে দ্রুত পিছু হটছে রানা। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ও, বাচ্চারা মূল্যবান খেলনার মত আঁকড়ে ধরে আছে ওকে।

বারের বাইরে আলালের ট্রাক অপেক্ষা করছে, সদলবলে সেদিকে ছুটল রানা।

ট্রাক ছুটছে, ড্রাইভিং সিটে আলাল। পাশ থেকে রানা বলল, 'তোমার বাচ্চাদের সময় জ্ঞানের প্রশংসা না করে পারছি না। কিন্তু এত বড় ঝুঁকি তুমি কোন আক্কেলে নিলে?'

হাসছে আলাল।

'জানো, তোমার ছেলেরা ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছে আজ?' আবার বলল রানা। 'যে-কোন কারণেই হোক ভিতেরা এখনই আমাকে পথ থেকে সরাবার কথা ভাবছে না।'

আলাল বলল, 'কিন্তু পরিস্থিতি দেখে আমার মনে হলো দ্রুত কিছু একটা করা দরকার।'

সামনের রাস্তায় চোখ বুলাল রানা। চারদিক অন্ধকার, এদিক-সেদিক দু'একজায়গায় মিটমিটে আলো দেখা যাচ্ছে। রাস্তার লোকজন দ্রুত সরে গিয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছে ট্রাককে। বাচ্চারা সবাই পিছনে, একদল গান ধরেছে, আরেক দল হাসাহাসি করছে। যে কথাটা ভুলতে চাইছে রানা, বারবার সেটাই শুধু ফিরে আসছে মনে।

'ফাহিমা...'

'জানি,' বলল আলাল। 'খবরটা আগেই আমার কানে এসেছে। আমি ব্যথিত। তারচেয়েও বেশি...ভাষায় বলতে পারছি না। কী বলে আপনাকে সান্ত্বনা দেব?' অসহায় দেখাল তাকে, সাহায্যের আশায় তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'এই শোক আপনি ভুলবেন কীভাবে?'

'এটা ভোলার মত কোন শোক নয়, আলাল।'

মাথা ঝাঁকাল আলাল। 'জী, বুঝতে পারছি।'

'তবে তুমি অন্যভাবে আমাকে সাহায্য করতে পারো,' বলল রানা। 'সাহায্য করতে পারো ওদেরকে শায়েস্তা করার কাজে।'

'আপনি শুধু মুখ ফুটে বলবেন কখন কী দরকার,' বলল আলাল। 'দেখবেন সাহায্য পান কিনা।'

কিছুক্ষণ শান্তভাবে গাড়ি চালাল সে। বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে।

'আপনার জন্যে অনেক খবর আছে, মিস্টার রানা,' আবার বলল আলাল। 'ওই আর্ক সম্পর্কে। কিছু খবর ভালো নয়

'শোনাও।'

'আগে বাড়িতে পৌঁছাই,' বলল আলাল। 'আলোচনার পর আমার সঙ্গে বেরোবেন একবার।'

'তোমার সেই ইমামের কাছে নিয়ে যাবে আমাকে?'

'হ্যাঁ। চিহ্নগুলোর অর্থ বলে দেবেন তিনি।'

ক্লান্ত বোধ করছে রানা। মাথার ঠিক মাঝখানে দপদপে একটা ব্যথা কষ্ট দিচ্ছে। অসময়ে অপরিমিত মদ্যপানের বিরূপ প্রতিক্রিয়া। বোধহয় সেজন্যই খেয়াল করল না যে বার থেকে একটা মোটরসাইকেল ওদের ট্রাকটাকে অনুসরণ করে আসছে। তবে খেয়াল করলেও রাইডারকে চিনতে পারত না ও।

লোকটা বাঁদরকে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যাপারে রীতিমত একজন এক্সপার্ট।

বাচ্চাদের অন্দরমহলে পাঠিয়ে দিয়ে রানাকে নিয়ে পাঁচিলঘেরা উঠানে চলে এল আলাল। পাঁচিল ঘেঁষে কিছুক্ষণ হাঁটার পর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল সে, 'ভিতেরার কাছে মেডেলটা আছে।'

'হোয়াট?' আঁতকে উঠল রানা, সঙ্গে সঙ্গে প্যান্টের ভাঁজে লুকানো হেডপিসটা বের করল। 'ভুল হচ্ছে তোমার।'

'তার কাছে একটা কপি আছে। আপনার কাছে যেটা রয়েছে হুবহু ওটার মতই আরেকটা হেডপিস–মাঝখানে ক্রিস্টাল। সেটাতেও একই রকম মার্কিং দেখেছি আমি।'

'তোমার কথার কোনও অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না,' বলল রানা, হতভম্ব দেখাচ্ছে ওকে। 'আমার জানামতে এটার আর কোন কপি নেই–এমনকী কোন ছবিও নেই যে দেখে নকল করা যাবে।

ব্যাপারটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না, আলাল।'

'মিস্টার রানা, আমার ছেলে আরেকটা খবর নিয়ে এসেছে।'

'শুনছি আমি।'

'আজ সকালে ম্যাপ রুমে ঢুকেছিল ভিতেরা। বেরিয়ে আসার পর লোকজনকে নির্দেশ দেয় কোথায় খুঁড়তে হবে। নতুন একটা স্পট, সার। যে জায়গায় খোঁড়া হচ্ছে সেদিকে নয়।'

'তারমানে,' বিড়বিড় করল রানা, 'আত্মাদের কুয়া খুঁজছে সে।'

'আমারও তাই ধারণা। ম্যাপ রুমে ঢুকে নিশ্চয়ই আজ অঙ্ক কষে লোকেশনটা বের করেছে।'

হাতের তালুতে বার কয়েক ঘুসি মারল রানা। আলালের দিকে ফিরে আবার মেডেলটা বের করল। 'তুমি নিশ্চিত, জিনিসটা হুবহু এরকম দেখতে?'

'আমার কথা বিশ্বাস করুন, সার। দুটোই আমি দেখেছি।'

'আবার দেখো, আলাল।'

হাত বাড়িয়ে হেডপিসটা নিল আলাল, নেড়েচেড়ে বেশ কিছুক্ষণ দেখল। তারপর বলল, 'একটা পার্থক্য বোধহয় আছে।'

'চেপে রেখো না।'

'ভিতেরার মেডেলটায় মার্কিং আছে শুধু একদিকে।'

'তুমি শিওর?'

'শিওর।'

'এখন আমার জানা দরকার,' বলল রানা, 'মার্কিংগুলোর কী অর্থ।'

'তা হলে চলুন এখনই আমরা বেরিয়ে পড়ি—ইমাম সাহেবকে এখন পাওয়া যাবে।'

কথা না বলে আলালের পিছু নিয়ে বাড়ি থেকে গলিতে বেরিয়ে এল রানা। একটা তাগাদা অনুভব করছে ও। আর্ক একটা কারণ, সন্দেহ নেই—ওটা উদ্ধার করতে হবে ওকে, তারপর তুলে

দিতে হবে মোসাদের হাতে। কথা যখন দিয়েছে, দায়িত্বটা পালন করতে হবে ওকে। তবে তাগিদ অনুভব করার আরও একটা কারণ আছে। সেই কারণের নাম ফাহিমা। তার মৃত্যুকে যদি তাৎপর্যময় বা অর্থবহ করতে হয়, আত্মাদের কুয়ায় ভিতেরার আগে পৌঁছাতে হবে ওকে।

রাস্তা পার হয়ে আলালের ট্রাকে চড়ল ওরা। চড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে হঠাৎ রানা খেয়াল করল ট্রাকের পিছনে বাঁদরটা রয়েছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ও। ওটা কি ওর পিছু ছাড়বে না?

দাঁত দেখিয়ে অদ্ভুত কিছু শব্দ করল বাঁদরটা, তারপর সামনের থাবা দুটো পরস্পরের সঙ্গে ঘষল।

ট্রাক ছেড়ে দিল আলাল। বেশি দূর এগোয়নি ওরা, অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে পিছু নিল সেই মোটরসাইকেল আরোহী।

বিশ মাইল পুবে একটা পাহাড়ী ঢালের উপর ইমাম সাহেবের বাড়ি। কাছাকাছি গ্রাম থেকে তাঁর বাড়িটা বেশ একটু দূরে। বাড়িটাকেও ঠিক সাধারণ বলা যাবে না। কাঠামোটা এমনভাবে তৈরি করা, একটা অবজারভেটরি বলে মনে হলো রানার। আসলেও তাই–বাঁদরটাকে পিছনে নিয়ে রানা আর আলাল যখন প্রবেশপথ দিয়ে ভিতরে ঢুকছে, ছাদের গায়ে একটা ফাঁক চোখে পড়ল, সেই ফাঁকে ফিট করা হয়েছে বড় আকারের একটা টেলিস্কোপ।

আলাল জানাল, 'ইমাম সাহেব অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ। তিনি শুধু ধর্ম নিয়ে চর্চা করেন না, বিজ্ঞানের সবগুলো শাখার ওপর তাঁর প্রচুর পড়াশোনা আছে। তিনি একাধারে মৌলানা, বিদ্যান ও অ্যাস্ট্রনমার। কেউ যদি চিহ্নগুলোর অর্থ করতে পারেন তো তিনিই পারবেন।'

সামনে দেখা গেল সদর দরজা খোলা রয়েছে। একজন তরুণ

অপেক্ষা করছিল, ওদেরকে দেখে সালাম জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

'শুভ সন্ধ্যা, আব্বাস,' বলল আলাল। 'ইনি মাসুদ রানা। মিস্টার রানা, এ আব্বাস আসলাম, ইমাম সাহেবের ছাত্র।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। আব্বাসের পিছু নিয়ে একটা হলরুমে ঢুকে শতরঞ্চির উপর বসল ওরা। ঘরের ভিতর চেয়ার টেবিল রাখা হয়নি। একধারে গদি আর বালিশ দেখা গেল। একটু পর অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এসে ওই গদিতে এসে দাঁড়ালেন ইমাম সাহেব। তাঁর বয়স হয়েছে, রানার হিসাবে আশির কম নয়। শরীরটা ভঙ্গুর বলে মনে হলেও তাঁর চোখ জোড়ায় কৌতূহল, উৎসাহ আর প্রত্যাশার কোন অভাব নেই। হাত তুলে নিঃশব্দে সালাম দিলেন তিনি। তাঁর পরনে সুতো বেরিয়ে পড়া সাদা একটা আলখেল্লা।

'এখানে মেহমানদের কষ্ট হবে,' কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন ইমাম। 'চলুন আমার খাস কামরায় বসে কথা বলি।'

তার পিছু নিয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে এল ওরা। কিছুটা হেঁটে ইমামের স্টাডিরুমে ঢুকল। কামরাটার চারদিকের আলমারি আর র‍্যাকে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, আধুনিক বই-পত্র, ম্যাপ, পুরানো ডকুমেন্ট ইত্যাদি সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দেখলেই বোঝা যায় সারাজীবন ধরে একজন সাধক জ্ঞানপিপাসা মিটিয়েছেন এই কামরায়।

বড় একটা মেহগনি ডেস্কের পিছনে বসলেন ইমাম। ইঙ্গিতে বসতে বললেন ওদেরকেও। চারদিকে পরদা লাগানো চারটে দরজা দেখা যাচ্ছে। বাতাসে পরদা উড়লে একটা দরজা দিয়ে ডাইনিং রুম দেখতে পাচ্ছে ওরা। কিচেনটা পাশেই, তবে স্টাডি রুম থেকে সেটা দেখা যাচ্ছে না।

বাঁদরটা বসল রানা আর আলালের মাঝখানে কার্পেটের উপর। হাত বাড়িয়ে ওটার মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দিল আলাল।

ইতিমধ্যে পকেট থেকে বের করে ইমামের হাতে মেডেলটা ধরিয়ে দিয়েছে রানা। নেড়েচেড়ে দেখলেন তিনি। তারপর চেয়ার ছেড়ে কামরার এক কোণে চলে গেলেন, ওখানে একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে।

টেবিল ল্যাম্পের আলোয় মেডেলটা অনেক সময় নিয়ে পরীক্ষা করলেন ইমাম। কামরার ভিতর নীরবতা নেমে এল।

খানিক পর পর একটা কাগজে খসখস করে কিছু লিখছেন ইমাম। ঘাড় ফিরিয়ে মাঝে মধ্যে তাঁর দিকে তাকাচ্ছে রানা, চোখের দৃষ্টিতে অসহিষ্ণু ভাব।

'একটু ধৈর্য ধরুন, সার!' বিড়বিড় করল আলাল।

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা।

ইমামের বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে মোটরসাইকেল থামাল লোকটা। পিছনের একটা দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকল সে। ঢোকার পর একের পর এক খোলা জানালা দিয়ে ভিতরে তাকাচ্ছে। এভাবে কিচেন রুমটা খুঁজে নিল সে।

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আব্বাসকে দেখছে লোকটা। একটা বালতি থেকে পানি নিয়ে পাকা খেজুর ধুচ্ছে ছেলেটা। অপেক্ষায় থাকল আগন্তুক।

ধোয়ার পর খেজুরগুলো একটা চিনামাটির প্লেটে ঢালল আব্বাস, প্লেটটা নিয়ে এসে রাখল টেবিলের উপর। এখনও নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ছে না লোকটা, গাঢ় ছায়ার সঙ্গে মিশে অদৃশ্য হয়ে আছে।

এরপর বড় একটা জাগে পেস্তা-বাদাম আর জাফরান সহযোগে সরবত বানাল আব্বাস। কয়েকটা গ্লাসসহ জাগটা সাজাল একটা ট্রের উপর। তারপর ট্রে-টা নিয়ে কিচেন ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

এতক্ষণে ছায়া থেকে বেরিয়ে এল আগন্তুক, খোলা দরজা

দিয়ে সোজা কিচেনে ঢুকে পড়ল। আলখেল্লার ভিতর থেকে একটা বোতল বের করল সে, খুলল সেটা। বোতলের ভিতর লালচে, সামান্য আঠালো তরল পদার্থ রয়েছে। খেজুর ভর্তি প্লেটে এই তরল পদার্থ ঢেলে দিল সে।

পায়ের শব্দ! এদিকেই এগিয়ে আসছে!

দ্রুত বোতলের ছিপি বন্ধ করে কিচেন ছেড়ে বেরিয়ে গেল আততায়ী।

ইমাম এখনও মুখ খোলেননি। মাঝে মধ্যে আলালের দিকে তাকাচ্ছে রানা। ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে বসে আছে সে, বুঝতে অসুবিধে হয় না এই ধরনের অপেক্ষায় অভ্যস্ত।

দরজা খুলে গেল। পরদা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল আব্বাস, ডেস্কের উপর নামিয়ে রাখল হাতের ট্রে। সরবত দেখে পিপাসা অনুভব করল রানা, তবে সেদিকে হাত বাড়াল না। নীরবতা অস্বস্তিকর লাগছে ওর।

কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে একটু পর আবার ফিরে এল আব্বাস, এবার নিয়ে এসেছে খেজুর, পনির, ফলমূল আর কাজু বাদাম।

অন্যমনস্ক আলাল প্লেট থেকে ছোট একটা খেজুর মুখে তুলতে গিয়েও বেআদবি হয়ে যাচ্ছে মনে করে নামিয়ে রাখল। খেজুরগুলো ভারি সুন্দর দেখতে, তবে খিদে নেই রানার। বাঁদরটা নিজের জায়গা ছেড়ে সরে গেল, এদিক ওদিক ঘুরে ঠাঁই নিল ডেস্কের তলায়।

কামরার ভিতরটা এখনও নীরব।

সামনের দিকে ঝুঁকে প্লেট থেকে একটা খেজুর নিল রানা। বাঁদরটা ক্যাচ ধরতে পারে কি না দেখার জন্য ওর কাছাকাছিই শূন্যে ছুঁড়ল ওটা নিখুঁত ক্যাচ ধরল বাঁদর, ধরেই মুখে পুরল বলটা। প্রশংসার দৃষ্টিতে ওটার দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা।

নাহ্, ইমাম সাহেবের কাজ আর শেষ হয় না। এখন আবার ম্যাগনিফাইং গ্লাস লাগিয়েছেন এক চোখে।

'দেখুন! এদিকে এসে দেখুন!' হঠাৎ করে বললেন ইমাম।

তাঁর কাঁপা কাঁপা কর্কশ কণ্ঠস্বর দীর্ঘ নিস্তব্ধতা ভেঙে দিল। ডেস্ক ছেড়ে টেবিলের দিকে এগোল রানা আর আলাল। ইমামের কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল ওরা।

মেডেলের মার্কিংগুলোর দিকে আঙুল তাক করলেন ইমাম। 'এটা একটা ওয়ার্নিং...আর্ক অভ দ্য কাভান্যান্টকে ডিসটার্ব করা যাবে না।'

সামনের দিকে ঝুঁকল রানা, ইমামের হাড়সর্বস্ব কাঁধ প্রায় ছুঁয়ে দিল। 'করলে?'

'আল্লাহর গজব পড়বে সময়ের আগে। সাগর খেপে উঠবে বাতাস গরম হয়ে ওঠায়। মাটির অনেক নীচে যে আলোড়ন হাজার বছর পর সৃষ্টি হওয়ার কথা, তা আলোড়িত হবে তৎক্ষণাৎ।'

'ইমাম সাহেব, একটু বুঝিয়ে বলুন,' অনুরোধ করল আলাল। 'সময়ের আগে কথাটার অর্থ আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

দাঁতবিহীন মাড়ি বের করে হাসলেন ইমাম। 'লোকে আমাকে জ্ঞানী মানুষ বলে, কথাটা মিথ্যা নয়। জ্ঞানী বলেই জানি, আসলে আমি মহা মূর্খ। এখানে এমন অনেক কিছু লেখা আছে যার অর্থ উদ্ধার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আবার এমন কিছু কথা লেখা আছে যার অর্থ এত ভয়ঙ্কর যে আপনাদের আমি শোনাব না—অনুবাদে যদি ভুল করে থাকি, এই ভয়ে।

'তবে সময়ের আগে বলতে কী বোঝানো হয়েছে সেটা বোধহয় আমি ব্যাখ্যা করতে পারি। ধরে নিন, আর্কটার ভেতর এমন একটা পদার্থ আছে, যার চরিত্র বা প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নেই, ধারণা নেই সেটার বৈশিষ্ট্য আর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও। সেই পদার্থ হয়তো এই দুনিয়ার নয়। আমরা কিছু

রানা-৩৫২

ছুঁড়লে সেটা কী করে? বাতাস ভেদ করে। আর্কের ভেতর জিনিসটাকে নাড়াচাড়া করলে সেটা হয়তো মাইলের পর মাইল মাটি ভেদ করে বা কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে কিছু একটা নড়িয়ে দেয়–কাজটা হয়তো ফিজিক্যালি করা হয় না, হয়তো অদৃশ্য ইনফ্লুয়েন্সের সাহায্যে করা হয়।

'এখানে কিছু জায়গার নাম আছে। সবই অতি প্রাচীন। জায়গাগুলো এখনও আছে, তবে আগের নামে নয়। আমি এখনকার কয়েকটা নাম বলি–সিসিলি, ক্রিট, সাইপ্রাস। রয়েছে আরও অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপের নাম। যদি প্রয়োজন মনে করেন নামগুলো লিখে নিতে পারেন।'

'তার দরকার নেই, আমাদের মনে থাকবে, ইমাম সাহেব,' বলল আলাল।

'তো এই দ্বীপ আর জায়গা সম্পর্কে বলা হয়েছে–এক সময় এগুলো থাকবে না। তবে এগুলো যখন ধ্বংস হবার কথা নয় তখনও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে–ওই বিশেষ অচেনা পদার্থ যদি ওখানে এক্সপোজ করা হয়।'

কামরার ভিতর অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল।

তারপর রানার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'অন্যান্য মার্কিংগুলো কী বলছে?'

'স্টাফ অভ রা, অর্থাৎ লাঠির দৈর্ঘ্যের বিষয়টা উল্লেখ করা হয়েছে–যেটার সঙ্গে জোড়া লাগানো থাকবে হেডপিসটা,' বললেন ইমাম। 'ওটা ছাড়া মেডেলটার কোনও কার্যকারিতা নেই।'

রানা লক্ষ করল বৃদ্ধ ইমামের ঠোঁট সামান্য কালচে হয়ে আছে, কারণটা সম্ভবত এই যে খানিক পরপরই জিভ দিয়ে ওগুলো ঘষেন। 'তা হলে হেডের কপি থেকে স্টাফ কতটা লম্বা হবে জেনে ফেলেছে ভিতেরা,' আলালকে বলল ও।

মাথা ঝাঁকাল আলাল। একটা খেজুর তুলে নিল হাতে।

'মাপটা কী?'

'এটা আগেকার দিনের হিসাব,' জানালেন ইমাম। 'এখানে বলা হয়েছে ছয় কদম উঁচু।'

'প্রায় বাহাত্তর ইঞ্চি,' বলল আলাল।

'আমি এখনও শেষ করিনি,' বললেন ইমাম। 'হেডপিসের উল্টোদিকে আরও কথা রয়েছে। পড়ে শোনাচ্ছি–"এবং হিব্রু সৃষ্টিকর্তার সম্মানে এক কদম ফিরিয়ে দাও, এই আর্কটার যিনি মালিক"।'

খেজুর সহ আলালের হাতটা মুখের কাছাকাছি পৌঁছে স্থির হয়ে গেল রানার প্রশ্ন শুনে।

'তুমি নিশ্চিত, ভিতেরার হেডপিসের শুধু একপিঠে মার্কিং আছে?' আলালকে জিজ্ঞেস করল ও।

'পজিটিভ।' হাসতে শুরু করেছে আলাল। 'তারমানে ভিতেরার লাঠি বারো ইঞ্চি বেশি লম্বা! তারা ভুল জায়গায় খুঁজছে, সার!'

হাসছে রানাও। পরস্পরের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল ওরা। ওদের এই উচ্ছ্বাস নির্বিকারচিত্তে চাক্ষুষ করছেন ইমাম।

হঠাৎ তিনি বললেন, 'এই ভিতেরা কে, আমি জানি না। আমি শুধু জানি আর্ক সম্পর্কে ওয়ার্নিংটা সিরিয়াস। আরও বলা দরকার যে ওখানে লেখা আছে…আর্ক খুলে কেউ যদি ভিতরের জিনিস বা শক্তিকে মুক্ত করে দেয় নিজের এবং চারপাশে যারা থাকবে তাদের সবার জন্য মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনবে সে। এই সতর্কবাণীকে আমি গুরুত্ব দিই।'

মুহূর্তটি গম্ভীর হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু শয়তান ফ্রেঞ্চ আর্কিওলজিস্ট ভুল করছে শোনার পর রানা আর আলাল এতটাই উল্লাস বোধ করছে যে ইমামের সব কথা গুরুত্বের সঙ্গে নিল না ওরা। কল্পনার চোখে রানা দেখতে চেষ্টা করল আত্মাদের কুয়া খুঁজে না পেলে ভিতেরার চেহারাটা কেমন বিকৃত হয়ে উঠবে।

খুশি মনে হাতের খেজুরটা মুখে পুরতে যাচ্ছে আলাল, হঠাৎ

থাবা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিল ওটা রানা।

চমকে চাইল ও রানার চোখের দিকে।

ইমাম সাহেবও অবাক।

আঙুল তুলে ডেস্কের নীচটা দেখাল রানা।

বাঁদরটা ওখানে মরে পড়ে আছে। ওটার চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে বেশ কয়েকটা খেজুর। মুখ তুলে ইমামের দিকে তাকাল রানা। 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, এখানকার খাবারে বিষ মেশানো হয়েছে। ইমাম সাহেব, টেস্ট না করে কেউ যেন কিছু না খায়।'

তেরো

সকালের মরু জ্বলছে। বালির বিস্তৃতি ঝিলমিল করছে। সন্দেহ নেই, ভাবল রানা, এরকম জায়গাতেই মানুষ মরীচিকা দেখে। যান্ত্রিক শব্দ দূষণ তৈরি করে ফাঁকা রাস্তার উপর দিয়ে ছুটে চলেছে ওদের ট্রাক।

আলালের কাছ থেকে ধার করা ঢোলা একটা আলখেল্লা পরেছে রানা, মাথা ঢাকার এক প্রস্থ কাপড় সহ।

ঘাড় ফিরিয়ে মাঝে মধ্যে পিছনের ট্রাকটা দেখে নিচ্ছে রানা। আলালের বন্ধু রিয়াদ চালাচ্ছে ওটা, পিছনে ছয়জন মিশরীয় খনক আছে, তাদের নেতৃত্বে রয়েছে আলালের বড় ছেলে বিল্লাল। ওরা যে ট্রাকে রয়েছে, তার পিছনে আরও তিনজন আছে। লোকগুলো বিশ্বস্ত কিনা বলা মুশকিল, আরও অনেক কিছুর মত এ-ব্যাপারেও

আলালের কথায় আস্থা রাখতে হচ্ছে রানাকে।

'স্বীকার করতে সঙ্কোচ নেই,' হঠাৎ বলল আলাল, 'আমি নার্ভাস।'

'খুব বেশি মাথা ঘামিয়ো না।'

'আপনি অনেক বড় ঝুঁকি নিচ্ছেন,' বলল আলাল।

'পরিস্থিতি বাধ্য করছে,' মন্তব্য করল রানা। আকাশের দিকে তাকাল ও। সকাল বেলার রোদ নির্মম হাতুড়ির মত প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করছে বালির উপর।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল আলাল। 'আশা করি লাঠিটা আমরা ঠিক সাইজ মতই কেটেছি।'

'মাপজোকে ভুল হবার আশঙ্কা কম,' বলল রানা। ট্রাকের পিছনে রাখা পাঁচ ফুট লাঠিটার কথা ভাবল। কাল রাতে ওটা মাপমত কাটতে কয়েক ঘণ্টা সময় লেগেছে ওদের। মাথার দিকটা চাঁছতে হয়েছে হেডপিসটা যাতে ফিট করে।

লাঠির মাথায় মেডেলটা পরানোর সময় আশ্চর্য একটা অনুভূতি হয়েছিল রানার। সেই মুহূর্তে সুদূর অতীতের সঙ্গে নিজের একটা দৃঢ় বন্ধন, কল্পনার চোখে কেউ যেন ওকে দেখাচ্ছিল অন্য কারও একজোড়া হাত এই একই হেডপিস এই একই ভঙ্গিতে একটা লাঠির মাথায় পরাচ্ছিল সেই কত হাজার বছর আগে। ট্রাক দুটো দাঁড়াল। নীচে নেমে পিছনে চলে এল রানা, ইঙ্গিতে বিল্লাল আর রিয়াদকে নামিয়ে এনে কিছু জিজ্ঞেস করল।

জবাবে হাত তুলে দূরের একটা জায়গা দেখাল রিয়াদ। ওদিকটা প্রায় সমতলই বলা যায়, শুধু বালিয়াড়িগুলো ঢেউ খেলানো। 'ওখানে অপেক্ষা করব আমরা।'

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ঘষল রানা।

'গুড লাক, মিস্টার রানা,' বলে আবার ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল রিয়াদ, বালির ছোট একটা ঝড় তুলে ছেড়ে দিল ট্রাক।

নিজেদের ট্রাকে, আলালের পাশে ফিরে এল রানা, সঙ্গে এবার বিল্লালও রয়েছে। দেরি না করে আবার রওনা হয়ে গেল আলাল।

ধীরগতিতে মাইলখানেক এগোল ওরা, তারপর আবার থামল। নীচে নামল রানা আর আলাল, বালির একটা বিস্তৃতি পেরিয়ে উপুড় হয়ে পাশাপাশি শুলো, তারপর কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে ওদের নীচের জায়গাটায় তাকাল।

নীচে ওটা প্রাচীন তান্নিস শহর, ভিতেরার নেতৃত্বে আমেরিকান মরমনরা খুঁজে পেয়েছে।

আয়োজনটা বিশাল। খরচের তোয়াক্কা না করে আধুনিক সব যন্ত্রপাতি নিয়ে আসা হয়েছে। যোগাড়-যন্ত্র দেখেই বোঝা যায়, আর্কটা মরমনদের খুবই দরকার।

তারপর রানার মনে পড়ল—দরকার ইজরায়েলেরও।

নীচে তাকিয়ে ক্রেন, ট্রাক, বুলডোজার আর কয়েক সারিতে অনেকগুলো তাঁবু দেখতে পাচ্ছে ওরা। ফতুয়া আর আলখেল্লা পরা কয়েকশো মিশরীয় খনক কাজ করছে, তবে সুপারভাইজাররা সবাই সুটেডবুটেড আমেরিকান। বিরাট জায়গা জুড়ে কাজ করছে খনকরা। খোঁড়া গর্তের সংখ্যা এত বেশি যে গুণে শেষ করা যাবে না। পাওয়া গেছে প্যাসেজ, ভিত, পাঁচিল ইত্যাদি; কিন্তু বেশিরভাগ ইতিমধ্যে পরিত্যক্ত।

এক পাশে, একটু দূরে, একটা এয়ারস্ট্রিপ দেখা যাচ্ছে।

'এত বড় জায়গা নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি আগে কখনও দেখিনি আমি,' মন্তব্য করল রানা।

ব্যস্ততা আর তৎপরতা সবচেয়ে যেদিকে বেশি সেদিকে হাত তুলল বিল্লাল। ওখানে বালির বিরাট স্তূপ দেখা যাচ্ছে, মাঝখানে গর্ত; চারধারে একটা রশি জড়ানো হয়েছে, সেটা নেমে এসেছে একজোড়া পোস্ট-এর মাঝখান থেকে। 'ম্যাপ রুম,' বলল সে।

'কখন ওটায় রোদ লাগবে?'

'আটটার ঠিক পরে,সার।'

'তা হলে বেশি দেরি নেই,' হাতঘড়ি দেখে বলল রানা, 'আত্মাদের কুয়ার খোঁজে কোথায় খুঁড়ছে আমেরিকানরা?'

আবার একটা হাত লম্বা করল বিল্লাল। লোকজনের ব্যস্ততা থেকে বেশ খানিকটা দূরে, এক ঝাঁক বালিয়াড়ির ভিতর, কয়েকটা ট্রাক আর বুলডোজার দেখা যাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর ক্রল করে খানিকটা পিছিয়ে এসে সিধে হলো। 'রশি আনতে বলেছিলাম, এনেছ তো?' আলালকে জিজ্ঞেস করল ও।

'আনিনি মানে!'

'তা হলে আর দেরি নয়। চলো।'

মিশরীয় খনকদের একজন ট্রাকের ড্রাইভিং সিটে বসল। ধীরে ধীরে প্রকাণ্ড আকারের গর্তগুলোর দিকে এগোচ্ছে ট্রাক। পিছন থেকে লাফ দিয়ে দু'সারি তাঁবুর মাঝখানে পড়ল রানা, আলাল আর বিল্লাল। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে, তবে সাবধানে ম্যাপ রুমের দিকে এগোল তিনজন। পাঁচ ফুটী লাঠিটা রানার হাতে রয়েছে। ও ভাবছে, হাতে এত বড় একটা কাঠ নিয়ে কতক্ষণ লোকজনের চোখ ফাঁকি দেওয়া সম্ভব?

কয়েকজন শ্বেতাঙ্গকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা। দেখা গেল শুধু শ্বেতাঙ্গ নয়, মরমনদের মধ্যে দু'চারজন আমেরিকান নিগ্রোও আছে। কালো বা সাদা কেউ অবশ্য ওদের দিকে খেয়াল দিচ্ছে না। ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে সকালের রোদে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প-গুজব করছে তারা।

আরও কিছুদূর এগিয়ে এসে থামার ইঙ্গিত করল আলাল। ম্যাপ রুমের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অলস পায়ে হাঁটা শুরু করল রানা, যতটা স্বাভাবিক ভঙ্গিতে পারা যায়—সরাসরি গর্তটার কিনারা লক্ষ্য করে—প্রাচীন

ম্যাপ রুমের সিলিং ওটা।

গর্তের কিনারায় থেমে ঝুঁকে নীচে তাকাল রানা, তারপর দম আটকে আলালের দিকে ঘাড় ফেরাল।

আলখেল্লার ভিতর থেকে কুণ্ডুলী পাকানো এক প্রস্থ রশি বের করল আলাল। বাপের কাছ থেকে সেটা চেয়ে নিল বিল্লাল, তারপর রশির একটা প্রান্ত কাছাকাছি পড়ে থাকা তেলভর্তি একটা ড্রামের সঙ্গে বাঁধল সে।

গর্তের ভিতর লাঠিটা নামাল রানা, বাপ-ব্যাটার দিকে ফিরে হাসল, তারপর হাত বাড়িয়ে রশিটা ধরল। চেহারা থমথম করছে, ঘামে ঢাকা পড়ে আছে মুখ, রানার কাজ দেখছে ওরা।

রশিটা নীচে ফেলে দিল রানা, তারপর ম্যাপ রুমে নামতে শুরু করল।

প্রাচীন তানিস শহরের ম্যাপ রুম, ভাবল ও। অন্য কোন সময়ে শুধু যদি কল্পনা করত যে এখানে সত্যি সত্যি আসতে পেরেছে, তাতেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত ওর গোটা অস্তিত্ব।

মেঝেতে পৌঁছে রশিটায় টান দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে উপরে টেনে নিল আলাল।

এ এমন একটা জায়গা, উত্তেজিত না হয়ে উপায় নেই। উপর থেকে নেমে আসা সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত, আঁকা ছবির মত সুন্দর একটা কামরা। মেঝে ধরে এগোল, যেদিকে তানিস শহরের খুদে আকারের মডেলটা রাখা হয়েছে–বিচিত্র একটা ম্যাপ, পাথর কেটে তৈরি, সমস্ত খুঁটিনাটি সহ; এত নিখুঁত যে দালানগুলোর ভিতর আর রাস্তা-ঘাটে বিন্দু আকারের লোকজনকেও পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে। কারিগরদের দক্ষতা মুগ্ধ করল রানাকে।

ম্যাপের পাশে মোজাইক টাইল গেঁথে একটা রেখা তৈরি করা হয়েছে। নিয়মিত ব্যবধানে গর্ত রয়েছে এই রেখায়, প্রতিটির সঙ্গে বছরের নির্দিষ্ট একটা সময়ের প্রতীকচিহ্ন। গর্তগুলো তৈরি করা

হয়েছে লাঠিটার গোড়া ভিতরে ঢোকার মত করে।

আলখেল্লার পকেট থেকে মেডেলটা বের করল রানা। লাঠিটা ধরে রোদের দিকে তাকাল ও, সেটা ধীরে ধীরে এরই মধ্যে ওর পায়ের কাছে পড়ে থাকা খুদে শহরটার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে।

ঘড়িতে সময় এখন সাতটা পঞ্চাশ। হাতে আর বেশি সময় নেই রানার।

রশিটা টেনে নিয়েছে বিল্লাল, হাতে জড়িয়েছে, আর ঠিক এই সময় দেখা গেল একটা জিপ আসছে তেল ভর্তি ড্রামটার দিকে।

'আমাকে চেনে, দেখলেও কিছু বলবে না ওরা!' তাড়াতাড়ি বলল বিল্লাল। 'তুমি কোথাও লুকিয়ে পড়ো!'

কিন্তু লুকাবার সময় পাওয়া গেল না।

পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল জিপ।

'এই! তোমরা!'

বোকার মত হাসার চেষ্টা করল বিল্লাল আর আলাল।

আমেরিকান লোকটা বলল, 'হ্যাঁ, তোমাদেরকেই বলছি। ওখানে কী করছিলে তোমরা?'

'কই না, কিছু করিনি তো!' নিরীহ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বিল্লাল। 'এদিকে একটা কাজ ছিল, তাই আমার আব্বাকে নিয়ে এসেছি।'

'ভালই করেছ, আমাদের কাজে লাগার সুযোগ পাচ্ছ। রশিটা এদিকে নিয়ে এসো,' মরমন লোকটা বলল। 'এই শালার জিপ আটকে গেছে।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে রশিটা খুলল বিল্লাল, তারপর হেঁটে এল জিপের কাছে। ইতিমধ্যে আরেকটা গাড়ি পৌঁছে গেছে। এটা একটা ট্রাক। জিপটার কয়েক ফুট সামনে থেমেছে ওটা।

'রশিটা জিপ আর ট্রাকে বাঁধো,' লোকটা হুকুম করল

বিল্লালকে।

হু-হু করে ঘামছে আলাল।

নিঃশব্দে হুকুমটা পালন করল বিল্লাল।

রশিটা, ভাবল আলাল। এই রশিটার উপর নির্ভর করছে ম্যাপ রুম থেকে রানার উঠে আসা। যেটা এখন দুটো মার্কিন গাড়ির মাঝখানে ঝুলছে। দুটো ইঞ্জিনের গর্জন শুনছে সে, বালিতে ডেবে বসা চাকাগুলোর গোঙানিও শুনতে পাচ্ছে। ক্রমে টান টান হলো রশিটা। হায়, ওটা ছাড়া ম্যাপ রুম থেকে মিস্টার রানাকে তারা তুলবে কীভাবে!

জিপটার পিছু নিয়ে বালির উপর দিয়ে কিছুদূর হাঁটল বিল্লাল, খেয়াল করল না খোলা একটা আগুনে পাতিল বসিয়ে খাবার গরম করা হচ্ছে। একটা টেবিলের চারধারে কয়েকজন আমেরিকান বসে রয়েছে, তাদের মধ্যে একজন বাপ-ব্যাটাকে ডেকে বলল, টেবিলে খাবার দিয়ে যাও।

মাথাটা ঠিকমত কাজ করছে না, তাদের দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকল আলাল।

'তুমি কানে শোনো না?'

মাথা নুইয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল আলাল, আগুন থেকে পাতিলটা তুলে টেবিলের দিকে এগোচ্ছে।

দ্রুত হাতে টেবিলটা পরিষ্কার করছে বিল্লাল।

বাপ-ব্যাটার দু'জনের মাথাতেই এক চিন্তা–ম্যাপ রুমে আটকা পড়ে আছেন মিস্টার রানা। ভাবছে রশি ছাড়া কীভাবে তাঁকে উপরে তোলার ব্যবস্থা করা যায়।

টেবিলে পরিবেশন শুরু করল তারা, আমেরিকান মার্সেনারিদের অপমানকর কথাবার্তা গায়ে মাখছে না, ভান করছে না বোঝার। পরিবেশনের কাজটা খুব দ্রুত শেষ করল। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে টেবিলের চারদিকে খানিকটা খাবার ছড়াল। এই অপরাধের শাস্তি হিসাবে মাথার পাশে গাঁট্টা খেতে

হলো আলালকে।

'ব্যাটা উজবুক কাঁহিকে! শালা আমার শার্টটা নোংরা করে দিল!'

মাথা নোয়াল আলাল। লজ্জার ভান।

'যাও, পানি আনো! জলদি!'

পানির খোঁজে ছুটল আলাল।

হেডপিসটা বের করে অত্যন্ত সাবধানে লাঠির মাথায় ফিট করল রানা। লাঠির গোড়াটা মোজাইক করা গর্তগুলোর একটায় ঢোকাল, শুনতে পেল প্রাচীন টাইলে ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ করে এঁটে বসল কাঠটা।

হেডপিসের মাথায় রোদ লাগল, হলুদ রশ্মি সরে এসেছে ক্রিস্টালের ছোট্ট ফুটোটার কিনারায়। অপেক্ষা করছে রানা। উপর দিক থেকে ভেসে আসা চেঁচানোর একটা আওয়াজ শুনতে পেল ও। মাথা থেকে অন্য সব চিন্তা বের করে দিল–আমেরিকানদের নিয়ে পরে ভাবা যাবে।

সূর্যের রশ্মি ক্রিস্টালকে ভেদ করল, খুদে শহরের উপর তৈরি হলো উজ্জ্বল আলোর একটা রেখা। ক্রিস্টালটা স্বচ্ছ হওয়ায় আলোর রেখাটা সব জায়গায় এক রকম নয়, ভাঙা ভাঙা। তা সত্ত্বেও খুদে দালান-কোঠা আর রাস্তাঘাটের ভিড়ের উপর দিয়ে এসে বিশেষ ভাবে একটা জায়গাতেই তা পড়েছে।

ছোট একটা দালানের গায়ে জ্বলজ্বল করে উঠল লাল আলো, যেন প্রাচীন কোন কেমিস্ট্রির কল্যাণে উজ্জ্বল আভা ছড়াচ্ছে। অবাক হয়ে প্রতিফলনের বিচিত্র ফলাফলটা দেখছে রানা, খেয়াল করল আশপাশের দালানের গায়ে লাল পেইন্ট দিয়ে কিছু মাপজোক লেখা হয়েছে–সবই পরিচ্ছন্ন আর তাজা। পল ভিতেরার হিসাব।

কিংবা বেহিসাব!

হেডপিসের আলোয় উদ্ভাসিত দালানটা ভিতেরার তৈরি শেষ লাল চিহ্ন থেকে আঠারো ইঞ্চি কাছে।

দারুণ! একেবারে নিখুঁত! এর বেশি কিছু আশা করতে পারে না রানা। মাটিতে হাঁটু ঠেকিয়ে হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে খুদে শহরটা দেখছে ও। তারপর আলখেল্লার পকেট থেকে একটা টেপ বের করে ভিতেরার সর্বশেষ হিসাব আর রোদ লেগে উদ্ভাসিত হয়ে থাকা দালানটার দূরত্ব মাপল। মাপটা দ্রুত একটা নোটপ্যাডে লিখে নিল ও। মুখে ঘামের ফোঁটাগুলো খুদে স্রোতে পরিণত হচ্ছে।

পানির খোঁজে যায়নি আলাল। মুখে বোকা বোকা হাসির একটা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে তাঁবুগুলোর আশপাশে ঘুর ঘুর করছে সে, ধরে নিয়েছে আমেরিকানরা তাকে আর ডাকবে না, বিল্লালকে দিয়ে নিজেদের কাজ করিয়ে নেবে। ঘুর ঘুর করার কারণ একটা রশি খুঁজছে সে। কিন্তু চারদিকে কোথাও কোন রশি নেই।

রশি না পেলে কী করবে সে? মিস্টার রানাকে ম্যাপ রুম থেকে বের তো করতে হবে। কিন্তু কীভাবে?

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল আলাল। একজোড়া তাঁবুর মাঝখানে ঢাকনি সহ বেতের কয়েকটা ঝুড়ি দেখতে পেয়েছে, ঢাকনি বা ডালাগুলো খোলা।

রশি যখন নেই, ভাবল আলাল, ঠেকার কাজ অন্য কোনভাবে চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

প্রথমে নিশ্চিত হয়ে নিল তার দিকে তাকিয়ে নেই কেউ, তারপর ঝুড়িগুলোর দিকে এগোল।

দু'হাতে ধরে চাড় দিয়ে লাঠিটা মাঝখান থেকে ভেঙে ফেলল রানা, হেডপিসটা ভরে রাখল আলখেল্লার পকেটে। কাঠের টুকরো

দুটো ম্যাপ রুমের শেষ প্রান্তে, এক কোণে রেখে এল ও। তারপর সরে এসে দাঁড়াল গর্তটার সরাসরি নীচে। মুখ তুলে উপরে তাকাতে উজ্জ্বল আকাশ দেখতে পেল। নীল উজ্জ্বলতা মুহূর্তের জন্য অন্ধ করে দিল ওকে।

'আলাল,' ডাকল রানা, খুব আস্তে নয়, আবার চিৎকারও করছে না।

কোন সাড়া নেই।

'আলাল।'

সাড়া নেই।

উপরে ওঠার বিকল্প কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখার জন্য ম্যাপ রুমের চারদিকে চোখ বুলাল রানা। যতদূর দেখতে পাচ্ছে, কোথাও কিছু পড়ে নেই। আলালটা গেল কোথায়?

'আলাল!'

নীরবতা অটুট।

মুখ তুলে গর্তের মুখটা দেখছে রানা। কর্কশ আলোয় চোখ মিট মিট করছে। অপেক্ষায় আছে।

হঠাৎ কিছু একটা নড়ল উপরে। তারপর গর্তের মুখ থেকে কিছু একটা খসে পড়তে শুরু করল। প্রথমে ভাবল, রশিটা। কিন্তু না, তা নয়। রশির বদলে কাপড়চোপড় নামতে দেখছে ও, একটার সঙ্গে আরেকটা বাঁধা–শার্ট, প্যান্ট, টিউনিক, আলখেল্লা, চাদর ইত্যাদি।

কাপড় বেঁধে তৈরি করা রশিটা ধরে টান দিল রানা, তারপর দ্রুত উপরে উঠতে শুরু করল।

শরীরটাকে তুলে আনল গর্ত থেকে, বালিতে পেট দিয়ে শুয়ে হাঁপাচ্ছে। ব্যস্ত হাতে কাপড়ের রশিটা টেনে নিল আলাল, তারপর সব এক করে ফেলে দিল খালি একটা ড্রামের ভিতর।

সিধে হলো রানা, আলালের পিছু নিয়ে একজোড়া তাঁবুর

মাঝখানে চলে এল। এসেই মরমন লোকটার সামনে পড়ে গেল।

ধৈর্য হারিয়ে, উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করছিল লোকটা। 'তুমি!' খেপে উঠে দাঁতে দাঁত পিষল সে। 'এখনও তোমার পানি আনার অপেক্ষায় আছি আমি!'

ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত দুটো মেলল আলাল। 'হুজুর আমার ছেলে বলল সে-ই পানি দেবে...'

মরমন লোকটা রানার দিকে ফিরল। 'তুমি শালা আরেক কুঁড়ের বাদশা। খুঁড়তে যাওনি কেন, অ্যাঁ?'

'যাচ্ছিলামই তো!' বলে আরেকদিকে ঘুরে গেল রানা, দ্রুত পা চালিয়ে স্থান ত্যাগ করছে।

আলালকে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হলো।

দ্রুত হেঁটে একটা বাঁক ঘুরল রানা, বাতাস লাগায় পরনের সাদা আলখেল্লা উড়ছে পিছনদিকে। কান খাড়া হয়ে আছে, সন্দেহবশত আশপাশের আমেরিকানরা হয়তো পিছন থেকে গর্জে উঠবে–থামো!

তাঁবুগুলোর সামনে দিয়ে হাঁটছে রানা। কেউ ডাকল না বা বাধা দিল না। মনটা অস্থির হয়ে আছে আত্মাদের কুয়া খোঁড়ার জন্য। কোন রকমে এখন শুধু ট্রাকটার কাছে ফিরতে পারলে হয়।

হঠাৎ দু'জন সশস্ত্র মার্সেনারি উদয় হলো সামনে। সেরেছে, ভাবল রানা। পথ আগলে দাঁড়িয়ে পড়ল গার্ড দু'জন। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, একজন সিগারেট সাধছে আরেকজনকে।

যেমন হাঁটছিল তেমনি হাঁটছে রানা, এত কাছে পৌঁছে দিক বদলে উল্টোদিকে যাওয়াটা ওদের চোখে লাগবে। তবে লোক দু'জন সরে না দাঁড়ালে এগোনো সম্ভব নয়, সরু পথটুকুর সবটাই তাদের দখলে।

কিন্তু নিজেদের গল্পে এতই মশগুল তারা, রানার দিকে তাকালও না, পথও ছাড়ল না।

একেবারে শেষ মুহূর্তে, মরিয়া হয়ে, একটা তাঁবুর ফ্ল্যাপ তুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা। অন্তত কয়েক মিনিট এখানে অপেক্ষা করে দেখা যাক। লোক দু'জন সারাদিন ওখানে দাঁড়িয়ে গল্প করবে না।

এখন তাঁবুর ভিতর কেউ না ঢুকলেই হয়।

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল রানা, ভেজা তালু ঘষল আলখেল্লায়। ম্যাপ রুমের কথা ভাবছে ও। মহাকালে ঝুলে থাকার একটা অনুভূতি হয়েছিল ওর, যেন অনন্ত কাল ভেসে আছে, যেখানে সময়ের কোন অস্তিত্ব নেই, ও যেন ইতিহাসের কৌটায় আটকা পড়া একটা বস্তু—সুরক্ষিত, নিখুঁত, অবিচ্ছিন্ন।

তানিস শহরের ম্যাপ রুম। এ যেন এক অর্থে আবিষ্কার করা যে রূপকথার এক ধরনের বাস্তব ভিত্তি আছে। প্রচলিত কিংবদন্তির ভিতরে সত্যতা খুঁজে পাওয়ার মত।

যাই হোক, আত্মাদের কুয়া এখন ওর নাগালের মধ্যে। আর্কটাও কি?

আলখেল্লার প্রান্ত দিয়ে আবার কপালের ঘাম মুছল রানা। সরু ফাঁক দিয়ে তাঁবুর বাইরে তাকাল। এখনও লোক দু'জন গল্প করছে আর ধোঁয়া গিলছে। আশ্চর্য, যাচ্ছে না কেন!

তাঁবুর পিছন দিয়ে বেরুনো যায় কিনা ভাবছে রানা। আবছা অন্ধকারে ঘুরে সেদিকে এগোতে যাবে, হঠাৎ আওয়াজ শুনে বুকের ভিতর ছোট্ট একটা লাফ দিল হৃৎপিণ্ড।

চাপা একটা গোঙানি! তারমানে তাঁবুর ভিতর কেউ আছে। আবছা আলোয় চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করল রানা। প্রথমে মনে হয়েছিল খালি, কোথাও কিছু নেই, এখন দেখা যাচ্ছে একটা চেয়ারে কে যেন বসে রয়েছে। অবিশ্বাসে, উল্লাসে মুহূর্তের জন্য দিশেহারা বোধ করল রানা।

চেয়ারের সঙ্গে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে, মুখের

ভিতর রুমাল গোঁজা। শুধু চোখ দিয়ে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে সে! মেঝেটুকু দ্রুত পার হয়ে এল রানা, ফাহিমার মুখ থেকে বের করে নিল রুমালটা।

কথা বলার সুযোগ পেলেও, শব্দগুলো ফাহিমার মুখে বেধে যাচ্ছে। 'ওদের ঝুড়ি ছিল দুটো...আপনাকে বিভ্রান্ত করার জন্য, মাসুদ ভাই। আপনি যখন ভাবলেন আমি ট্রাকে, আসলে আমি তখন একটা কারে...'

'তুমি বেঁচে আছ...কী ভালো যে লাগছে!' ফাহিমার মত রানাও ফিসফিস করছে, তবে এর বেশি কিছু বলতে পারল না। প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাইল, 'ওরা তোমাকে টরচার করেছে?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মাথা নাড়ল ফাহিমা। 'আপনার কথা জানতে চেয়েছে। আপনি কতটুকু কী জানেন না জানেন। ওরা নয়, আপনি টরচার করছেন।'

'মানে?' খাদে নামানো কণ্ঠস্বর, কোন রকমে শোনা গেল।

'শুধু কথাই বলছেন, আমার বাঁধনগুলো খুলে দিচ্ছেন না।'

ফাহিমার চোখ-মুখ দেখে রানার মনে হলো কী একটা অনিশ্চয়তা বা দ্বিধায় ভুগছে সে। তবে তাকে জীবিত ফিরে পেয়ে এত খুশি হয়েছে যে ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাল না।

'মাসুদ ভাই, প্লিজ, এখান থেকে তাড়াতাড়ি বের করুন আমাকে। ওই লোক মহা শয়তান...'

'কে...কার কথা বলছ?'

'আব্বুর খুনি, ফ্রেঞ্চ আর্কিওলজিস্ট–ভিতেরা।'

ফাহিমার বাঁধন খুলতে যাচ্ছিল রানা, হঠাৎ হাত দুটো স্থির হয়ে গেল।

'কী হলো?' জানতে চাইল ফাহিমা।

'আমার ওপর বিশ্বাস রাখো, ফাহিমা। ভেবো না তোমাকে আমি বিপদের মধ্যে ফেলে যাচ্ছি। আপাতত এই জায়গাটাই

তোমার জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ।'

'কী বলছেন এ-সব! মাথামুণ্ডু কিছুই তো বুঝছি না! মাসুদ ভাই, রশির গিঁটগুলো খুলে দিন!' চাপাকণ্ঠে হিস-হিস করে বলল ফাহিমা, চোখ জোড়া অবিশ্বাসে আর ভয়ে বড় বড় হয়ে উঠছে।

'ভেবে দেখো তোমাকে মুক্ত করলে কী ঘটবে,' যুক্তি দেখিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করল রানা। 'তোমার খোঁজে এলাকার প্রতিটি বালি উল্টে দেখবে ওরা। অর্থাৎ তোমাকে কোথাও লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু আপাতত এখানে সবচেয়ে নিরাপদে থাকবে তুমি। তা ছাড়া, এখন যখন আমি জানি আর্কটা কোথায় আছে, ওদের আগে সেটা সংগ্রহ করাটা জরুরি। কথা দিচ্ছি, কাজটা শেষ করেই ফিরে আসব আমি।'

'মাসুদ ভাই, না!'

'আর মাত্র কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে বসে থাকো...'

'না! খুলুন আমাকে!'

রুমাল দিয়ে ফাহিমার মুখটা আবার বাঁধল রানা। তার ধস্তাধস্তি আর চাপা গোঙানি অগ্রাহ্য করে সিধে হয়ে দাঁড়াল। 'ধৈর্য ধরো। ফিরে আসছি।'

সরে এসে সরু ফাঁক দিয়ে তাঁবুর বাইরেটা দেখল রানা। লোক দু'জন চলে গেছে। ফ্ল্যাপ তুলে বেরিয়ে পড়ল ও। মাথার উপর সূর্য এখন আরও গরম।

বেঁচে আছে, ভাবল রানা। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে ফাহিমা বেঁচে আছে। দ্রুত পা চালিয়ে তাঁবুর সারিগুলোকে পিছনে ফেলে এল ও। তারপর একে একে পিছিয়ে পড়ল বিশাল গর্তগুলোও।

জ্বলন্ত বালিয়াড়িতে ফিরে এসেছে রানা। এখানেই রিয়াদ আর খনকদের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা ওর।

রিয়াদের ট্রাক থেকে সার্ভেয়ার'স ইন্সট্রুমেন্ট নামিয়ে বালিয়াড়িতে

খাড়া করল রানা। দূরের ম্যাপ রুমকে বিন্দু ধরে একটা সমরেখা তৈরি করল, আগে করে রাখা অঙ্কের সঙ্গে মেলাতেই একটা পজিশন পাওয়া গেল—কয়েক মাইল দূরের মরুতে, যে বালির উপর বহুকাল কারও পা পড়েনি। ভুল হিসাবের শিকার হয়ে আত্মাদের কুয়া পাওয়ার আশায় ভিতেরা যেখানটায় খুঁজছে, রানার পজিশন সেখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে। ওটাই, ভাবল রানা। সঠিক জায়গা!

'পেয়েছি!' বলল রানা, ইন্সট্রুমেন্ট ভাঁজ করে ট্রাকের পিছনে রেখে দিল। পজিশনটা ভিতেরার কাছাকাছি হলেও, ঢেউ খেলানো বালিয়াড়ি দিয়ে আড়াল করা। কারও চোখে ধরা না পড়ে খোঁড়ার কাজ চালানো যাবে।

ট্রাকটায় চড়ছে রানা, দূর বালিয়াড়ির মাথায় একজোড়া মূর্তিকে দেখা গেল। বাতাসে আলখেল্লা উড়ছে, বালিয়াড়ির ঢাল বেয়ে ছুটতে শুরু করল, ওদের উদ্দেশে হাত নাড়ছে। আলাল আর বিল্লালকে চিনতে অসুবিধে হলো না।

'ভাবছিলাম তোমরা বোধহয় আর এলে না,' কাছে আসতে ওদেরকে বলল রানা।

'শালারা আমাদেরকে চাকরের মত খাটিয়ে নিয়েছে, সার।' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল আলাল, ছেলের পিছু নিয়ে উঠে বসল ট্রাকে।

'ছাড়ো, হে,' ড্রাইভার রিয়াদকে নির্দেশ দিল রানা।

চারদিকে শুধু বালিয়াড়ির ঢেউ দেখা যাচ্ছে। পজিশনে পৌঁছে গেছে ওরা। ট্রাক থামিয়ে নেমে পড়ল সবাই। নিঃস্ব, অনুর্বর, ফাঁকা একটা জায়গা, অথচ এখানেই নাকি আর্ক-এর মত রোমাঞ্চকর একটা জিনিস পাওয়া যাবে।

মাথার উপর সূর্য আগুন ঝরাচ্ছে, রোদ যেন বিস্ফোরিত হলুদ

গোলাপ।

রানার হিসাব কষে বের করা নির্দিষ্ট স্পটে পৌঁছাল ওরা। কয়েক মুহূর্ত ওখানে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকল ও–শুকনো বালি ছাড়া দেখার কিছু নেই। এখানে কখনও কিছু গজাবে বলে স্বপ্ন দেখাও উচিত নয়। এই বালির নীচে কিছু থাকতে পারে, বিশ্বাস করা কঠিন।

ট্রাকের কাছে ফিরে এসে একটা কোদাল নিল রানা। খনকরা এরইমধ্যে স্পট লক্ষ্য করে রওনা হয়ে গেছে। তাদের মুখ যেন চামড়া দিয়ে মোড়া, পুড়ে কালো হয়ে গেছে। রানার মনে হলো এই জায়গায় চল্লিশ বছরের বেশি বোধহয় কেউ বাঁচে না।

হাতে একটা কোদাল নিয়ে ওর দু'পাশে হাঁটছে আলাল আর বিল্লাল।

'ভিতেরা যদি বুঝতে পারে ভুল জায়গায় খুঁড়ছে সে, তা হলে এদিকে চলেও আসতে পারে।' মাথা চুলকে বলল আলাল।

'তার আগেই কাজ সেরে কেটে পড়তে হবে আমাদের,' বলল রানা। 'তবে সব সময় চোখ-কান খোলা রাখো।'

হাসল আলাল। চারদিকে চোখ বুলাল সে। মাইলের পর মাইল বালিয়াড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার বলল, 'আমরা তো সরকারের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে বেআইনীভাবে খুঁড়ছি। কিন্তু ওরা সরকার, কয়েকটা মন্ত্রণালয় আর ঈজিপশিয়ান আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের অনুমতি নিয়ে কাজ করছে। নতুন কোনও জায়গা খুঁড়তে হলে নতুন অনুমতি লাগবে। তাতে সময় দরকার। চলুন, কাজটা সেরে ফেলি আমরা।'

শুরু হলো খনন। দেখতে দেখতে বালির স্তূপ উঁচু হয়ে উঠল। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য থামছে না কেউ, থামছে শুধু পানি খাওয়ার জন্য–উটের চামড়া দিয়ে বানানো ব্যাগের ভিতর এরইমধ্যে গরম

হয়ে উঠেছে পানি।

হঠাৎ পাঁচ-সাতজন লোককে নিয়ে আবার হাজির হলো মিরান আর নিশা। এবার তারা টগবগে কয়েকটা ঘোড়ায় চড়ে এসেছে।

কিছু জিজ্ঞেস করতে হলো না, এভাবে আকস্মিক আগমনের কারণটা নিজেরাই তারা ব্যাখ্যা করল। 'মাসুদ ভাই, মাটি খোঁড়ার কাজে আমরা আপনাদেরকে সাহায্য করতে এসেছি,' বলে হাসল মিরান।

ওদের আচরণ দেখে রানার অবশ্য মনে হলো, কথাটা বোধহয় পুরোপুরি ঠিক নয়–ওদের অন্য কোন উদ্দেশ্যও থাকতে পারে।

আকাশে যতক্ষণ আলো থাকল ততক্ষণ খুঁড়ল ওরা। সূর্য ডোবার পরেও অনেকক্ষণ একই রকম উত্তাপ ছড়াল বালি।

চোদ্দ

নিজের তাঁবুতে বসে রয়েছে ভিতেরা, টেবিলে আঙুলের ডগা নাচাচ্ছে। টেবিলের উপর কয়েকটা ম্যাপ, আর্ক-এর ড্রইং, নিজের অঙ্ক আর হিসাব কষা কাগজ-পত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। তার চোখে-মুখে হতাশার ম্লান ছায়া বাসা বেঁধেছে। এই মুহূর্তে সপ্তমে চড়ে আছে মেজাজ, মেজর ময়নিহানের উপস্থিতিতে অত্যন্ত নার্ভাসও বটে। মেজরের চেয়ে তার সহকারী গোয়েন লোকটা আরও বেশি বিরক্ত করছে তাকে।

চেয়ার ছাড়ল ভিতেরা। ওয়াশবেসিনের সামনে চলে এসে

চোখে মুখে পানি ছিটাল।

'নষ্ট একটা দিন,' বলল গোয়েন। 'স্রেফ ফালতু কাজে পার করে দিলাম।'

একই সুরে মেজর ময়নিহানও বলল, 'আমার লোকজন সারাটা দিন খুঁড়ল–কী জন্যে? আমাকে বলুন, কী জন্যে?'

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছছে ভিতেরা। দুই মরমনকে দেখছে সে। তারপর নিজের চেয়ারে ফিরে এসে চুমুক দিল ঠাণ্ডা বিয়ারের গ্লাসে।

'যে-সব তথ্য পেয়েছি সেগুলো যদি নির্ভুল হয় তা হলে আমার ক্যালকুলেশনও নির্ভুল। তবে আর্কিওলজি শুধু গাণিতিক বিজ্ঞান নয়, মেজর ময়নিহান। এই ব্যাপারটা আপনারা বোঝেন বলে মনে হচ্ছে না।'

'ও, আচ্ছা–আর্কিওলজি তা হলে কী?' জানতে চাইল মেজর ময়নিহান।

'আরও অনেক কিছু–যেমন, জ্যামিতিক বিজ্ঞানও বটে। আর্কটা হয়তো পাশের কোন চেম্বারে পাওয়া যাবে। আবার এমনও হতে পারে যে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ একটা তথ্য আমরা জানতে পারিনি।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিয়ারের গ্লাসটা খালি করল ভিতেরা।

'মিসৌরি থেকে বারবার প্রগ্রেস রিপোর্ট জানতে চাওয়া হচ্ছে,' বলল মেজর ময়নিহান। 'আপনাকে আগেও বলেছি, ব্যাকুল হয়ে আছেন মরমন প্রিস্টরা।'

'আপনি বরং স্মরণ করুন, মেজর ময়নিহান, আমি কিন্তু কাউকে কোন প্রতিশ্রুতি দিইনি। শুধু বলেছিলাম, সব দিক বিবেচনা করে দেখলে, আর্কটা খুঁজে পাবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। কী, মনে পড়ে?'

তাঁবুর ভিতর নীরবতা নেমে এল। হ্যাজাক লাইটের সামনে

দিয়ে হেঁটে গেল গোয়েন, তার ছায়াটাকে রীতিমত রোমহর্ষক বলে মনে হলো ভিতেরার। গোয়েন বলল, 'মেয়েটা আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে। আসল হেডপিসটা বছরের পর বছর তার কাছেই তো ছিল।'

'তা ঠিক,' বলল মেজর ময়নিহান।

'চেষ্টা করে দেখা উচিত না?' জিজ্ঞেস করল গোয়েন।

ভিতেরা ভাবছে, মেয়েটার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে, তাকে ভয় দেখালে আমি অস্থির হয়ে পড়ি কেন? ইন্টারোগেট করে বোঝা গেছে, দেওয়ার মত কোন তথ্য মেয়েটি জানে না। আচ্ছা, তার প্রতি আমি কি দুর্বল হয়ে পড়ছি? নিজেকে তিরস্কার করল সে। কঠিন হলো। প্রফেশনালদের দুর্বল হয়ে পড়া সাজে না।

'মঁশিয়ে ভিতেরা, আপনি যদি কোন সিদ্ধান্তে আসতে না পারেন, কী করতে হবে আমরাই ঠিক করব। সে সত্যি কিছু জানে কিনা দেখা দরকার। ব্যাপারটা মেজর আব্রাহামের ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত। তিনি মানুষকে কথা বলাতে জানেন।'

ভিতেরা চুপ করে থাকল।

তাঁবুর ফ্ল্যাপের কাছে চলে এল মেজর ময়নিহান, তারপর আব্রাহামের নাম ধরে ডাকল। একটু পরেই ভিতরে ঢুকল আব্রাহাম। চোখে অত্যন্ত মোটা কাঁচের চশমা, হাতের তালুতে পোড়া দাগ–হেডপিসের অবিকল প্রতিচ্ছবি।

'ওই মেয়েটা,' বলল ময়নিহান। 'তুমি তো তাকে চেনোই, আব্রাহাম।'

আব্রাহাম জবাব দিল, 'তার সঙ্গে আমার পুরানো একটা লেনদেন আছে।'

'কিন্তু সব দাগ মোছে না,' বিড়বিড় করে মন্তব্য করল ভিতেরা। তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'এটা আমার শো, কাজেই তাকে নিয়ে কী করা হবে সেটা আমি ঠিক করব। প্রসঙ্গটা যখন

উঠলই, বলে রাখি–মেয়েটার ওপর আমার বিশেষ দুর্বলতা জন্মেছে।'

মরু সন্ধ্যায় দিগন্তের কাছে ম্লান চাঁদ উঠল, নিজে থেমে খনকদেরও খুঁড়তে নিষেধ করল রানা। ইতিমধ্যে মশাল জ্বালা হয়েছে।

খানিক পর চাঁদটা মেঘে ঢাকা পড়ে গেল। তারপর অন্ধকার আকাশ চিরে ছুটোছুটি শুরু করল চমকে ওঠা বিদ্যুৎ–দ্বিধাবিভক্ত সাপের জিভের মত। কড়-কড়-কড়াৎ শব্দে ঘন ঘন শুধু বজ্রপাতই হচ্ছে, এখনও বৃষ্টির কোন দেখা নেই।

মাটি খুঁড়তে সাহায্য করতে এসেছি বললেও, বাস্তবে দেখা গেল ইসরায়েলিদের মধ্যে মাত্র দু'তিনজন হাত লাগিয়েছে কাজটায়, বাকি সবাই যেন কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। ব্যাপারটা লক্ষ করে খুশিই হলো রানা। ও জানে কেন ওরা এসেছে।

খনকরা যে গর্তটা খুঁড়ছে তার তলায় পাথরের অত্যন্ত ভারী একটা দরজা পাওয়া গেছে। বিস্ময় আর উল্লাসে প্রথমে কেউ কোন কথাই বলতে পারেনি। তারপর ট্রাক থেকে নানা রকম যন্ত্রপাতি এনে খনকরা বহু কষ্টে সেই পাথুরে দরজা খুলে ফেলে।

দরজার কবাট টেনে পিছিয়ে আনা হয়েছে। দরজার নীচে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বার: 'আত্মাদের কুয়া'। প্রায় ত্রিশ ফুট গভীর। আকারে বেশ বড় চেম্বারটা, দেয়ালে নানা রকম সাংকেতিক চিহ্ন আর নকশা–কিছু নকশা আঁকা, কিছু খোদাই করা। কামরার ছাদটাকে জায়গামত ধরে রেখেছে প্রকাণ্ড আকারের বেশ কয়েকটা স্ট্যাচু–চেম্বারের অভিভাবক ওগুলো। আশ্চর্য একটা স্থাপত্য, সন্দেহ নেই; মশালের আলোতে তন্দ্রাবিহীন একটা অনুভূতি হলো; অতল একটা গহ্বর, ইতিহাস

যেখানে নিজেই আটকা পড়ে আছে। নীচটা ভালো করে দেখার জন্য মশালগুলো এদিক ওদিক সরাচ্ছে ওরা।

চেম্বারের দূর প্রান্ত দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে এল, তবে আবছা অন্ধকারে ঢাকা। ওদিকে পাথরের একটা বেদি আছে, বেদির উপর রয়েছে পাথরের একটা চেস্ট ; মেঝেটা চকচকে, গাঢ় রঙের কার্পেটে ঢাকা।

'আর্কটা বোধহয় ওই চেস্টে আছে,' বলল রানা। 'মেঝেতে ওটা কী ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ইতিমধ্যে মাথার উপর উড়ে এসেছে জলভরা বিশাল কালো মেঘ। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে উঠল। রানার মনে পড়ে গেল ইমাম সাহেব কী বলেছেন। আর্কটাকে ডিসটার্ব করা হলে প্রকৃতির শক্তিকে কি চ্যালেঞ্জ করা হয়? কে জানে!

আর্কের অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে পরে মাথা ঘামালেও চলবে, তার আগে বিদ্যুতের ঝলকানি যে উৎকট সমস্যাটাকে চোখের সামনে মেলে ধরেছে সেটার সমাধান হওয়া দরকার।

মেঝেতে কার্পেট নয়! চিনতে পেরে এমন চমকে উঠল, হাত থেকে নীচে খসে পড়ল জ্বলন্ত মশাল। ভয় তো পেয়েইছে, গা-ও ঘিন ঘিন করছে ওর। একটা বা এক ডজন নয়, গর্তের মেঝেতে কয়েকশো কালো সাপ কিলবিল আর হিসহিস করছে।

আগুনের আঁচ সহ্য করতে না পেরে মশালের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সাপগুলো। ঈজিপশিয়ান অ্যাস্‌প ওগুলো, মিশরীয় কোবরা। অনবরত কুণ্ডলী পাকাচ্ছে আর খুলছে, ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করে জবাব দিচ্ছে নৃত্যরত কমলা রঙের শিখাগুলোকে। মশালের আলোয় মেঝেটাকে সচল মনে হলো–আসলে পুরোটা মেঝেই তো ঢাকা পড়ে আছে, সাপগুলো নড়াচড়া করায় ওরকম মনে হচ্ছে।

কী কারণে বলা মুশকিল, শুধু বেদিতে বা ওটার কাছাকাছি

'সাপ আমার দু'চোখের বিষ,' বিড়বিড় করল রানা।

'আর কিছু হতে পারল না?'

'অ্যাস্‌প,' বলল আলাল। 'সাংঘাতিক বিষাক্ত।'

'খবরটা শোনাবার জন্যে ধন্যবাদ, আলাল।'

'লক্ষ করেছেন, মিস্টার রানা, আগুনের কাছ থেকে দূরে সরে থাকছে ওগুলো?'

নিজেকে সামলাও, ভাবল রানা। আর্কটার এত কাছে এসে সাপের ভয়ে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। এক হাজার সাপ...তাতে কী? খনক আর তাদেও লিডার বিল্লালের দিকে ফিরে জোর করে হাসল ও। 'এটা কোন ব্যাপার নয়। সাপকে ভয় পাবার কী আছে আসলে সাপই মানুষকে ভয় পায়। শোনো, আরও অনেকগুলো মশাল দরকার আমার। আর তেল। কী চাইছি বুঝতে পারছ তো? ওখানে, নীচে, একটা ল্যান্ডিং স্ট্রিপ।'

খানিক পর কুয়ার ভিতর এক এক করে জ্বলন্ত মশাল ফেলা হলো। আগুনের আঁচ সহ্য করতে না পেরে সাপগুলো যেখানে ভিড় করেছে ওপর থেকে সেখানে কয়েক গ্যালন পেট্রল ঢালা হলো।

এরপর চওড়া কুয়ার ভিতর বড় আকারের একটা কাঠের কন্টেইনার নামাল খনকরা, প্রতিটি কোণে রশির তৈরি হাতল রাখা হয়েছে। সবশেষে গর্তের ভিতর ফেলে দেওয়া হলো মোটা আর লম্বা এক প্রস্থ রশি, দাস্তানা পরা হাত দিয়ে সেটা ধরে ঝুলে পড়ল রানা। এক মুহূর্ত পর ওকে অনুসরণ করল আলাল।

শিখার কিনারা থেকে একটু দূরেই মোচড় খাচ্ছে সাপগুলো, পিছলাচ্ছে, গাদাগাদি করে স্তূপে পরিণত হচ্ছে, এমনকী ডিম ভেঙে বেরিয়ে আসছে নতুন নতুন খুদে সাপও।

কিছুক্ষণ ঝুলে থাকল রানা, রশিটা এদিক-ওদিক দোল

খাচ্ছে। ওর ঠিক উপরেই ঝুলে রয়েছে আলাল।

তারপর আগুনের পাশে মেঝেতে পা রাখল রানা।

ফাহিমা দেখল ভিতেরা তাঁবুর ভিতর ঢুকছে। মেঝে ধরে হেঁটে এসে তার সামনে দাঁড়াল লোকটা, কথা না বলে এক দৃষ্টে দেখছে তাকে–মুখে গোঁজা রুমালটা সরাচ্ছে না, রশির বাঁধনগুলোও খুলে দিচ্ছে না।

ফাহিমা ভাবল, এই লোককে আমি আঙ্কেল বলতাম। আব্বুর বন্ধু, ছোটবেলায় এর কোলেও চড়েছি। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করত না সেই লোকই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করেছে আব্বুকে।

আব্বুকে মেরেও হয়নি, এখন আমার দিকে নোংরা দৃষ্টি ফেলছে। ছিহ্, নরকেও বোধহয় ঠাঁই হবে না এই লোকের।

হঠাৎ হাত বাড়াল ভিতেরা। ফাহিমার গালে আঙুল বুলাচ্ছে সে। মুখে রুমাল থাকা সত্ত্বেও গোঁঙাচ্ছে ফাহিমা, চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা শরীরটাকে অনবরত মোচড়াচ্ছে।

হাসল ভিতেরা। 'আরে, বোকা মেয়ে, অমন করছ কেন? আমি কি মারধর করছি তোমাকে? সেটা যদি করতে হয় তো আমেরিকানরা করবে–মেজর আব্রাহাম বা মেজর ময়নিহান। আমি তো তোমাকে আদর করছি।' আবার হাত বাড়াল সে।

ঝট করে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল ফাহিমা।

'তুমি ভারি সুন্দর, ডার্লিং হিমা,' ফিসফিস করে বলল ভিতেরা। 'তুমি রাজি থাকলে, এখনকার কাজ শেষ হওয়ার পর, তোমাকে নিয়ে মন্টিকার্লোয় দু'মাসের জন্যে বেড়াতে যেতে পারি আমি।'

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল ফাহিমা। ভয়ে আর আশঙ্কায় বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করছে তার। কারণ হলো, তার মুখ,

হাত আর পায়ের বাঁধনগুলো এক এক করে খুলে দিচ্ছে ভিতেরা। না জানি কী ঘটে এরপর।

তবে না, মুখে নোংরা হাত বুলানো ছাড়া আর কিছু করল না ফরাসী বেজন্মাটা। তবে নিচু গলায় বলল তাকে, 'ওরা তোমার ক্ষতি করতে চায়।'

অপেক্ষা করছে ফাহিমা। কে জানে আর কী শুনতে হয়।

'তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে ওদের কাছ থেকে খানিকটা সময় চেয়ে নিয়েছি আমি। তুমি খুব সুন্দর, তাই চাই না ওরা তোমার কোন ক্ষতি করুক। ওরা, ওই আমেরিকানরা, স্রেফ বর্বর। আল গারিব্ কারাগারে বন্দীদের নিয়ে কী করেছে জানোই তো!'

মুহূর্তের জন্য চোখ বুজল ফাহিমা। ঢোক গিলল। দরদর করে ঘামছে সে।

'কিছু একটা বলো তুমি, হিমা। যা শুনলে শান্ত হবে ওরা। গুরুত্বপূর্ণ কোন ইনফরমেশন।'

'কতবার বলব...আমি কিছু জানি না।' রক্ত চলাচল শুরু হওয়ায় হাত আর পা ব্যথা করছে ফাহিমার। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতে গিয়ে টলছে।

'মাসুদ রানা সম্পর্কে?'

'তাঁর সম্পর্কেও কিছু আমি জানি না,' বলল ফাহিমা। 'আপনাকে তো আগেই বলেছি, তিনি আমার উপকার করার চেয়ে ক্ষতিই বেশি করেছেন।' কী ক্ষতি করেছে তার দীর্ঘ একটা তালিকা দিয়েছে ফাহিমা, ভিতেরা যাতে বিশ্বাস করে রানা সম্পর্কে তার ধারণা ভালো নয়, গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য জানা থাকলে প্রকাশ করে দেবে।

'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি।' আবার হাত বাড়িয়ে ফাহিমার চিবুক স্পর্শ করল ভিতেরা. চোখ দুটো পরীক্ষা করছে।

'কিন্তু আমেরিকানদের সামলে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আপনি ওদের বোঝান।' প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা হলো ফাহিমার।

কাঁধ ঝাঁকাল ভিতেরা। 'তা হলে কিছু একটা জানাও আমাকে!'

তাঁবুর ফ্ল্যাপ খুলে গেল। ফাঁকটায় একটা মূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে। মেজর আব্রাহামকে চিনতে পারল ফাহিমা। তার পিছনে রয়েছে মেজর ময়নিহান আর ক্যাপটেন গোয়েন। ভয়টা এবার যেন ফাহিমার মাথার ভিতর আগুন জ্বেলে দিয়েছে।

ভিতেরা বলল, 'আমি দুঃখিত।'

ফাহিমা নড়ল না। সে শুধু বোকার মত আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে থাকল, মনে পড়ে গেছে আগুন খোঁচাবার গরম সিক দিয়ে তাকে পোড়াবার জন্য কেমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল লোকটা।

'ম্যাডাম,' বলল আব্রাহাম। 'নেপাল থেকে অনেক দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি আমরা, তাই না?'

পিছু হটল ফাহিমা, ভয়ে মাথা নাড়ছে।

তার দিকে এগিয়ে আসছে আব্রাহাম। দ্রুত একবার ভিতেরার দিকে তাকাল ফাহিমা, যেন শেষবারের মত আবেদন জানাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ভিতেরা।

তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ভিতেরা। ফাহিমাকে সত্যি পেতে চায় সে। তার ইচ্ছে হচ্ছে ভিতরে ঢুকে লম্পট আমেরিকানগুলোকে বাধা দেয়। ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে, এই সময় হঠাৎ তার নজর পড়ল দিগন্তে।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। অবিশ্বাস্য বা অদ্ভুত হলেও সত্যি, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মাত্র একটি জায়গায়—বারবার। কী ব্যাপার? এরকম

কেন হবে? নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল ভিতেরা, গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। তারপর ঘুরে দাঁড়াল সে, আবার ঢুকল ফাহিমার তাঁবুতে।

বেদির দিকে এগোচ্ছে রানা। অনবরত ফোঁস ফোঁস হিস হিস করছে সাপগুলো। মশালের তৈরি কিম্ভূতকিমাকার ভৌতিক ছায়াগুলোকে ওই আওয়াজ আরও ভীতিকর করে তুলছে। শব্দগুলো কানে না তোলার চেষ্টা করছে ও।

কন্টেইনার থেকে আরও তেল ছড়ানো হয়েছে মেঝেতে, তারপর আগুন জ্বেলে সাপগুলোর মাঝখানে তৈরি করা হয়েছে সরু একটা পথ। নতুন শিখাগুলো খাড়া হয়ে ওঠায় বিদ্যুৎ চমকের আলো এখন আর আগের মত তীব্র লাগছে না।

রানার ঠিক পিছনেই রয়েছে আলাল। দু'জন মিলে চেস্টের পাথুরে ডালাটার সঙ্গে একরকম যুদ্ধ শুরু করল ওরা।

এক সময় ঢিলে করা গেল ওটাকে। ভিতরে কল্পনারও অতীত সৌন্দর্য নিয়ে পড়ে আছে আর্কটা।

কিছুক্ষণ নড়তে পারল না রানা। ঢাকনির উপর সোনার তৈরি দেবদূতরা পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে আছে। ঢাকনিটা অ্যাকেইশা গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি, তবে প্রায় সবটুকুই সোনার পাত দিয়ে মোড়া। জিনিসটা অলঙ্কৃত একটা ভারী সিন্দুকের মত–তবে আকৃতিটা চওড়া কফিনের সঙ্গে মেলে। চার কোণে চারটে সোনার রিঙ বা বালা দেখা যাচ্ছে, মশালের আলোয় চক চক করছে ওগুলো।

আলালের দিকে তাকাল রানা। আর্কটাকে অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে দেখছে সে। রানার প্রচণ্ড ইচ্ছে হলো হাত বাড়িয়ে প্রাচীন আর্টিফ্যাক্টটাকে ছুঁয়ে একবার দেখে। তবে শেষ মুহূর্তে দমন করল নিজেকে।

কাঠের কন্টেইনারটার দিকে ঘুরে গেল ওরা। ওটার চার কোণে চারটে পোল রয়েছে, সেগুলো খুলে নিয়ে আর্কের রিঙ চারটের ভিতর গলিয়ে দিল। তারপর পাথুরে চেস্ট থেকে ভারী আর্কটাকে তুলে নিয়ে বসিয়ে দিল কন্টেইনারে।

আগুন ইতিমধ্যে নিভে যেতে শুরু করেছে। সাহস ফিরে পেয়ে আগের চেয়ে বেশি মোচড় খাচ্ছে সাপগুলো, ফণা তুলছে ঘন ঘন। ধীরে ধীরে বেদির দিকে এগোচ্ছে ওগুলো।

'জলদি, আলাল, জলদি!' তাগাদা দিল রানা।

কন্টেইনারটা কয়েকটা রশি দিয়ে বাঁধল ওরা। একটা রশি ধরে টান দিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে টেনে চেম্বার থেকে তুলে নেওয়া হলো। আরেকটা রশি ধরে দ্রুত উঠে যাচ্ছে আলাল। কুয়ার মাথার কাছে পৌঁছে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

আলালও অদৃশ্য হলো, সঙ্গে উপর থেকে ভেসে এল তুমল হই-হট্টগোল আর গোলাগুলির আওয়াজ। ইজরায়েলি উজি সাব মেশিনগানের শব্দ পরিষ্কার চিনতে পারল রানা, ভাবল, ওর ধারণাই তা হলে ঠিক–মোসাদ এজেন্টরা আসলে মুসা নবীর আর্কটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এসেছে। তারা জানত, ওটা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হতে পারে। হচ্ছেও তাই।

এখন দেখার বিষয় কোন্ দল জিতবে।

একটা তাগাদা অনুভব করল রানা, মোসাদকে ওর সাহায্য করা দরকার।

আর মাত্র একটা রশি ঝুলে আছে। হাত বাড়িয়ে সেটা ধরল রানা। টেনে পরীক্ষা করল, ওর ভার সইতে পারবে কিনা।

কুয়ার মাথার দিক থেকে হড় হড় করে নেমে এল রশিটা, ঠিক একটা সাপের মত।

'কী ব্যাপার?' রানা খেয়াল করল, গোলাগুলির আওয়াজ ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে।

কুয়ার মাথা থেকে ফ্রেঞ্চ আর্কিওলজিস্ট ভিতেরার সকৌতুক কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'তুমিই বলো ব্যাপারটা কী, মিস্টার রানা। এরকম একটা বিচ্ছিরি জায়গায় কী করছ তুমি?'

পরমুহূর্তে বেশ কয়েকজন লোক একসঙ্গে হেসে উঠল।

তারপর আবার ভিতেরার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ইজরায়েলিরা তোমাকে উদ্ধার করবে, এরকম কিছু আশা করে থাকলে ভুলে যাও, রানা। তুমি তো জানোই যে আমার সঙ্গে সশস্ত্র মার্সেনারি আছে। তাদের হাতে বেশ কয়েকজন ইজরায়েলি মারা পড়েছে। এই মুহূর্তে মোসাদ এজেন্টদের ধাওয়া করে খেদিয়ে দিচ্ছে তারা। এরকম একটা দুঃসংবাদ দেয়ার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত, হে।'

'এটা দেখছি তোমার একটা বাজে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, ভিতেরা,' বলল রানা।

হিসহিস শব্দ করে কাছে চলে আসছে কালো সাপগুলো। মেঝেতে তাদের ঘষা খাওয়ার খসখস আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রানা।

'বাজে অভ্যাস, তোমার সঙ্গে আমি একমত,' বলল ভিতেরা, উঁকি দিয়ে নীচে তাকিয়ে আছে। 'দুঃখজনক হলো, তোমাকে আর আমার দরকার নেই। কে কখন কী কাজে লেগে যায়, তাই অনেক সময় বাগে পেয়েও শত্রুকে আমি না মেরে বাঁচিয়ে রাখি।

'যেমন ডক্টর কাসেমিকে রেখেছিলাম, যেমন তোমাকেও রেখেছিলাম। তুমি ভেবেছিলে বাচ্চারা আহত হবে, তাই তোমাকে আমি গুলি করিনি। ভুল! তখন অবশ্য জানতাম না তুমি আমার কী কাজে লাগবে। যাই হোক, অন্তত একটা কথা ভেবে সান্ত্বনা পেতে পারো, মাসুদ রানা–শেষ পর্যন্ত তুমি নিজেই একটা অমূল্য আর্কিওলজিক্যাল অ্যার্টিফ্যাক্টে পরিণত হতে চলেছ।'

'তোমার কথা শুনে ঘোড়াও হাসবে,' বলল রানা। কুয়াটার

গায়ে চোখ বুলাচ্ছে ও, উপরে ওঠার আর কোন পথ আছে কিনা খুঁজছে।

এই সময় রানাকে চমকে দিয়ে শুরু হলো ব্যাপারটা। গর্তের কিনারা থেকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দেওয়া হচ্ছে ফাহিমাকে। কিছুই বুঝতে পারেনি সে-ও, হঠাৎ পতন শুরু হওয়ায় চিৎকার শুরু করেছে। দ্রুত স্থান বদল করল রানা, পতনের গতিটা কমাবার জন্য তার নামার পথে চলে এল। ওর গায়ে এসে পড়ল ফাহিমা, তাকে নিয়ে পিছলে মেঝেতে শুয়ে পড়ল ও।

সাপগুলো এগিয়ে এল ওদের দিকে। রানাকে আঁকড়ে ধরে আছে ফাহিমা।

ভিতেরার চিৎকার ভেসে আসছে উপর থেকে। শুনতে পাচ্ছে রানা।

'এতবার করে বললাম, মেয়েটাকে আমার চাই!'

'ভুল করছেন, মঁসিয়ে ভিতেরা। ওকে আর আমাদের দরকার নেই। এখন শুধু মিশন আর্কটারই গুরুত্ব।'

'হিমার জন্যে আমার একটা প্ল্যান ছিল!'

'আমাদের সঙ্গে আমেরিকায় চলুন, ওরকম অনেক হিমা পেয়ে যাবেন আপনি।'

এরপর নীরবতা নেমে এল উপরে। তারপর আবার ভিতেরাকে দেখা গেল, উঁকি দিয়ে চেম্বারের নীচে তাকাচ্ছে। ফাহিমাকে লক্ষ্য করে নিচু গলায় বলল সে, 'এটা কপালের লিখন।' তারপর রানার দিকে তাকাল সে। 'বিদায়, হে!'

অকস্মাৎ চেম্বারের পাথুরে দরজা টেনে এনে কুয়ার মুখটা আটকে দিল আমেরিকান মার্সেনারিরা। কুয়ার বাতাস ফুরিয়ে এলো। নিভে যাচ্ছে মশালগুলো। অন্ধকার পাওয়ায় সাপগুলো অনেকটা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করছে।

রানাকে এখন শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রেখেছে ফাহিমা। ধীরে

ধীরে নিজেকে ছাড়াল রানা। দু'হাত দিয়ে দুটো মশাল ধরল, এখনও জ্বলছে ওগুলো, একটা ধরিয়ে দিল ফাহিমার হাতে। 'কিছু নড়ছে দেখলেই আগুনটা সেদিকে নাড়বে।'

'চারদিকেই তো সাপ,' বলল ফাহিমা। 'গোটা মেঝে যে মোচড় খাচ্ছে।'

'থাক, ভয়ের কথা মনে করিয়ে দিয়ো না।' আলো-ছায়ার ভিতর হাতড়াতে শুরু করল রানা। ক্যানিস্টারটা পাওয়ার পর দেয়ালের গায়ে তেল ছিটিয়ে আগুন জ্বালল তাতে। তারপর উপরের স্ট্যাচুগুলোর একটার দিকে তাকাল, বুঝতে পারছে ধীরে ধীরে ওর আরও কাছে সরে আসছে সাপগুলো।

'কী করছেন আপনি, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল ফাহিমা।

নিজেদের চারদিকে বৃত্তাকারে তেল ঢালল রানা, তারপর তাতে আগুন দিল। 'এখান থেকে বেরুবে না।'

'কেন? কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

'একটু পরেই ফিরে আসছি। চোখ খোলা রাখো, আর দৌড়াবার জন্যে রেডি থাকো।'

'দৌড়াব? কোথায় দৌড়াব?'

রানা জবাব দিল না। শিখাগুলোকে এড়িয়ে পিছু হটছে ও, কামরার মাঝখানে ফিরে এল। কয়েকটা সাপ ওর গোড়ালিকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে, মরিয়া হয়ে হাতের মশালটা ঝাপটাতে সরে গেল ওগুলো। স্ট্যাচু ধরে উপরে উঠে গেল ওর দৃষ্টি, প্রায় সিলিঙের নাগাল পেয়ে গেছে ওটা।

আলখেল্লার ভিতর হাত গলাল রানা, কোমরে জড়ানো নাইলন রশির একটা কুণ্ডলী বের করল। আলো খুব কম, তারপরও স্ট্যাচুর মাথাটা দেখতে পাচ্ছে ও। লূপ বানিয়ে ছুঁড়ে দিতে রশির একটা প্রান্ত আটকে গেল স্ট্যাচুর গলায়। টেনে একবার দেখে নিল রানা, তারপর মশালটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রশি বেয়ে

উঠতে শুরু করল।

বেশ খানিকটা উপরে উঠে এসে ঘাড় বাঁকা করে নীচে, ফাহিমার দিকে তাকাল রানা। শিখাগুলোর নিভু-নিভু পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। নিঃসঙ্গ আর অসহায় দেখাচ্ছে তাকে।

আরেকটু উঠে স্ট্যাচুর মুখের কাছে চলে এসেছে রানা, হঠাৎ ওটার পিছন থেকে বেরিয়ে এসে ফণা তুলল একটা সাপ, লকলকে জিভ বের করে রানার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকল। হাতের মশালটা ওটার মাথায় ঠেকাল ও, মাংস পোড়ার গন্ধ পেল নাকে, মসৃণ পাথর থেকে খসে নীচে পড়তে দেখল ওটাকে।

নিজেকে একটা পজিশনে আনল রানা, দেয়াল আর স্ট্যাচুর মাঝখানে পা বাধিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু চেম্বারের দেয়াল বা সিলিং পরীক্ষা করার সুযোগ পাওয়া গেল না, কারণ ওর পিছু নিয়েছে সাপগুলো। স্ট্যাচু বেয়ে দ্রুত উঠে আসছে উপরে। নিভে আসা মশাল দিয়ে খুঁচিয়ে কতক্ষণ আর ফেলা যাবে ওগুলোকে।

এভাবে সাপ তাড়াতে গিয়েই হাত থেকে পিছলে পড়ে গেল মশালটা, পড়ার সময় নিভেও গেল। ঠিক যখন আলো দরকার, তখনই...এর বেশি কিছু ভাবতে পারল না রানা, অনুভব করল ওর হাতের উপর কী যেন নড়ছে।

আঁতকে উঠল রানা। ঝাঁকি খেল শরীরটা। আর তাতেই নড়ে গেল স্ট্যাচুর ভিত, কেঁপে উঠল ওটার গোটা শরীর, কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে। মূর্তিটাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরল ও, ওটা যেন একটা খচ্চর। পতনের গতি বাড়ল, পাশ কাটাল হতবিহ্বল ফাহিমাকে–নিস্তেজ আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। ভারী স্ট্যাচু নেমে এসে চেম্বারের মেঝে ভেঙে ফেলল, ভেঙে সেঁধিয়ে গেল আরও সামনের অন্ধকারে। তারপর হঠাৎ করেই থেমে গেল স্ট্যাচুর পতন, ভাঙা মূর্তি তলায় পৌঁছেছে।

পাশে ছিটকে পড়েছে রানা। আচ্ছন্ন বোধ করছে। অন্ধকারে হাতড়াল কিছুক্ষণ, তবে খেয়াল করল কুয়ার গায়ে এবড়োখেবড়ো একটা গর্ত থেকে সামান্য আলোর আভা আসছে। তারপর ফাহিমার ডাক শুনতে পেল।

'মাসুদ ভাই! কোথায় আপনি?'

গর্তের ভিতর হাত ঢুকিয়ে ফাহিমাকে ছুঁতে চেষ্টা করল রানা, ওই গর্তের কিনারা থেকেই উঁকি দিচ্ছে সে। 'ভুলেও কখনও কোন স্ট্যাচুর ঘাড়ে চেপো না,' বলল ও।

'যাক।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ফাহিমা।

হাত ধরে সদ্য তৈরি গর্তের ভিতর রানাকে নামতে সাহায্য করল ফাহিমা। হাতের মশালটা মাথার উপর উঁচু করে ধরেছে সে। আলো এখন খুব কম হলেও, দেখতে অসুবিধে হলো না যে কুয়ার নীচে একটা চেম্বারে রয়েছে ওরা। তবে চেম্বার এই একটাই নয়। একটার সঙ্গে আরেকটা জোড়া লাগানো, এদিক ওদিক এরকম আরও চেম্বার দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ কুয়ার মেঝের নীচে এটা একটা টানেলের সমষ্টি–একটা গোলক ধাঁধা।

'এটা কী? আমরা কোথায়?'

'কী করে বলি। হয়তো বিশেষ কোনও কারণে এরকম একটা গোলাকধাঁধার ওপর তৈরি করা হয়েছিল কুয়াটা। জানি না। তবে সুখবর হলো এখানে সাপ নেই।'

অন্ধকার থেকে ডানা ঝাপটে উড়ে এল এক ঝাঁক বাদুড়। মাথা নামিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি আরেক চেম্বারে চলে এল ওরা। মাথার উপর হাত ঝাপটে চিৎকার জুড়ে দিল ফাহিমা।

'এভাবে চেঁচিয়ো না তো, পালস রেট বেড়ে যাচ্ছে।'

'ভয় লাগছে ওগুলো আমার গাল আঁচড়ে দেবে!'

আরেক চেম্বারে চলে এল ওরা।

'বেরুবার নিশ্চয়ই কোন পথ আছে,' বলল রানা। 'অন্তত

বাদুড়গুলো সেই সঙ্কেতই দিচ্ছে। খাবারের খোঁজে রোজ বাইরের আকাশে বেরুতে হয় ওগুলোকে।'

আরেকটা চেম্বারে পা দিতেই উৎকট গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এল ওদের। হাতের মশালটা উঁচু করল ফাহিমা। চারদিকে মমি আর কঙ্কাল দেখা যাচ্ছে। অনেক মমির ব্যান্ডেজ খুলে গেছে, হলদেটে ব্যান্ডেজের বাইরে পচে শুকিয়ে যাওয়া মাংস ঝুলছে। আরেক দিকে দেখা গেল স্তূপ হয়ে আছে মানুষের হাড় আর খুলি। ওগুলোর চারপাশে ভিড় করে আছে একগাদা চকচকে পোকা।

'দুর্গন্ধটা পাগল করে দিচ্ছে!' নাক চেপে ধরে বলল ফাহিমা।

'অভিযোগ করছ?'

'মাসুদ ভাই, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ছি।'

হাত লম্বা করে সামনেটা দেখাল রানা। অনেকটা দূরে হলেও, সেদিকে তাকানো মাত্র উজ্জ্বল মরুভূমি আর রোদ দেখতে পেল ফাহিমা–টানেলের শেষ মাথায় নতুন একটা সকাল।

'আল্লাহকে ধন্যবাদ!'

'হ্যাঁ। যাকে খুশি ধন্যবাদ দাও,' বলল রানা। 'তবে মনে রেখো, সব ধন্যবাদ এখনই খরচ করে ফেলো না, হাতে কিছু রেখো। এখনও অনেক কিছুই বাকি।'

পনেরো

পরিত্যক্ত গর্তগুলোকে পাশ কাটিয়ে এয়ারস্ট্রিপের দিকে এগোচ্ছে ওরা। হঠাৎ একটা বালিয়াড়ির আড়াল থেকে দুই ঘোড়সওয়ারকে ছুটে আসতে দেখা গেল।

দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা, হাত ধরে ফাহিমাকে টেনে নিয়েছে নিজের পিছনে। অপর হাত পৌঁছে গেছে আলখেল্লার ভিতর, বেল্টে গোঁজা পিস্তলের বাঁট ধরল।

আলখেল্লা পরা দুই তরুণ। কাছাকাছি আসতে চেনা-চেনা লাগল রানার। তারপর তাদের একজন ওর চোখে চোখ রেখে হাসল। ওই হাসি দেখেই চিনে ফেলল রানা। তরুণ নয়, তরুণী, পুরুষের ছদ্মবেশ নিয়ে আছে। কাদিম নিশা আর আসহাদু মিরান।

ওদেরকে পাশ কাটাবার সময় মাথা ঝুঁকিয়ে সমীহ প্রকাশ করল মিরান। উত্তরে রানাও ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল।

খানিক পর পিছন ফিরে তাকাল রানা। দুশো গজ দূরে একটা পোলের পাশে ঘোড়া দুটো দাঁড় করিয়েছে ওরা। কাছেই হুড খোলা একটা জিপ দেখা যাচ্ছে। ঘোড়া থেকে নেমে জিপটায় চড়ছে মিরান আর নিশা।

ওদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়ে গেল রানার। আর্কটা উদ্ধার করতে পারলে মোসাদের হাতে তুলে দিতে রাজি হয়েছে ও।

আমেরিকান মরমনরা অনেক টাকা খরচ করে মরুভূমির উপর এয়ারস্ট্রিপ তৈরি করেছে। কাছাকাছি পৌঁছে স্ট্রিপের পাশে দুটো ফুয়েল ট্রাক, তাঁবুর ভিতর একটা সাপ্লাই ডিপো আর ওভারঅল পরা একজন মেকানিককে দেখল রানা।

মেকানিক লোকটা রানওয়ের কিনারায় কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে, মুখ তুলে সম্ভবত কোন চিলের ওড়া দেখছে। তারপর দেখা গেল স্ট্রিপের উপর দিয়ে আরেক লোক তার দিকে হেঁটে আসছে।

দ্বিতীয় লোকটাকে দেখেই চিনতে পারল ফাহিমা। এ হলো মেজর ময়নিহানের এইড, গোয়েন।

হঠাৎ করে আকাশ থেকে একটা গর্জন ভেসে এল। পরিত্যক্ত

গর্তের পাশে স্তূপ করা বালির আড়ালে রয়েছে রানা আর ফাহিমা মুখ তুলে আকাশে তাকাতেই দেখতে পেল প্রাচীন একটা অ্যান্টিক প্লেন ছুটে আসছে এদিকে।

'কী প্লেন ওটা?' অবাক হয়ে জানতে চাইল ফাহিমা।

'ফ্লাইং উইং,' বলল রানা। 'অ্যান্টিক প্লেনের প্রদর্শনী হচ্ছে কায়রোয়, সম্ভবত সেখান থেকে কোন ভাবে ম্যানেজ করেছে।'

মেকানিকের উদ্দেশে চেঁচাচ্ছে গোয়েন। 'জলদি তেল ভরো গুরুত্বপূর্ণ কার্গো নিতে আসছে ওটা, কাজেই রেডি করে রাখতে হবে।'

এয়ারস্ট্রিপে খানিকটা ছুটে, কয়েকটা লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ফ্লাইং উইং। অত্যন্ত নিচু প্লেন, টারম্যাক থেকে ককপিটের উচ্চতা খুবই কম।

'এই প্লেনে করেই আর্কটা নিয়ে যাবে ওরা,' বলল রানা।

'আমরা তা হলে কী করব, মাসুদ ভাই? নিশ্চয়ই হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাব না?'

'না। প্লেনে ওরা আর্ক যখন তুলবে, তার আগেই ওটায় উঠে বসব আমরা।'

ভুরু কোঁচকাল ফাহিমা। 'বেশি আশা করা হয়ে যাচ্ছে না?'

'এত দূর যখন এসেছি–চেষ্টা করে দেখি না' ক্রল করে সাবধানে এগোল ওরা, থামল সাপ্লাই তাঁবুর ঠিক পিছনে মেকানিক লোকটাকে এরই মধ্যে ফ্লাইং উইং-এর চাকার সামনে কাঠের ব্লক বা ঠেকো বসাতে দেখা গেল। তারপর ফুয়েল হোসটা টেনে এনে প্লেনে আটকাল সে। প্রপেলার এখনও ঘুরছে, ইঞ্জিনের গর্জনে কানের পরদা ফাটার উপক্রম।

চারদিকে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না, ফাহিমাকে নিয়ে স্ট্রিপের আরও কাছে চলে এল রানা। দু'জনের কেউ-ই দেখতে পেল না আরেক আমেরিকান মরমন, এ-ও মেকানিক, ওদের

পিছনে চলে এসেছে।

উঁচু করে ধরা একটা রেঞ্চ নিয়ে নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে আসছে সে, লক্ষ্যস্থির করেছে রানার খুলিতে। ফাহিমাকে পাশে নিয়ে এখনও ক্রল করছে ও।

নিজের সামনে লোকটার ছায়া দেখতে পেল ফাহিমা, সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠল সে। ঝট করে চিৎ হলো রানা, রেঞ্চটা সেই মুহূর্তে নামতে শুরু করেছে। হাত তুলে লোকটার কবজি ধরে ফেলল ও, সেই সঙ্গে পা ছুঁড়ল তার হাঁটু লক্ষ্য করে। মালাইচাকির উপর লাগল লাথিটা।

বালির উপর মুখ থুবড়ে পড়েছে লোকটা। লাফ দিয়ে তার পিঠে উঠে বসে দু'হাত দিয়ে গলাটা চেপে ধরতে চেষ্টা করল। বিপদ দেখে ছিটকে দূরে সরে গেছে ফাহিমা, কয়েকটা কাঠের বাক্সের পিছন থেকে উঁকি দিয়ে দেখছে ওদেরকে, ভাবছে কীভাবে সাহায্য করা যায় রানাকে।

রানার নীচে মৃত্যুভয়ে মরিয়া হয়ে উঠল দ্বিতীয় মেকানিক। তার গলায় চেপে বসা রানার আঙুলের নীচে নিজের আঙুল ঢুকিয়ে দিল সে। কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে গলা থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিতে যাচ্ছে রানা, কারণ জানে তা না হলে অন্তত দুটো আঙুল ভেঙে ফেলবে লোকটা। হাত সরিয়ে নিল ঠিকই, তবে একটু দেরি হয়ে যাওয়ায় আঙুল দুটোতে ব্যথা পেল রানা।

গলা মুক্ত হতেই এলোপাথাড়ি হাত-পা ছুঁড়ে ধাস্তাধস্তি শুরু করল লোকটা। তারপর দেখা গেল তার সঙ্গে রানাও গড়িয়ে স্ট্রিপে উঠে পড়ল। এই সময় প্লেনের কাছ থেকে এগিয়ে এল প্রথম মেকানিক। সঙ্গী আর শত্রুর অস্থির ধস্তাধস্তি দেখছে, সুযোগের অপেক্ষায় আছে কখন রানাকে লাথি মারা যাবে।

তবে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, ক্ষিপ্রতায় এতটুকু বিরতি না দিয়ে দড়াম করে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল প্রথম লোকটার

নাকের উপর। অঁক! করে একটা আওয়াজ ছেড়ে পড়ে গেল সে।

কিন্তু দ্বিতীয় লোকটার লড়াই করার শখ এখনও মেটেনি। লাফ দিয়ে সিধে হলো সে, হাঁটুর ব্যথাটা কেয়ার করছে না; ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার পিঠ লক্ষ্য করে।

আবার ধস্তাধস্তি শুরু হলো। দু'জনেই গড়িয়ে প্লেনটার পিছন দিকে চলে এসেছে। এদিকে প্লেনের রিভার্স প্রপেলার ঘুরছে বনবন করে।

ওটার কাছে গেলে মাংসের কিমা হয়ে যেতে পারে, ভাবল রানা। অনুভব করল ভয়ঙ্কর ব্লেডগুলো মাখনে ছুরি চালাবার মত ওর চারপাশের বাতাস কাটছে।

তরুণ মেকানিককে ঠেলে প্রপেলারের কাছ থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু তার শরীরে প্রচণ্ড শক্তি, সুবিধে করতে পারছে না ও। গুড়িয়ে উঠে আবার তার গলাটা চেপে ধরল রানা, কণ্ঠনালীতে চাপ দিয়ে অজ্ঞান করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভাঁজ করা হাটু দিয়ে রানার পাঁজরে পর পর কয়েকটা গুঁতো মেরে নিজেকে মুক্ত করল সে। লাফ দিয়ে একই সঙ্গে সিধে হলো দু'জন।

বাক্সের আড়াল থেকে ফাহিমা দেখল হাতে পিস্তল নিয়ে ককপিট থেকে বেরিয়ে এসেছে পাইলট। ওখানে দাঁড়িয়েই অস্ত্রটা তুলল সে, রানাকে গুলি করার জন্য পরিষ্কার একটা ফাঁক পাওয়ার অপেক্ষায় আছে।

স্ট্রিপ ধরে ছুটল ফাহিমা। একবার থেমে প্লেনের চাকার সামনে থেকে কাঠের একটা ব্লক তুলে নিল। এবার নিঃশব্দ পায়ে সাবধানে এগোল। তারপর ওই ব্লকটা দিয়ে পাইলটের মাথার পাশে বাড়ি মারল। পড়ে গেল লোকটা। আর পড়বি তো পড় ককপিটের ভিতর, একেবারে থ্রটল-এর উপর ইঞ্জিন আরও জোরে ঘুরছে।

গড়াতে শুরু করল প্লেন, শুধু এক সেট চাকায় ব্রক থাকায় সোজা না এগিয়ে লাটিমের মত চক্কর দিচ্ছে। প্রপেলার নাগাল পেয়ে যাবে, এই ভয়ে ককপিটের কিনারায় সরে এল ফাহিমা। তারপর ভিতর দিকে ঝুঁকল সে, অজ্ঞান পাইলটকে থ্রটলের উপর থেকে সরাবার চেষ্টা করল।

সম্ভব নয় লোকটা অসম্ভব ভারী। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আরও পাগলামি শুরু করল প্লেন—ঘোরার গতি বাড়ছে, সেই সঙ্গে কাত হয়ে যাচ্ছে একদিকে। ওটা বোধহয় চিঁড়ে-চ্যাপ্টা করে ফেলবে মাসুদ ভাইকে, ভাবল সে

ককপিটের ভিতর ঢুকে পড়ল ফাহিমা। প্লেক্সিগ্লাস শিল্ড টেনে আনল মাথার উপর। প্লেন এখনও একই জায়গায় চক্কর দিচ্ছে, ডানা বিপজ্জনক ভঙ্গিতে সরে যাচ্ছে মেকানিক আর রানা যেখানে ধস্তাধস্তি করছে সেদিকে।

হঠাৎ স্বস্তি বোধ করল রানা, ঘুসি মেরে লোকটাকে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু চোখের পলকে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল সে, এবং পাল্টা ঘুসি মারল রানার চিবুকে। পিছু হটল রানা। প্রপেলার ঘুরছে ওর ঠিক দুই ফুট পিছনে। দাঁড়িয়ে পড়ল ও, টলছে।

রানাকে খুন করার সুযোগটা দেখতে পেয়ে চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল লোকটার। দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে এল সে, ধাক্কা দিয়ে প্রপেলারের গায়ে ফেলে দেবে রানাকে।

আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে চোখ বুজল ফাহিমা।

কিছুই করল না রানা, শুধু স্যাঁৎ করে একপাশে সরে ল্যাং মারল শত্রুর পায়ে।

চোখ বুজলেও, সঙ্গে সঙ্গে আবার সেটা খুলে ফেলেছে ফাহিমা। দৃশ্যটা এত পরিষ্কার আর ভয়াবহ যে সারাজীবন মনে থাকবে তার। তরুণ আমেরিকানের ভিতর সেঁধিয়ে গেল প্রপেলারের ব্লেড। এক পলকে কেটে ফালা-ফালা করে ফেলল।

বিস্ফোরিত হয়ে চারদিকে ছুটে গেল রক্তের ফোয়ারা। প্লেনটা তারপরও ঘুরছে।

ককপিট থেকে বেরুবার চেষ্টা করল ফাহিমা। কিন্তু মাথার উপর প্লেক্সিগ্লাসটা জ্যাম হয়ে গেছে। ঢাকনির গায়ে দমাদম ঘুসি মারল সে, কিন্তু তারপরও ওটাকে সরাতে পারল না। প্রথম ঝুড়ি, এখন আবার ককপিট, ভাবল সে–এর শেষ কোথায়?

প্লেনের দিকে ছুটে এল রানা। ওটাকে কাত হতে দেখছে ও। দেখতে পাচ্ছে ককপিটের ভিতর আটকা পড়ে গেছে ফাহিমা।

লাটিম যেমন বনবন করে ঘোরার সময় স্থান বদলও করে, এখন ঠিক তাই করছে প্লেনটা, একটা ডানা নিচু হলো, বাড়ি মারল ফুয়েল ট্রাকে, ওটার উপর বসানো টর্পেডো আকৃতির ফুয়েল ট্যাঙ্ক ভেঙে দিল। স্ট্রিপের উপর জলপ্রপাতের মত ঝরে পড়ছে গ্যাসোলিন।

গ্যাসোলিনের উপর দিয়ে দৌড়াতে গিয়ে পা পিছলে দড়াম করে আছাড় খেল রানা, লাফ দিয়ে সিধে হয়ে আবার ছুটল। কয়েক পা এগিয়ে আবার লাফ দিয়ে একটা ডানায় উঠে পড়ল, টলতে টলতে এগোল ককপিটের দিকে।

'বেরোও! বেরিয়ে এসো! এখনই সব জ্বলে উঠবে!'

ক্ল্যাম্প বা হুক ধরে টানাটানি শুরু করল রানা, এটার সাহায্যেই বাইরে থেকে ককপিট খোলা হয়। কিন্তু হুকটা নড়ছে না কোন মতে

• ককপিটের ভিতরে থেকে অসহায় দৃষ্টিতে রানাকে হেরে-যেতে দেখছে ফাহিমা, জানে যে-কোন মুহূর্তে আগুনের বিস্ফোরণ ঘটবে।

কাঠের বিরাট কন্টেইনার বা বাক্সটা মেজর ময়নিহানের তাঁবুর বাইরে তিনজন আমেরিকান মার্সেনারি পাহারা দিচ্ছে। ভিতরে

অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে কাগজ-পত্র প্যাক করা হচ্ছে, ভাঁজ করা হচ্ছে নকশা আর মানচিত্র, সুটকেসে ভরা হচ্ছে রেডিও সেট।

তাঁবুর ভিতর দাঁড়িয়ে অন্যমনস্ক একটা ভাব নিয়ে ক্যাম্প গুটিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি দেখছে পল ভিতেরা। তার মন পড়ে আছে বাক্সটার ভিতর, উত্তেজনায় অধীর হয়ে ভাবছে আর্কটাকে কখন সে পরীক্ষা করতে পারবে।

আর্ক খোলার সময় ধর্মীয় কিছু রীতি আর আচার পালন করতে হবে। একজন ধর্মপ্রাণ ইহুদি হিসাবে সে-সব আগেই শিখে রেখেছে সে। এই মুহূর্তে স্মরণ করছে সেগুলো। ভাবতে আশ্চর্য লাগে আজ কত বছর ধরে ঠিক এই সময়টার জন্য অপেক্ষা করছে সে, ধৈর্য ধরে প্রস্তুত করেছে নিজেকে। মন্ত্রগুলো একজন ইহুদি র‍্যাবাই শিখিয়েছে তাকে।

আর্কটাকে তার এই পরীক্ষা করতে চাওয়াটা মরমন আমেরিকনরা পছন্দ করবে না, জানা কথা। ওদেরকে সে বোঝাবে, পরে ওটাকে নিয়ে যা খুশি করুক তারা, কিন্তু তার আগে সে তার কৌতূহল মিটিয়ে নেবে।

সত্যি কি আর্কটার অলৌকিক কোন ক্ষমতা আছে?

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল ভিতেরা।

দূরে, আগুনের একটা স্তম্ভ আকাশ ছুঁতে চাইছে, যেন স্বর্গে পৌঁছাতে চায়। পর মুহূর্তে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এল।

স্ট্রিপ লক্ষ্য করে ছুটছে ভিতেরা, উদ্বেগে অসুস্থ বোধ করছে।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে মেজর ময়নিহানও ছুটছে, তার পিছু নিয়েছে গোয়েন। মাত্র কয়েক মিনিট আগেও এয়ারস্ট্রিপে ছিল সে।

ফুয়েল ট্রাক দুটো বিস্ফোরিত হয়েছে। আগুন গ্রাস করে ফেলেছে গোটা প্লেনটাকে।

'স্যাবটাজ,' বলল ময়নিহান। 'কিন্তু কে?'

'কে আবার! মাসুদ রানা,' জবাব দিল ভিতেরা।

'রানা?' ময়নিহানকে বিমূঢ় দেখাল। 'ওখান থেকে বের হলো কী করে?'

'ওই লোকের কই মাছের জান,' বলল ভিতেরা। 'মরেও মরে না। তবে এরপর ওকে বুঝিয়ে দেয়া হবে কত ধানে কত চাল।'

দাঁড়িয়ে পড়েছে ওরা। চুপচাপ আগুনটা দেখছে।

'আর্কটাকে এই মুহূর্তে এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে,' বলল ভিতেরা। 'ট্রাকে তুলে কায়রোয় নিয়ে যাব। ওখানে প্লেনে তুলে আমেরিকায়।'

'হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে আমি একমত,' বলল মেজর ময়নিহান।

'যথেষ্ট প্রটেকশন থাকতে হবে,' মনে করিয়ে দিল ভিতেরা।

'জানি। ব্যবস্থা করছি।'

ঘুরল ভিতেরা। কায়রো থেকে প্লেন ধরা হবে, এটা সত্যি নয়। মেজর ময়নিহানকে না জানিয়ে এরই মধ্যে রেডিওর মাধ্যমে একটা দ্বীপে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠিয়েছে সে।

আমেরিকায় পাঠাবার আগে আর্কটাকে খোলাই হবে এখন তার একমাত্র কাজ।

তাঁবুগুলোর মাঝখানে হুড়োহুড়ি ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেছে। আমেরিকান মার্সেনারিরা প্রথমে এয়ারস্ট্রিপের দিকে ছুটল, ওখানে কারও কিছু করার নেই বুঝতে পেরে দৌড়ে ফিরে আসছে সবাই।

আরেকদল সশস্ত্র লোক ক্যানভাস ঢাকা ট্রাকে আর্কটা তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, সুপারভাইজ করছে মেজর ময়নিহান, তার নার্ভাস কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কর্কশ শোনাচ্ছে। কন্টেইনারটা নিরাপদে আমেরিকায় না পৌঁছানো পর্যন্ত তার শান্তি নেই।

ওদিকে ভিতেরাকে নিয়ে খুব চিন্তায় আছে ময়নিহান।

লোকটা যেন কী নিয়ে সব সময় একটা ধ্যানের মধ্যে আছে। তার চোখে একধরনের পাগলামির আভাস দেখতে পেয়েছে সে।

রানা আর ফাহিমা বালির স্তূপে গা ঢাকা দিয়ে তাঁবুগুলোর কাছাকাছি চলে এসেছে। কয়েকটা ব্যারেলের পিছনে এসে উপুড় হয়ে শুয়েছে ওরা, মিশরীয় শ্রমিক আর আমেরিকান মার্সেনারিদের ট্রাকে কার্গো তুলতে দেখছে ধোঁয়া লেগে কালো হয়ে আছে দু'জনের মুখ।

'আপনি এত সময় নিচ্ছিলেন, ভাবলাম আমাকে তো বাঁচাতে পারবেনই না, নিজেও পুড়ে মরবেন।'

হাসল রানা।

'আচ্ছা, সব কাজ আপনি একেবারে শেষ মুহূর্তে করেন কেন বলুন তো?'

'আমি করি না।' এখনও হাসছে রানা। 'সম্ভবত নিয়তি আমাকে দিয়ে করিয়ে নেয়।' আর্কটার দিকে তাকাল ও, ইতিমধ্যে ট্রাকে তোলা হয়ে গেছে। 'কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোথায়?'

একদল মিশরীয় দৌড়ে এদিকে আসছে। যেমন অবাক হলো, তেমনি খুশিও হলো রানা, তাদের মধ্যে আলাল আর বিল্লালও রয়েছে। লোকগুলো ওদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে, আলালকে লক্ষ্য করে একটা পা বাড়িয়ে দিল ও।

পড়ে গেল আলাল, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল, আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে চেহারা। 'মিস্টার রানা! ম্যাডাম! ভাবিনি আবার আপনাদের দেখতে পাব!'

'আমরাও,' বলল রানা। 'কী অবস্থা?'

'স্থানীয় লোকজনদের ওপর কোন নজরই নেই ওদের। আমাদেরকে বোকা আর অজ্ঞ মনে করে ওরা...তা ছাড়া কে ওদের লোক, কে নয়, ধরতেও পারে না। ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে

পালিয়েছি...' ব্যারেলের পিছনে চলে এসে উপুড় হয়ে শুলো সে, ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে। 'বিস্ফোরণটা নিশ্চয় আপনার কাজ?'

'তা বলতে পারো।'

'আপনি জানেন আর্কটাকে কায়রোয় নিয়ে যাচ্ছে ওরা?'

'কায়রোয়?'

'জানা কথা ওখান থেকে প্লেনে তুলে আমেরিকায় নিয়ে যাবে।'

'মিশর সরকার অনুমতি দেবে?'

'সরকার কিছু জানলে তো!' গম্ভীর হলো আলাল। 'আমলারা টাকা খেয়ে চোখ বুজে থাকার সিদ্ধান্ত নিলে কার কি করার আছে বলুন?'

'কায়রো থেকে সরাসরি আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হবে কিনা সন্দেহ আছে আমার,' বলল রানা।

'এ-কথা বলছেন কেন?'

'আমার ধারণা,' জানাল রানা, 'আর্কটাকে নিয়ে নিজস্ব কোনও আলাদা প্ল্যান আছে ফ্রেঞ্চ লোকটার–ভিতেরার।'

'অসম্ভব নয়।'

ট্রাকের পাশে খোলা একটা স্টাফ কার এসে দাঁড়াল। ড্রাইভার আর সশস্ত্র একজন গার্ডকে নিয়ে সেটায় উঠে বসল ময়নিহান আর ভিতেরা। হঠাৎ বালির উপর অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। আট কি দশজন সশস্ত্র মার্সেনারি এগিয়ে এসে ট্রাকটার পিছনে উঠতে যাচ্ছে–যে ট্রাকে আর্কটা তোলা হয়েছে।

'আমাদের কোন আশাই দেখছি না,' বিড়বিড় করল ফাহিমা, চেষ্টা করেও চাপতে পারল না দীর্ঘশ্বাসটা।

রানা কিছু বলছে না। লক্ষ করো, নিজেকে বলল ও। মন দিয়ে দেখো। চিন্তা করো।

এরপর এগিয়ে এল আরেকটা স্টাফ কার। এটারও মাথা

খোলা, পিছনে একটা মেশিনগান বসানো হয়েছে, পাশে দাঁড়ানো গানারকে নার্ভাস দেখাচ্ছে। এই দ্বিতীয় স্টাফ কারের সামনে, ড্রাইভিং সিটে বসে রয়েছে গোয়েন। গোয়েনের পাশে মেজর আব্রাহামকে দেখা যাচ্ছে।

তাকে দেখেই দম আটকে ফাহিমা বলল, 'ওটা একটা পিশাচ।'

'ওরা সবাই পিশাচ, ম্যাডাম,' বলল আলাল।

'পিশাচ হোক বা না হোক,' হতাশ সুরে বলল ফাহিমা, 'সময় যত গড়াচ্ছে, আমাদের কিছু করার সম্ভাবনা ততই কমে যাচ্ছে।'

মেশিন গান, সশস্ত্র মার্সেনারি, ভাবল রানা। তাতে কী! ফায়ার পাওয়ার থাকলেই তো হবে না, ব্যবহার করার সুযোগ কতটা পাবে তার উপর জয়-পরাজয় নির্ভর করে।

প্রস্তুতি চলছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রওনা হয়ে যাবে কনভয়।

'ধ্যাত! ধ্যাত!' ফাহিমার কণ্ঠে বিরক্তির সঙ্গে তিরস্কারও কম নয়। 'চোখের সামনে দিয়ে চলে যেতে দিচ্ছেন আর্কটাকে? কিছুই করবেন না আপনি?'

'আমি ওদের পিছু নেব,' শান্ত সুরে বলল রানা

'কীভাবে?' জানতে চাইল ফাহিমা। 'আপনি অত জোরে দৌড়াতে পারবেন?'

'তারচেয়ে ভালো আইডিয়া আছে আমার কাছে।' সিধে হলো রানা। 'যেভাবে হোক, ওদের আগে কায়রোয় যাবার ব্যবস্থা করো তোমরা। ওখানে পৌঁছে ইজরায়েলের হাইফা বন্দরে যাবার জন্যে একটা বোট ভাড়া করবে...'

'হাইফা? ইজরায়েল?' আকাশ থেকে পড়ল ফাহিমা। 'আপনার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, মাসুদ ভাই!'

'ও তাই তো, ব্যাপারটা তোমাকে ব্যাখ্যা করা হয়নি,' ইতস্তত

করে বলল রানা। 'কিন্তু এখন তার আর সময়ও নেই। শুধু এইটুকু বলি—আর্কটা ইজরায়েলে যাচ্ছে, কারণ ঐতিহাসিক বিচারে জিনিসটা ওদেরই প্রাপ্য।' আলালের দিকে তাকাল ও। 'কায়রোয় কোথায় আমাদের দেখা হতে পারে?'

এক মুহূর্ত চিন্তিত দেখাল আলালকে। 'রিয়াদের একটা গ্যারেজ আছে, নিজের ট্রাকটা যেখানে রাখে সে। প্রেসিডেন্ট নাসের রোডটা চেনেন আপনি?'

'পুরানো শহরে।'

'ওখানে থাকব আমরা।'

দাঁড়াল ফাহিমা। 'কী করে বুঝব, মাসুদ ভাই, অক্ষত অবস্থায় ওখানে পৌঁছাবেন আপনি?'

'আমার ওপর আস্থা রাখো,' বলে ব্যারেলগুলোর মাঝখান দিয়ে রওনা হয়ে গেল রানা।

'আমার ট্রাকটাই ব্যবহার করি, কী বলেন?' রানা চলে যেতে জিজ্ঞেস করল আলাল। 'স্পিড একটু কম, তবে নিরাপদ।'

স্তূপ করা বালির ভিতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে সারি সারি গর্ত আর এয়ারস্ট্রিপের মাঝখানে চলে এল রানা। যেমনটি আশা করেছিল, পোলের সঙ্গে অ্যারাবিয়ান স্ট্যালিয়ন দুটো বাঁধা রয়েছে। তবে মিরান, নিশা বা জিপটাকে আশপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ঘোড়া দুটোর মধ্যে একটা সাদা, আরেকটা কালো। এক ফালি সবুজ ক্যানভাসের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ওগুলো।

সাবধানে এগোল রানা। কাছাকাছি পৌঁছেছে, কালো স্ট্যালিয়ন পা ছুঁড়ে বালি ওড়াল, তারপর পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়ে বৈরি ভঙ্গিতে খাড়া হবার চেষ্টা করল। সাদাটা শান্ত, নিরীহ একটা ভাব নিয়ে তাকিয়ে আছে।

কালোটার দিকেই এগোল রানা। হাত বাড়িয়ে ছুঁলো ওটাকে, পিঠে হাত বুলিয়ে দিল, শিস দিল মৃদু। একটু শান্ত হলো কালো। সুযোগ বুঝে লাফ দিয়ে ওটার পিঠে চড়ে বসল ও।

গোড়ালি দিয়ে পাশে খোঁচা মারতে ক্যানভাস শেল্টার থেকে বেরিয়ে এল ব্ল্যাক স্ট্যালিয়ন। তারপরই জানোয়ারটাকে দৌড় খাটাতে শুরু করল রানা–বাধ্য করল বালিয়াড়ি টপকে আর নালা পেরিয়ে উড়ে যেতে। কোন রকম প্রতিবাদ না করে ওর প্রতিটা নির্দেশ অনুগত ভঙ্গিতে পালন করছে ঘোড়াটা।

এই মরুভূমি আর কায়রোর মাঝখানে, বিস্তীর্ণ পাহাড়ী একটা এলাকায়, কনভয়টাকে বাধা দেওয়ার কথা ভাবছে রানা। কীভাবে বাধা দেবে, অতগুলো মার্সেনারির সঙ্গে একা কীভাবে লড়বে, এ-সব কথা এই মুহূর্তে ভাবছে না ও।

ট্রাক ছুটছে, কিন্তু স্পিড যথেষ্ট নয়।

শিরদাঁড়া খাড়া করে ড্রাইভিং সিটে বসে আছে আলাল, দাঁতে দাঁত চেপে অভিশাপ দিচ্ছে নিজেকে। পাশের সিটে বসে আতঙ্কে দরদর করে ঘামছে ফাহিমা।

ভিতেরা আর মরমনদের চেয়ে অন্তত দশ মিনিট আগে রওনা হয়েছে ওরা। সব ঠিক মতই চলছিল, কিন্তু রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ ইঞ্জিনটা বিগড়ে যাওয়ায় দেখা দেয় মহা বিপদ। বনেট তুলে ইঞ্জিন পরীক্ষা আর মেরামত করতে বেরিয়ে গেছে মূল্যবান আটটা মিনিট।

এই মুহূর্তে মরমনদের কনভয় ওদের কাছ থেকে মাত্র একশো গজ পিছনে। আলালের ট্রাকটা পুরানো, গতি খুবই কম, ফলে কনভয়ের সঙ্গে দূরত্ব দ্রুত কমে আসছে।

আলাল ভাবছে, খুব বেশি হলে আর মাইলখানেক সামনে সরু একটা পাহাড়ী পথ পড়বে বাম দিকে, ওটায় পৌছাতে পারলে

তাকে আর পায় কে! আঁকাবাঁকা পথটা এই স্পিডেও কনভয়ের অনেক আগে কায়রোয় পৌঁছে দেবে ওকে।

কিন্তু অত সময় কী পাওয়া যাবে!

পিছনে হর্ন বাজছে।

এখন ওদের একমাত্র আশা, ভিতেরা বা মরমনরা হয়তো জানে না তাদের সামনের ট্রাকটায় ফাহিমা আছে।

পিছনের স্টাফ কার ঘন ঘন হর্ন দিচ্ছে।

'সাইড দাও, আলাল!' ঢোক গিলে বলল ফাহিমা। 'কনভয়টা যদি ওভারটেক করে চলে যায় মনে করব আল্লার রহমত আছে আমাদের ওপর।'

ইতস্তত করছে আলাল। 'কিন্তু যদি স্যান্ডউইচ বানিয়ে ফেলে?'

'সে তখন দেখা যাবে,' বলল ফাহিমা। 'আমাকে যদি দেখে ফেলে, বন্দি করার চেষ্টা করবে ওরা। কিন্তু তোমাকে বন্দি নয়, গুলি করবে। কাজেই বিপদ দেখলে পালাবার চেষ্টা করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

মাথা নাড়ল আলাল। 'অসম্ভব, আপনাকে ফেলে কোথাও আমি যাব না, ম্যাডাম!'

'কিন্তু ট্রাক থেকে নেমে আমিও যদি তোমার সঙ্গে দৌড় দিই, ওরা ধাওয়া করবে,' বলল ফাহিমা। 'আমি ওদের সঙ্গে দৌড়ে পারব না, ধরা পড়ে যাব, আর তোমাকে ওরা গুলি করে মারবে।'

আবার হর্ন বাজল।

দীর্ঘ রাস্তার দু'পাশে কোন শাখা পথও নেই যে ভিতরে ঢোকা যাবে। স্পিড কমিয়ে আনল আলাল, রাস্তার একপাশে সরিয়ে নিয়ে এল ট্রাক। সিট থেকে নেমে নীচে বসল ফাহিমা, পাশ কাটাবার সময় ওকে যাতে কনভয় থেকে কেউ দেখতে না

পায়।

কনভয়ের প্রথম গাড়ি, স্টাফ কারটা দ্রুতবেগে পাশ কাটাল ওদের ট্রাককে। কিন্তু তারপরই ধীরে ধীরে স্পিড কমতে লাগল।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল আলাল। 'যা ভয় করেছিলাম, স্যান্ডউইচ বানাচ্ছে!

'সময় থাকতে...'

কথাটা শেষ করতে পারল না ফাহিমা, পিছনের ট্রাক থেকে এক পশলা বুলেট বৃষ্টি হলো। তবে একটা গুলিও লাগল না ওদের ট্রাকে, সবগুলো বেরিয়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। এরকম ভয় দেখিয়ে ফাঁকা গুলি একটু পরপরই হতে থাকল।

এই সময় দেখা গেল সামনের স্টাফ কার ব্যাক গিয়ার দিয়ে ওদের দিকে ফিরে আসছে।

গা ঢাকা দিয়ে কোন লাভ হয়নি, কাজেই আবার সিটের উপর উঠে বসল ফাহিমা। 'তুমি পালাও, আলাল,' জরুরি তাগাদার সুরে বলল ও। 'অযথা প্রাণ হারাবার তো কোন মানে হয় না!'

'মাফ করবেন, ম্যাডাম, মরতে হয় মরব, কিন্তু আপনাকে ফেলে...'

কথায় কাজ হবে না, বুঝতে পারল ফাহিমা নিজের দিকের দরজা খুলে ফেলল সে, তারপর লাফ দিয়ে ক্যাব থেকে রাস্তায় নামল। 'মাসুদ ভাইকে আমার খবর দেয়ার জন্যে হলেও কায়রোয় পৌঁছানো দরকার তোমার,' নিচু গলায় বলল আলালকে, হাত দুটো মাথার উপর তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে পা বাড়াল সামনের স্টাফ কার লক্ষ করে। 'রাস্তার পাশের ঢাল বেয়ে নেমে যাও, তারপর বোল্ডারগুলোর পিছনে লুকাও–এখনও সময় আছে।'

আলাল কী করল দেখার জন্য একবারও পিছন ফিরে তাকাল

না ফাহিমা। ভিতেরাকে দেখতে পাচ্ছে সে, স্টাফ কার থেকে নেমে তার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। 'হিমা! ডার্লিং হিমা! আমার কপালে লিখে দিয়েছে তোমাকে ঈশ্বর, চেষ্টা করলেও কেউ কেড়ে নিতে পারবে কেন!'

ষোলো

সরু পাহাড়ী পথ ধরে কনভয়টা যেন ধুঁকে ধুঁকে এগোচ্ছে। রাস্তা ক্রমশ উঁচু হচ্ছে, বাঁকগুলো চুলের কাঁটার মত, পাশের গভীর খাদের দিকে তাকালে শিউরে ওঠে শরীর।

স্ট্যালিয়নের পিঠে বসে কনভয়টাকে পাশ কাটাতে দেখছে রানা। কষ্ট করে এগোচ্ছে ওটা। উপরে উঠছে গাড়িগুলো, ওর নীচে আর বেশ খানিকটা দূরে। শ্বেতাঙ্গ মার্সেনারিদের প্রত্যেকের গায়ে সাদা শার্ট আর জিনসের প্যান্ট, এক ধরনের ইউনিফর্মই বলা যায়, এখনও সতর্ক অবস্থায় যে-যার রাইফেল বাগিয়ে ধরে আছে।

একটা ঢাল ধরে ঘোড়া ছোটাল রানা। কিছু শুকনো ঘাস, দু'একটা ঝোপ আর আলগা মাটি দেখা যাচ্ছে। ঘোড়ার খুর যেন ছোটখাট ধস তৈরি করছে। তারপর কনভয়ের পিছনে, পাকা পাহাড়ী রাস্তায় পৌঁছে গেল স্ট্যালিয়ন, আরেকবার আশা করল কনভয়ের লোকগুলো দেখতে পাবে না ওকে। পরমূহূর্তে ভাবল, দূর, তাই কি হয়!

পিছনের স্টাফ কার থেকে গানার ফায়ার ওপেন করতে যাচ্ছে

দেখে ঘোড়াকে দ্রুত একপাশে সরিয়ে নিল রানা। রাস্তার ক্ষতবিক্ষত সারফেসে লেগে দিক্‌বিদিক্ ছুটল বুলেটগুলো, চিঁহিঁহিঁ করে ডেকে উঠে নাচতে শুরু করল স্ট্যালিয়ন। গুলির আওয়াজ পাহাড়ের গায়ে লেগে প্রতিধ্বনি তুলছে।

ঘোড়াটাকে আরও জোরে ছোটাচ্ছে রানা, পশুটাকে যেন খাটিয়ে মেরে ফেলবে। তারপর দেখা গেল স্টাফ কারকে পাশ কাটাচ্ছে ও, আমেরিকানদের চেহারায় অবিশ্বাস আর বিস্ময় দেখতে পাচ্ছে ।

ওর দিকে মেশিন গান ঘোরাল গানার। ঠক-ঠক ধাতব আওয়াজ হলো, ঝাঁকি খেল ভারী অস্ত্রটা, কিন্তু অ্যামিউনিশন শেষ হয়ে যাওয়ায় কোন বুলেট বেরুল না।

ড্রাইভারের পাশে বসে আছে মেজর আব্রাহাম, হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু ঘোড়সওয়ার রানা আর স্টাফ কারের মাঝখানে ট্রাক চলে আসায় তার টার্গেটকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না সে। এই মুহূর্তে ক্যাবের পাশাপাশি ছুটছে রানার ঘোড়া।

তা সত্ত্বেও গুলি করল আমেরিকান মার্সেনারি। বুলেট ট্রাকের ক্যানভাস ছিঁড়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

সুযোগ নিতে হলে এখনই, ভাবল রানা। ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিল ও, শূন্যে ঘুরিয়ে নিল শরীরটা, ক্যাব-এর কিনারা ধরে ঝুলে পড়ল। লাথি দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলেছে, দেখল সশস্ত্র গার্ড তার রাইফেল তোলার চেষ্টা করছে।

হাত বাড়িয়ে ওটা ধরল রানা, এদিক-ওদিক কয়েকটা মোচড় দিয়ে কেড়ে নিল, তারপর ওটার বাঁট দিয়ে মেরে লোকটার খুলি ফাটিয়ে দিল। রক্ত দেখে জ্ঞান হারাচ্ছে সে, তাকে ঠেলে রাস্তায় ফেলে দিল রানা। অটোমেটিক রাইফেল সিটের নীচে ফেলে দিল ও। এবার ড্রাইভারের পালা। ছোট্ট পরিসরে লোকটাকে সাবধানে

সামলাতে হবে। একটু এদিক-ওদিক হলেও খাদের নীচে পড়ে যাবে ট্রাক।

শক্ত-সমর্থ লোক, সামনের দুটো দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো, চেহারায় গোঁয়ার-গোবিন্দ ভাব। এক হাত দিয়ে রানাকে আঘাত করার চেষ্টা করছে সে, অপর হাতে স্টিয়ারিংটা এদিক-ওদিক ঘোরাচ্ছে—ফলে ঘন ঘন খাদের কিনারায় পৌঁছে যাচ্ছে ট্রাক।

একবার মনে হলো, কিনারা টপকে নীচে পড়ে যাবে ওরা। ঝট করে হাত বাড়িয়ে হুইল ধরে ঘোরাল রানা। সুযোগ পেয়ে দুম করে ওর নাকে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল ড্রাইভার।

মুহূর্তের জন্য আচ্ছন্ন বোধ করল রানা। ব্রেকে চাপ দেওয়ার চেষ্টা করল ড্রাইভার। লাথি মেরে তার পা সরিয়ে দিল রানা। তারপর আবার ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যেতে দেখা গেল হুইলটা উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরছে। ট্রাক একবার পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেতে যাচ্ছে, আরেকবার কিনারা থেকে লাফিয়ে পড়তে চাইছে খাদে।

ট্রাকটাকে এড়াবার জন্য পিছনের স্টাফ কারের হুইল পাগলের মত ঘোরাল গোয়েন। এমন হঠাৎ আর এত দ্রুত ঘোরাল, পিছনের গানার গাড়ির পাশ থেকে ছিটকে পড়ে গেল, তারপর খাদের কিনারা থেকে নেমে গেল গভীর খাদে। তার অনুভূতি হলো ভার চাপানো ঘুড়ির মত, হাত দুটো দু'দিকে প্রসারিত, চুলের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে তীব্র বাতাস, আর তার আর্তচিৎকারের আওয়াজ নীচের গিরিপথে প্রতিধ্বনি তুলছে।

কনভয়ের একেবারে সামনের স্টাফ কারে রয়েছে ভিতেরা। কী ঘটছে দেখার জন্য ঘাড় ফেরাল। মাসুদ রানা, ভাবল সে। রানা না হয়েই যায় না। আর্কটা পাওয়ার চেষ্টা করছে। এই প্রাইজ কখনোই পাবে না তুমি, রানা। না পাবে আর্ক, না পাবে ফাহিমাকে!

স্টাফ কারের পিছনে, এক প্রস্থ তেরপলের নীচে শুয়ে থাকতে

বাধ্য করা হয়েছে ফাহিমাকে। ভিতেরা চায় না রানা তাকে দেখে ফেলুক।

মেজর ময়নিহানকে একবার দেখে নিল ভিতেরা। তারপর আবার পিছন দিকে তাকাল। কিন্তু উইন্ডস্ক্রিনে রোদ পড়ায় ট্রাক ক্যাবের ভিতরটা দেখতে পেল না। 'বোধহয় কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে,' শান্ত সুরে বলল সে।

চূড়ায় পৌঁছাল কার, চুলের কাঁটার মত একটা বাঁক ঘুরল, কিনারার দুর্বল গার্ডরেইলে আঘাত করে বাঁকিয়ে ফেলল সেটাকে। গাড়িটাকে আবার সিধে করে নিতে পারল ড্রাইভার, সেই সঙ্গে কারের পিছনে বসে থাকা গার্ড তার সাবমেশিন গান তাক করল ক্যাব-এর জানালায়।

তাকে বাধা দিল ভিতেরা। 'তুমি গুলি করলে ড্রাইভার মারা যেতে পারে। ড্রাইভার মারা গেলে গাড়িটা খাদের নীচে পড়ে যাবে। আর্কটার কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না।'

চোখে-মুখে উদ্বেগ, গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথাটা ঝাঁকাল মেজর ময়নিহান। 'এখানেও কি আমরা আপনার সেই নাছোড়বান্দা শত্রুর দুঃসাহস দেখতে পাচ্ছি, মঁশিয়ে ভিতেরা?' জানতে চাইল সে।

মাথা ঝাঁকাল ভিতেরা। 'কিন্তু এ-সব করে কী সে অর্জন করতে চায় তা আমার বোধ-বুদ্ধির বাইরে,' জবাব দিল সে। 'যে স্বর্ণমূর্তির জন্যে ওর বুড়ো ফ্রেন্ডকে মেরেছিলাম, সেটা আমার কাছ থেকে, কী করে জানি না, কেড়ে নিয়েছে ও। এখন আবার আর কী চায়? ক্রমেই লোকটা আমাকে আতঙ্কিত করে তুলছে!'

'আর্কের যদি কোন ক্ষতি হয়...'

'না, তা হবে না। কিছুতেই তা আমরা হতে দেব না।'

এই মুহূর্তে রানা দুই হাত দিয়ে চেপে ধরেছে ড্রাইভারের গলাটা। কিন্তু ট্রাকটা আবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। পাক খেয়ে

ভাঙা গার্ডরেইলে আঘাত করল, একেবারে শুইয়ে দিল ওটাকে। ধুলো-বালির একটা মেঘ উড়িয়ে খাদে পড়তে যাবে, এই সময় হুইলটা ধরে ফেলল রানা, একেবারে শেষ মুহূর্তে কিনারা থেকে ফিরিয়ে আনল ট্রাকটাকে।

পিছনের স্টাফ কারে বসে থাকা মেজর আব্রাহাম আর গোয়েনকে রাশি রাশি ধুলো-বালি অন্ধ করে দিল। পিস্তলটা এখনও ধরে আছে আব্রাহাম, তবে আলগাভাবে।

গলায় ধুলো আটকে যাওয়ায় খক খক করে কাশছে গোয়েন। পাতাগুলো ঘন ঘন খুলে আর বন্ধ করে চোখ দুটোকে বালি মুক্ত করতে চেষ্টা করছে। তবে চোখ মিটমিট করতে দেরি হয়ে গেছে তার। ভাঙা গার্ডরেইলটাই তার দেখা শেষ দৃশ্য। আর শেষবারের মত শুনল মেজর আব্রাহামের আকস্মিক আতঙ্কিত আর্তনাদ। স্টাফ কারটাকে যেন চুম্বকের মত টেনে নিচ্ছে গভীর খাদ। গার্ডরেইলের ভিতর দিয়ে লাফ দিল সেটা শূন্যে। মনে হলো এক সেকেন্ডের জন্য ওখানে ঝুলে থাকল ওটা। তারপর যখন পতন শুরু হলো, তার আর থামাথামি নেই।

গিরিপথের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে বিস্ফোরিত হলো পেট্রল ট্যাংক, কমলা আগুনের প্রদর্শনী ছাড়া আর কিছু দেখার থাকল না।

খোদা, ভাবল রানা। ড্রাইভারকে কাবু করতে পারছে না ও। তাকে সামলাতে গেলে খাদের কিনারায় চলে যাচ্ছে ট্রাক। লোকটার শরীরে অসুরের শক্তি।

চোখের কোণ দিয়ে দেখে আরেকটা ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠল রানা। সাইড মিররে তাকালে দৃশ্যটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ট্রাকের পাশ দিয়ে ঝুলে মার্সেনারিরা ক্যাবের দিকে এগিয়ে আসার পথ করে নিচ্ছে।

শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে ড্রাইভারকে দরজার দিকে

ঠেলে দিল রানা, ঝেড়ে একটা লাথি মারল বুকে, হাত বাড়িয়ে দরজার কবাট আগেই খুলে ফেলেছে। সিটের কিনারা ধরে ক্যাবে থাকার চেষ্টা করছে লোকটা। হাতে পর পর দুটো লাথি মেরে ক্যাব থেকে তাকে খসিয়ে দিল ও। ধুলোর পাহাড়ে হারিয়ে গেল লোকটা।

দুঃখিত, ভাবল রানা।

হুইল ধরে গ্যাস পেডালে চাপ দিল ও, সামনের স্টাফ কারটাকে ধরতে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক, পাহাড় কেটে ছোট একটি টানেল তৈরি করা হয়েছে।

ট্রাকটাকে ঘন ঘন এদিক-ওদিকে ঘোরাচ্ছে রানা, টানেলের দেয়ালে দু'পাশের বডিকে ঘষা খাওয়াচ্ছে। দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে আর পিষে গিয়ে চেঁচাচ্ছে মার্সেনারিরা, ট্রাক ছেড়ে দিয়ে টপাটপ খসে পড়ছে অন্ধকার রাস্তায়। রানা ভাবছে, ট্রাকের পিছনে সশস্ত্র লোকজন আর কজন আছে কে জানে।

টানেল থেকে কর্কশ দিনের আলোয় বেরিয়ে এল ট্রাক। স্টাফ কারের পিছনে ধাক্কা লাগতে যাচ্ছিল ট্রাকের। ওটার সশস্ত্র গার্ডকে চট করে একবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখল রানা। তারপর উপলব্ধি করল আকাশে নয়, লোকটা ওর ট্রাকের ছাদে তাকিয়েছে।

অকস্মাৎ ব্রেক কষল রানা, লক করে দিল চাকা, খানিকটা পিছলে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাক। দু'জন মার্সেনারিকে ছাদ থেকে ছিটকে পড়তে দেখল ও, পাহাড়ের গায়ে বাড়ি খেয়ে থেঁতলে গেল।

উঁচু পাহাড়ী রাস্তা ধরে নামছে ওরা এখন। ট্রাকের স্পিড বাড়িয়ে স্টাফ কারকে বারবার পিছন থেকে গুঁতো মারছে রানা। বেশ স্বস্তিকর আর আনন্দময় অনুভূতি–ট্রাকে মহামূল্যবান কার্গো থাকায় তারা তোমাকে মেরে ফেলার ঝুঁকি নিতে চাইছে না।

ট্রাকের গুঁতো খেয়ে দেখার মতই হয়েছে ভিতেরা আর তার মার্কিন বন্ধুদের চেহারা। সবারই আত্মা খাঁচাছাড়া হওয়ার যোগাড়। স্টাফ কারের পিছনে একটা তেরপল দেখতে পাচ্ছে রানা, স্তূপ করে রাখা হয়েছে। একবার শুধু দেখলই ও, তারপর আর ওটার কথা মনে পড়ল না।

স্টাফ কারের ড্রাইভার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চালাচ্ছে। পিছনে বার বার গুঁতো খেয়েও গাড়ির নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে সে—পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেতে বা কিনারা থেকে নীচে পড়তে দিচ্ছে না।

আবার স্পিড বাড়িয়ে স্টাফ কারের পিছনে আরেকটা গুঁতো মারল রানা। পাহাড়ী ঢাল থেকে নেমে আসার পর রাস্তা সমতল হয়ে আসছে। অনেক দূরে, এখনও আবছা, শহরের আভাস পাওয়া গেল। এটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক পর্যায়। রাস্তার পাশে গভীর খাদ ছিল বলে এতক্ষণ ওকে মেরে ফেলার তেমন কোন চেষ্টা করেনি তারা। তবে এখন করবে, যেহেতু মূল্যবান কার্গোটার খাদে পড়ে যাওয়ার ভয় নেই। অন্তত ট্রাকসহ রাস্তা থেকে ওকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা তো করবেই।

যেন রানার চিন্তার সঙ্গে একমত হয়েই সশস্ত্র গার্ড ফায়ার ওপেন করল। সাবমেশিন গানের বুলেট উইন্ডস্ক্রিনের কাঁচ গুঁড়িয়ে দিল, ফুটো করল ক্যানভাস কাভার, ফুটো তৈরি করল কাঠের বডিতে। রানা শুনতে পেল কানের পাশ দিয়ে বাতাস কেটে ছুটে গেল যাচ্ছে দিক্‌ভ্রান্ত বুলেট। মাথাটা ঝট্ করে নামিয়ে নিল ও।

রাস্তা মোচড় খাচ্ছে, সামনে তীক্ষ্ণ একটা বাঁক। বাঁকটা ঘোরার সময় স্পিড আবার বাড়াল, ট্রাক নিয়ে ওভারটেক করছে স্টাফ কারকে।

আবার গুলি করল গার্ড। কিন্তু রানা মাথা নিচু করে রাখায় আসলে কোন টার্গেট নেই তার। রানা যে ওভারটেক করতে

যাচ্ছে, তাদের ড্রাইভার সেটা বুঝতে দেরি করে ফেলল। যখন বুঝল তখন স্টাফ কার আর পাহাড়-প্রাচীরের মাঝখানে ট্রাক নিয়ে চলে এসেছে রানা।

এই পজিশন থেকে স্টাফ কারের পাশে গুঁতো মারা রানার জন্য কোন সমস্যা নয়। মাত্র দুটো ধাক্কাতেই কাজ হলো, রাস্তা থেকে সরে গেল স্টাফ কার, সামান্য ঢালু ঘাসজমির উপর দিয়ে ক্ষীণ ধারা নিয়ে বয়ে চলা একটা নদীর কিনারায় গিয়ে থামল ওটা –রাস্তা থেকে প্রায় ত্রিশ ফুট নীচে। তবে দুঃখের বিষয়, গাড়িটার কোন ক্ষতি হয়নি, শয়তানগুলোও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে।

আবার তারা পিছু নিতে চেষ্টা করবে, জানে রানা। তবে সফল হবে না, ততক্ষণে ট্রাক নিয়ে কায়রো শহরে লুকিয়ে পড়বে ও।

ফাঁকা রাস্তা, স্পিড আরও বাড়িয়ে দিয়েছে রানা, সেই সঙ্গে একটা চোখ রেখেছে রিয়ারভিউ মিররে। তবে পিছন থেকে নয়, বিপদ এল সামনে থেকে। আর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে।

একটা বাঁক ঘুরেই বাধাটা দেখতে পেল রানা। ঠিক রোডব্লক নয়, তবে পরিষ্কার বোঝা গেল আয়োজনটা করা হয়েছে ওকে থামাবার জন্যই।

দুটো জিপ রাস্তার মাঝখানে এমন ভঙ্গিতে দাঁড় করানো হয়েছে, পাশ কাটিয়ে যাওয়া অসম্ভব না হলেও বেশ কঠিন। একটা জিপের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে আসহাদু মিরান আর কাদিম নিশা, দুই মোসাদ এজেন্ট। কাছাকাছি এসে রানা খেয়াল করল দু'জনকেই কেমন যেন বিব্রত আর আড়ষ্ট দেখাচ্ছে। দ্বিতীয় জিপটা একটু পিছনে রয়েছে, তাতে পাঁচ-সাতজন সশস্ত্র লোক।

ইতিমধ্যে গার্ডের সাবমেশিন গানটা চেক করে রেখেছে রানা। সিটের তলায় স্পেয়ার ম্যাগাজিনও পেয়েছে। রোডব্লকের কাছাকাছি পৌঁছাবার আগে অস্ত্রটা আলখেল্লার ভিতর লুকিয়ে

ফেলেছে ও। পরিস্থিতিটা ঠিক স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। আর্কটা তো স্বেচ্ছায় তাদেরকে দিতে চায় রানা, সেক্ষেত্রে রাস্তার মাঝখানে এভাবে ওকে থামাবার কারণ কী?

প্রথম জিপের কাছ থেকে দশ গজ দূরে ট্রাক থামাল রানা। দ্বিতীয় জিপ থেকে এক লোককে নীচে নামতে দেখল ও। দেখামাত্র চিনে ফেলল তাকে।

কালাহান। টিম কালাহান। মোসাদের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ এজেন্ট লোকটা। তার শুধু ছবি দেখেছে রানা, মুখোমুখি এই প্রথম দেখছে।

একজন বডিগার্ডকে নিয়ে মিরান আর নিশার কাছে এসে দাঁড়াল কালাহান, নির্দেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে কী যেন বলছে তাদেরকে। তার বোতাম খোলা জ্যাকেটের ভিতর বিরাট একটা পিস্তল দেখা যাচ্ছে, বেল্টে গোঁজা।

কালাহান থামতে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল মিরান আর নিশা। তারপর আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এগিয়ে এল রানার ট্রাক লক্ষ্য করে।

ট্রাকের ক্যাব থেকে নেমে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল রানা, যে-কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি। ওর দু'হাত সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মোসাদের দুই এজেন্ট।

'কী ব্যাপার?' একটু কঠিন সুরেই জিজ্ঞেস করল রানা। 'রোডব্লক কী জন্যে?'

'না, মানে...' আমতা আমতা করছে মিরান, রীতিমত নার্ভাস।

'না-না, মিস্টার রানা, রোডব্লক হবে কেন,' তাড়াতাড়ি বলল নিশা। 'আগেই তো কথা হয়েছে আর্কটা উদ্ধার করে আমাদের হাতে তুলে দেবেন আপনি। তাই ওটা আমরা নিতে এসেছি আর কী।'

'হ্যাঁ, সেরকম কথা হয়েছে,' বলল রানা, লক্ষ করল মিরান আর নিশার পাঁচ গজ পিছনে দাঁড়িয়ে অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে এক পা থেকে আরেক পায়ে শরীরের ভর চাপাচ্ছে কালাহান। 'কিন্তু তাই বলে এভাবে? রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে কেড়ে নেয়ার ভঙ্গিতে? ওরা কারা?' শেষ প্রশ্নটা কালাহানের দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল ও।

'ওরা…বস্ পাঠিয়েছেন, রিইনফোর্সমেন্ট…আর্কটা ওরাই ইজরায়েলে নিয়ে যাবে, মাসুদ ভাই,' বলল মিরান।

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে রানা জানতে চাইল, 'কিন্তু আর্কটা কীসে তুলে নিয়ে যাবে তোমরা? তোমাদের সঙ্গে তো কোন ট্রাক দেখছি না।'

'আমাদের সিনিয়র এজেন্ট, মিস্টার কালাহান বলছেন ট্রাক সহ আর্কটা নিয়ে যাবেন তিনি…'

এই সময় ধৈর্য হারিয়ে ফেলল কালাহান। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসতে দেখা গেল তাকে। 'ওরে গবেট, এখনও তোমার মগজে ব্যাপারটা ঢোকেনি? তুমি একা, আর আমরা সাতজন। তুমি মোসাদের এক নম্বর শত্রু, আর আমরা তোমার যম। এভাবে তোমাকে একা পেয়ে আমরা কি করা উচিত, বোঝো না?'

শুধু এগিয়ে আসছে না কালাহান, বেল্ট থেকে বিরাট পিস্তলটা বের করে ফেলেছে সে, নিশা আর মিরানের মাঝখান দিয়ে তাক করছে রানার দিকে।

এরপর সবকিছু যেন স্লো মোশনে ঘটে গেল।

আলখেল্লার ভিতর হাত ঢোকাচ্ছে রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল নিশা। ঘুরে দাঁড়াবার সময় তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠছে, গলা চিরে আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল, 'না-আ-আ!' সেই সঙ্গে দু'হাত দু'দিকে মেলে দিয়ে কালাহানের পথ রোধ করে দাঁড়াল।

ইতিমধ্যে রানার বুক লক্ষ্য করে ট্রিগার টেনে দিয়েছে কালাহান। পরপর দু'বার।

কালাহান আর রানার মাঝখানে চলে আসায় দুটো বুলেটই নিশার বুক ভেঙে দিল। ঝাঁকি খেয়ে পিছনদিকে ছিটকে পড়ছে সে, তার মাথার উপর দিয়ে সাব মেশিন থেকে এক পশলা গুলি করল রানা।

অবাক বিস্ময়ে হাঁ করে নিজের ঝাঁঝরা বুক দেখছে কালাহান। 'বস্' বলে তার পিছনে আছাড় খেল বডিগার্ড। দ্বিতীয় জিপের সশস্ত্র মোসাদ গার্ডরা লিডার হারিয়ে কাভার নিতে ছুটল রাস্তার ধারের বোল্ডার লক্ষ্য করে। তাদেরকে ধাওয়া করল সাবমেশিন গানের আরেক ঝাঁক তপ্ত সীসা।

হাঁটুর নীচে গুলি খেয়ে সবগুলো মুখ থুবড়ে পড়ল। জান বাঁচাবার জন্য ক্রল করে বোল্ডারের আড়ালে লুকাচ্ছে, পিছনে ফেলে যাচ্ছে যার যার অস্ত্র।

এগিয়ে এসে নিশার পাশে হাঁটু গাড়ল রানা। নিশার মাথাটা কোলে নিয়ে রাস্তায় বসে রয়েছে মিরান। তার চোখে পানি নেই। তবে অন্তরের কান্না ধরা পড়ে গেল কেঁপে ওঠা ঠোঁটে। চেষ্টা করেও একটা শব্দ উচ্চারণ করতে পারল না সে।

'মুসা নবীর ওই আর্কটা কি এখনও তোমার দরকার?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

কথা না বলে মিরান শুধু মাথা নাড়ল।

'আমারও দরকার নেই,' বিড়বিড় করল রানা। 'ভিতেরা আসছে, ওটা বরং সে-ই নিয়ে যাক।'

এই প্রথম কথা বলল মিরান, 'যাক।' তারপর মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল। 'আপনার সাব মেশিনে গুলি নেই, মাসুদ ভাই। আপনি বরং আমার পিস্তলটা নিয়ে এখনই এখান থেকে চলে যান।'

মাথা নাড়ল রানা। 'চলেই যখন যাচ্ছি, আমার কোন অস্ত্র দরকার নেই।'

আর্কটা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই রানার। ভিতেরা যদি আসে তো নিয়ে যাবে, না এলেও এখানে ওটা পড়ে থাকবে না–নিশ্চয়ই ভালো কোন ব্যবস্থাই হবে ওটার।

মিরানের মাথায় একবার হাত বুলাল রানা, তারপর মোসাদের একটা জিপ নিয়ে রওনা হয়ে গেল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কায়রোয়, ফাহিমার কাছে পৌঁছাতে চায় ও।

সন্ধ্যার অনেক পরে জিপ নিয়ে কায়রোয় পৌঁছাল রানা। পুরানো শহরে ঢুকে ঠিকানা ধরে রিয়াদের গ্যারেজটা খুঁজে বের করতে আরও প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লেগে গেল।

খোলাই পেল রানা গ্যারেজটাকে, ভিতরে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই চিনতে পারল, আলালের ট্রাক ওটা। সেটার পাশেই জিপ থামাল ও। ভাবল, যাক, ফাহিমাকে নিয়ে নিরাপদেই পৌঁছেছে তা হলে আলাল।

গ্যারেজের ভিতর, অন্ধকার এক কোণে মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিল আলাল, হঠাৎ তাকে সিধে হতে দেখে প্রায় চমকে উঠল রানা। 'আলাল? কী হয়েছে?'

কথা না বলে রানাকে পাশ কাটাল আলাল, গ্যারেজের দরজা বন্ধ করে ফিরে এল ওর সামনে। 'রাস্তায় ডিসটার্ব করছিল ইঞ্জিনটা। আমাকে পালাতে বলে ওদের হাতে ধরা দিয়েছেন ম্যাডাম।'

'ওহ্, গড!' মাথাটা ঘুরে উঠল রানার, মনে পড়ল ভিতেরার স্টাফ কারের পিছনে ফেলে রাখা তেরপলটা কী রকম উঁচু হয়ে ছিল। 'সব কথা খুলে বলো আমাকে।'

ধীরে ধীরে শুরু করল আলাল। সবশেষে বলল, 'একা শুধু

আমাকে পালাতে দেখে ট্রাকটার কোন ক্ষতি করেনি ওরা, আপনি থাকলে কী করত জানি না। ম্যাডামকে নিয়ে কনভয় চলে যাবার পর আড়াল থেকে বেরিয়ে আসি আমি। তারপর শর্টকাট একটা পথ ধরে ঘণ্টা তিনেক আগে এখানে পৌঁছেছি।'

'তারপর? সেই থেকে এখানে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছ?'

মাথা নাড়ল আলাল। 'জী-না, সার। এই একটু আগে বাইরে থেকে ফিরলাম।'

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। দেখা যাচ্ছে বিপদ ওর পিছু ছাড়ছে না। তবে এ-ও ঠিক যে শায়েস্তা করার জন্য ভিতেরার পিছু নিতেই হত ওকে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যোগ হলো ফাহিমাকে উদ্ধার পর্ব। আলালের দিকে ফিরল ও। 'তোমাকে একটা কাজ দিয়েছিলাম, মনে আছে? করেছ সেটা?'

মাথা নাড়ল আলাল। 'ভুলিনি, হাইফা বন্দরে যাওয়ার জন্যে একটা বোট ভাড়া করতে বলেছিলেন। আমার পরিচিত একটা ডকইয়ার্ডে গিয়েছিলাম আমি, কিন্তু বোট ভাড়া করিনি...'

'ভাল করেছ করোনি,' বলল রানা। 'এখন তার আর দরকার নেই। এখন খোঁজ নিয়ে জানতে হবে ফাহিমাকে নিয়ে ভিতেরা কোথায় যায়...'

'আগে শুনুন সার, কেন ভাড়া করিনি বোট,' রানার কথার মাঝখানেই শুরু করে দিল আলাল। 'আমি একজন জাহাজ মালিককে চিনি। চিনি মানে সে আমার একজন পুরানো বন্ধু। ওর কাছে গিয়ে বললাম যে আমি একটা জাহাজ ভাড়া করতে চাই।

'তারপর মহান আল্লাহর কী রহমত, এককথায় দু'কথায় বেরিয়ে পড়ল অবিশ্বাস্য একটা তথ্য।'

'অবিশ্বাস্য তথ্য। কী?'

'আমার নিজের দরকার, কাজেই সম্ভব হলে তার জাহাজটাই সে ভাড়া দিত আমাকে,' বলল আলাল। 'কিন্তু এখন আর তা

সম্ভব নয়, কারণ তার জাহাজটা এরইমধ্যে একদল আমেরিকান ভাড়া করেছে। শুনে আমার কৌতূহল হলো। জিজ্ঞেস করলাম, এই আমেরিকানদের সম্পর্কে কিছু জানো নাকি?'

রানার এদিকে ধৈর্য হারাবার উপক্রম। 'তোমার অবিশ্বাস্য তথ্যটা কোথায় গেল?'

'বন্ধু জানাল, আমেরিকানদের হয়ে জাহাজ ভাড়া করেছে একজন ফ্রেঞ্চ আর্কিওলজিস্ট। মোবাইল ফোনে আলাপ হয়েছে তার সঙ্গে।'

'কী বলছ তুমি আলাল!'

একগাল হেসে আলাল বলল, 'আপনি, সার, ঠিকই আন্দাজ করছেন। ফ্রেঞ্চ লোকটার নাম পল ভিতেরা।'

'ওহ্ ,গড! তারপর?'

'তারপর আমার বন্ধুকে আমাদের সমস্যার কথা জানালাম। শুনে বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করল সে, তারপর সাহায্য করতে রাজি হলো।'

'ঠিক কি ধরনের সাহায্য, বলেছে?' ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইল রানা।

'আমার বন্ধু জানাল, ভিতেরা তাকে আভাস দিয়েছে আফ্রিকার ওদিকে যাবে তারা। আফ্রিকার ঠিক কোথায় তা অবশ্য জানায়নি তাকে। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে, আপনাকে সে তার ওই জাহাজে গোপনে তুলে নিয়ে লুকিয়ে রাখবে। এখন আপনি চিন্তা করে বলুন, এই সাহায্য কি আপনার কোন কাজে লাগবে?'

'কী বলো কাজে লাগবে না!' এতক্ষণে হাসল রানা। 'এতটা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। 'এবার তুমি আমাকে তোমার বন্ধু আর তার জাহাজ সম্পর্কে একটা ধারণা দাও।'

'আমার বন্ধু, তার জাহাজীরাও বোম্বেটে–জলদস্যু; মানে এক সময় ছিল আর কী। এখন মাছ ধরে সৎ জীবন কাটায়। ওদের

বিশ্বাস করা যায়, মিস্টার রানা, সার। আমার বন্ধু, ক্যাপটেন মোম্বাসা, সম্মানী লোক–অতীতে সে যা-ই করে থাকুক।'

'কত দিতে হবে?'

মাথা নাড়ল আলাল। 'প্রায় সব কথাই বলা হয়েছে তাকে। কাজটা সে করতে রাজি হয়েছে আমি তার বন্ধু আর দেশকে ভালোবাসি বলে, বিনিময়ে কিছু নেবে না।'

'চলো তা হলে ট্রাক নিয়ে হারবারে যাই। তার আগে দুই সেট অ্যাকুয়ালাঙ কিনতে হবে।'

সতেরো

জিপসি উইন্ড-এর ব্রিজ। আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা। ভোরের প্রথম আলোয় দাঁড়িয়ে পাইপ মুখে সাগরের সারফেস দেখছে ক্যাপটেন মোম্বাসা। পানির ছিটা এসে লাগছে তার চকচকে আলকাতরার মত কালো মুখে, সেদিকে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই। তার মনে হচ্ছে পানির অন্ধকার গভীরে কী যেন একটা আছে, কী যেন একটা উঠব উঠব করছে, অথচ বোঝা যাচ্ছে না জিনিসটা কী হতে পারে।

ডেকে সশস্ত্র আমেরিকান মার্সেনারিরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

চোখ সরু করল মোম্বাসা। না, সাগরের সারফেসে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কান পেতে ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনল কিছুক্ষণ। তারপর রানা আর ফাহিমার কথা ভাবল। দু'জনেই আলালের

আপন লোক ওরা। কিন্তু একজন একদল মন্দলোকের হাতে বন্দি, আরেকজনকে সে গোপন একটা কেবিনে লুকিয়ে রেখেছে।

কাঠের বিরাট বাক্সটা নিয়ে লোকগুলো তার জাহাজে চড়ার আগে মোম্বাসা চিন্তা-ভাবনা করছিল, আলালের বন্ধু মাসুদ রানাকে আর কোনভাবে সাহায্য করা যায় কিনা। কিন্তু সশস্ত্র মার্সেনারিদের দেখে তার সে সাধ বাতাসে মিলিয়ে গেছে। এদের সঙ্গে লাগতে যাওয়া মানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা।

তা ছাড়া, কাঠের-বাক্সের ভিতর ওই কার্গোটা কেন যেন ভারি অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে তাকে। শুধু মনে হচ্ছে, তার মত পাপী একজন লোকের সংস্পর্শ থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওটাকে সরিয়ে ফেলা দরকার।

আবার সাগরের সারফেসে চোখ বুলাল ক্যাপটেন মোম্বাসা।

আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

একটা চোরা কেবিনে রয়েছে রানা, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ঝট্ করে উঠে বসল বাঙ্কের উপর। ঘুম ভাঙার কারণটা বুঝতে পারছে—ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে, স্টিমার চলছে না। বাঙ্ক থেকে নেমে, পোর্টহোলের দিকে ফিরল ও, শার্টটা টেনে নিয়ে গায়ে চড়াচ্ছে।

পোর্টহোলটা এত ছোট যে একটা হাতও বোধহয় গলবে না। সেটায় চোখ রেখে শুধু সাগর দেখতে পেল রানা। আকাশ মেঘে ঢাকা। বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা ছুটোছুটি। সাগরে কিছু নেই।

এরকম আরেকটা পোর্টহোল আছে এই কেবিনে। সেটায় চোখ রাখল রানা।

প্রথমে পানি ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না। তারপর, বড় একটা ঢেউ নিচু হতেই চকচকে রুপালি কাঠামোটা ধরা পড়ল ওর চোখে। ঝকঝকে নতুন একটা সাবমেরিন, চেহারা দেখে মনে

হচ্ছে অত্যাধুনিক। 'সর্বনাশ!' বিড় বিড় করল ও।

সাবমেরিনটা পুরোপুরি সারফেসে উঠে এল। এখনও অনেক দূরে ওটা। কনিং টাওয়ার থেকে একটা রাবারের ভেলা নামানো হচ্ছে পানিতে। একজন সশস্ত্র আমেরিকান রওনা হচ্ছে। বোঝা গেল বাহন বদল হতে চলেছে এখানে। ভিতেরার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারল না রানা। একবার পানির নীচে ডুব দিতে পারলে কেউ জানবে না কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে মুসা নবীর আর্ক। চিরতরে হারিয়ে যাবে ওটা পৃথিবীর বুক থেকে।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল রানা, চেষ্টা করে দেখবে সাবমেরিনটায় ওঠা যায় কিনা। কিন্তু তার আগে কেবিন থেকে বেরুতে হবে তো! ওটা বাইরে থেকে বন্ধ।

অ্যাকুয়ালাঙ পরতে তিন মিনিট পেরিয়ে গেল।

আলালের কাছ থেকে পাওয়া ছোট একটা পিস্তল পলিথিনে জড়িয়ে কোমরে গুঁজে রাখছে রানা, এই সময় দরজার তালায় চাবি ঢোকানর আওয়াজ শুনতে পেল। পিস্তলটা দরজার দিকে তাক করল ও।

দরজা খুলে নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকল ক্যাপটেন মোম্বাসা; তখুনি আবার সেটা বন্ধ করে দিল। রানা এরইমধ্যে অ্যাকুয়ালাঙ পরে ফেলেছে দেখে তার চেহারায় প্রশংসার ছাপ ফুটল। 'আপনি একা, ওরা বিশ-ত্রিশজন,' নিচু গলায় বলল সে। 'পানিতে নেমে কী করতে চান আপনি?'

হাসল রানা। 'বিশ-ত্রিশজন হওয়ায় সুবিধে হলো, একটা মাত্র ভেলায় চড়ে সাবমেরিনে উঠতে অনেক সময় লাগবে ওদের। কী করতে চাই? আমিও সাবমেরিনে উঠব। এই জাহাজে ওদের হাত থেকে মেয়েটিকে আমি উদ্ধার করতে পারব না। আমাকে ওদের সঙ্গে যেতে হবে। তারপর একটা সুযোগ তৈরি করে নিয়ে অ্যাকশনে যাব।'

'আপনি ঠিক জানেন এটা আত্মহত্যা নয়?' মোম্বাসার চোখ-মুখ থমথম করছে।

আবার হাসল রানা। 'এটাই আমার পেশা—মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা ধরা। আমি অভ্যস্ত।'

'তা হলে এই পথে বেরিয়ে যান…' বলে মেঝের দুটো তক্তা তুলে একপাশে সরিয়ে রাখল মোম্বাসা।

'অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনার এই সাহায্যের কথা কখনও আমি ভুলব না।' ফাঁক গলে ঝপ করে সাগরে নেমে গেল রানা।

ফাহিমাকে রাখা হয়েছিল হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একটা কেবিনে। বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে নিয়ে ব্রিজে উঠে এল ভিতেরা।

ময়নিহান কিছু বলতে যাচ্ছিল, এই সময় লোকজনের আওয়াজ শুনে ঘাড় ফেরাল সে। দেখল একদল মার্সেনারি হোল্ড থেকে আর্কটাকে তুলে আনছে। তাদেরকে নির্দেশ দিল সে, 'ভেলায় তুলে সাবমেরিনে নিয়ে যাও ওটাকে।' তারপর ভিতেরার দিকে তাকিয়ে বলল, 'রানা যদি সত্যি মারা গিয়ে থাকে, তা হলে মেয়েটিকে আমাদের আর কোন দরকার নেই।'

'আছে। আমার দরকার আছে,' জোর দিয়ে বলল ভিতেরা। 'হিমা আমার সঙ্গে যাচ্ছে।'

মাথা নাড়ল মেজর। 'অপ্রয়োজনীয় ঝামেলা।'

'ওকে আমার খানিকটা ক্ষতিপূরণ ধরে নিন, কিংবা যে ফি দেয়ার কথা হয়ে আছে, তার অংশবিশেষ। আর্কটা আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারছি, সেজন্যে অতিরিক্ত একটা পুরস্কার আমি চাইতে পারি না?'

তারপরও ইতস্তত করতে দেখা গেল মেজরকে।

'ঠিক আছে। মেয়েটা যদি আমাকে খুশি করতে ব্যর্থ হয়, আপনি ওকে হাঙরদের মুখে ফেলে দেবেন—আমি আপত্তি করব

না।'

'বেশ,' অবশেষে রাজি হলো মেজর ময়নিহান, একজন মার্সেনারিকে ইঙ্গিত করল ফাহিমাকে ভেলায় তোলার জন্য।

ডুব সাঁতার দিয়ে জিপসি উইন্ড থেকে দুশো গজ দূরে চলে এল রানা, তারপর সাবমেরিনের তলা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে সারফেসে মাথা তুলল। আকাশ আগের মতই মেঘে ঢাকা, বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে। অক্সিজেন মাস্ক আগেই খুলে ফেলেছে, ফলে পরিষ্কার দেখতে পেল সাবমেরিনের কনিং টাওয়ারের পাশ ঘেঁষে টহল দিচ্ছে একজন গার্ড, ওর কাছ থেকে মাত্র বিশ ফুট দূরে। আপন মনে মুচকি একটু হাসল রানা, ভাবল—তোমার ওই সাদা শার্ট আর জিনসের প্যান্টটা পেলে মন্দ হয় না।

আবার পানির নীচে ডুব দিল রানা। সময়ের একটা হিসাব ধরে মাথা তুলল ঠিক কনিং টাওয়ারের পাশে। গার্ড এই সময় পাশ কাটাচ্ছে ওটাকে। সাগর ছল-ছল-ছলাৎ শব্দে সাবমেরিনের গায়ে ছলকাচ্ছে, সেটার সুযোগ নিয়ে গার্ডের পিছনে উঠে পড়ল ও। এক হাতে গলাটা পেঁচিয়ে ধরে প্রথমে নিজের দিকে টানল তাকে, তারপর কিডনিতে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মেরে ফেলে দিল কনিং টাওয়ারের ভিতর।

টাওয়ারে ওঠা-নামার জন্য লোহার ধাপ আছে, সেগুলোকে এড়িয়ে উপর থেকে সোজা নীচের মেঝেতে খসে পড়ল লোকটা, ঘাড়টা বেকায়দা মত মোচড় খাওয়ায় মটকে গেছে বিচ্ছিরি একটা শব্দ তুলে। দুই সেকেন্ড পর তার পাশে নেমে এসে রানা তার পালস পেল না।

গোটা সাবমেরিন খালি মনে হলো ওর। কন্ট্রোল কেবিনে ঢুকে বুঝতে পারল মডেলটা একেবারে নতুন আর আধুনিক, প্রয়োজনে মানুষের সাহায্য না নিয়ে কমপিউটার একাই এটাকে চালাতে

পারবে।

লাশটা স্টোর রুমে ঢোকাল রানা। আপাতত নিজেও তার ড্রেস পরে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নিল।

সাবমেরিনে ফিরে এসে কমিউনিকেশন রুমে ঢুকল ভিতেরা। মাথায় হেডফোন পরল, তারপর মাইক্রোফোন তুলে একটা কল সিগনাল উচ্চারণ করল। খানিক পর শব্দজটের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে শুনল একটা কণ্ঠস্বর। বাচনভঙ্গি আমেরিকান।

'ইউএস বেস-এর মেজর বোনি? আমি ভিতেরা।'

অপরপ্রান্তের জবাব অস্পষ্ট 'আপনার কথামতই সমস্ত প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে, মঁশিয়ে ভিতেরা

'চমৎকার!' মাথা থেকে হেডফোন খুলে ফেলল ভিতেরা। রেডিও রুম থেকে বেরিয়ে সামনের একটা কেবিনের দিকে যাচ্ছে, যেখানে আটকে রাখা হয়েছে ফাহিমাকে। হাসিমুখে কামরাটার ভিতর ঢুকল সে। থমথমে চেহারা নিয়ে একটা বাঙ্কে বসে রয়েছে ফাহিমা। ভিতেরা এগিয়ে আসছে বুঝতে পারলেও মুখ তুলে তাকাল না।

হাত বাড়িয়ে তার চিবুক স্পর্শ করল ভিতেরা। ঝট্ করে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল ফাহিমা। 'তোমার চোখ দুটো ভারি সুন্দর, হিমা। ওগুলোকে তোমার লুকিয়ে রাখা উচিত নয়।'

ধীরে ধীরে ফিরল ফাহিমা। 'আপনাকে আমি ঘৃণা করি। এত ঘৃণা...এত ঘৃণা কেউ বোধহয় কাউকে করতে পারে না!' হাঁপিয়ে উঠল সে।

হাসল ভিতেরা। 'তুমি দেখছি এখনও আমার ওপর খেপে আছ। ঠিক আছে, পাওনা বুঝে নিতে পরে আসব আমি।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করল ভিতেরা। সরু প্যাসেজ ধরে এগোচ্ছে। কয়েকজন সশস্ত্র আমেরিকানকে আসতে

দেখা গেল পিছন থেকে, তাদের সামনে রয়েছে ময়নিহান। চোখ-মুখ দেখলেই বোঝা যায়, রেগে আগুন হয়ে আছে লোকটা।

'এর ব্যাখ্যাটা কী, মঁশিয়ে ভিতেরা?' পাশে এসে জানতে চাইল সে, স্টোররুমের বন্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'কোনটার, মেজর?' বাধ্য হয়ে ভিতেরাকেও দাঁড়াতে হলো।

ময়নিহানকে দেখে মনে হলো ভিতেরাকে আঘাত করার ঝোঁকটা দমিয়ে রাখতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে তার। 'শুনলাম ক্যাপটেনকে আপনি নির্দেশ দিয়েছেন আফ্রিকান উপকূলের কাছাকাছি আল বাসরা দ্বীপে সাবমেরিন নিয়ে যেতে হবে?'

স্টোর রুমের ভিতর দাঁড়িয়ে ওদের কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে রানা। আল বাসরা! অনেকগুলো জায়গার নাম বলেছিলেন আলালের পরিচিত সেই ইমাম, তার মধ্যে এই নামটাও ছিল। ঠিক কী যেন বলেছিলেন ভদ্রলোক? আর্কের ভিতর বস্তুটা এই গ্রহের নাও হতে পারে...ওটা এক্সপোজ হলে যে ঘটনা হাজার বছর পর ঘটার কথা তা হয়তো তৎক্ষণাৎ ঘটে যাবে...

'হ্যাঁ,' শান্ত সুরে জবাব দিচ্ছে ভিতেরা। 'ক্যাপটেনকে সেই নির্দেশই দিয়েছি আমি।'

'কেন? কোন্ অধিকারে?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল ময়নিহান। 'আমার ধারণা ছিল আর্ক নিয়ে ইউরোপের কোনও দেশে যাচ্ছি আমরা, ওখান থেকে প্লেন ধরে সোজা আমেরিকায় ফিরব। কিন্তু...নিজেকে কী ভাবেন বলুন তো, মার্কিন নৌ-বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ?'

'মেজর, মাথা ঠাণ্ডা করুন,' বলল ভিতেরা। 'আচ্ছা, একটা কথা ভেবে দেখেছেন কি? আর্কটা যদি খালি হয়? মরমন প্রিস্টদের মুখ দেখাতে পারবেন? মার্কিন ব্যবসায়ী গোষ্ঠিকেই বা কী ব্যাখ্যা দেবেন?'

'আর্ক...খালি?' ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেল মেজর

ময়নিহান। 'কী বলছেন আপনি, মঁশিয়ে? আপনি কি চান আমি আত্মহত্যা করি?'

'শান্ত হন, মেজর। ওটা খালি কিনা, ভেতরে যদি কিছু থাকে সেটা কী জিনিস ইত্যাদি সব ব্যাপারেই আমরা আমেরিকায় পৌঁছবার আগে নিশ্চিত হব। এটাই নিয়ম। সেজন্যে নিরাপদ, নির্জন একটা জায়গা দরকার। ওই দ্বীপ, আল বাসরা, ইউ.এস নেভির ছোট একটা সাপ্লাই বেস। ওই ঘাঁটির শতকরা পঁচাত্তরজনই মরমন। তা ছাড়া, প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য ওখানে একটা এয়ারস্ট্রিপও আছে। ওখানে কেউ আমাদেরকে বিরক্ত করবে না।'

আশপাশে কেউ নেই দেখে একটা সাপ্লাই কেবিনের ভিতর ঢুকে পড়ল ভিতেরা। কাঠের লম্বা বাক্সটা এখানেই রাখা হয়েছে।

ওটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে। রহস্যটা কী? কতটুকু কী জানাবার ক্ষমতা আছে তোমার? খোদার রহস্য প্রকাশ করতে পারবে? সৃষ্টির রহস্য তোমার জানা?

হাত বাড়িয়ে বাক্সটা ছুঁলো ভিতেরা। বাক্সটা কাঁপছে। এটা কি তার কল্পনা? কী সব আওয়াজ বেরুচ্ছে বাক্সের ভিতর থেকে। সত্যি, নাকি ভুল শুনছে সে?

হাতটা এখনও বাক্সের গায়ে, চোখ বুজল ভিতেরা। অন্ধকার টানেল দেখতে পাচ্ছে সে। টানেলের ভিতর সময়ের অস্তিত্ব নেই। ওখানে সবই নিত্য এবং বর্তমান। চোখ খুলল সে। আঙুলের ডগা শিরশির করে উঠল।

আর বেশি দেরি নেই, ভাবল ভিতেরা। আর দেরি নেই!

কাপড়চোপড় খুলে নিয়ে লাশটাকে স্টোররুমের উঁচু তাকে তুলে দিয়েছে রানা। ওর পরনে এখন সাদা শার্ট আর জিনসের প্যান্ট।

ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করা, একটা ফোমের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সেটা ভাঙল পরদিন সকালে। ইঞ্জিনের আওয়াজ, লোকজনের চলাফেরা আর কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারল দ্বীপ আল বাসরায় ভিড়তে যাচ্ছে সাবমেরিন।

খানিক পর ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। সিঁড়ির ধাপ বেয়ে কনিং টাওয়ারে উঠে যাচ্ছে লোকজন। সবাই খুব উত্তেজিত—আর্কের ভিতর কী আছে দেখবে, দেখবে অলৌকিক কিছু ঘটে কিনা। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সাবমেরিনটা পাহারা দেওয়ার মত আর কাউকেই পাওয়া যাচ্ছে না।

'পাহারা দেয়ার দরকারটা কী?' জিজ্ঞেস করল ভিতেরা। 'এ-ধরনের কিছু দেখার সুযোগ দু'পাঁচ হাজার বছরে এক-আধবারই পায় মানুষ। কাকে আপনি বঞ্চিত করবেন?'

রানা শুনতে পেল সাবমেরিন ছেড়ে চলে গেল সবাই।

বিশ মিনিট অপেক্ষা করল ও। সাবমেরিনের ভিতর কোন শব্দ নেই। দরজা খুলে সাবধানে বেরুল ও। লোহার ধাপ বেয়ে কনিং টাওয়ারে চড়ল। সাবমেরিনের বাইরে বেরিয়ে দেখল রেইলিং দিয়ে ঘেরা ডকে আরও দুটো সাবমেরিন রয়েছে, তবে সেগুলো আকারে অনেক বড়, পুরানো মডেলের। ডক সম্পূর্ণ খালি, অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সাবমেরিন থেকে নেমে ভিতেরা আর তার মার্কিন বন্ধুরা আর্কটা কোন দিকে নিয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছে না। আগের মতই কালো শামিয়ানা হয়ে আছে গোটা আকাশ, থেকে থেকে ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ।

হেঁটে সাবমেরিনের নাকের কাছাকাছি চলে এল রানা, তারপর লাফ দিয়ে ডকে নামল। ডক এলাকা থেকে বেরিয়ে এসে উঁচু একটা গাছে চড়ল।

দূরে, কয়েকটা বালিয়াড়ির পর, মরমন আর মার্কিন সৈন্যের গোটা দলটাকে দেখতে পেল রানা। সবচেয়ে আগে রয়েছে

আর্কটা, কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বাহকদের মধ্যে শুধু মরমনরা নয়, দ্বীপের মার্কিন সৈন্যরাও রয়েছে। তাদের সামনে রয়েছে ভিতেরা আর ময়নিহান।

আর্কের পিছনে সৈন্যদের দীর্ঘ মিছিল। ফাহিমাকেও দেখতে পেল রানা, বাতাসে ফুলে ফুলে উঠছে তার গাউন। কয়েকজন মার্সেনারি পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

হঠাৎ হোঁচট খেলো একজন বাহক। তার পিছনের সৈনিকটি হুমড়ি খেয়ে পড়তে যাচ্ছিল। তাদের কাঁধের উপর আর্কটা একটু কাত হয়ে গেল, রানার ভয় হলো পড়ে না যায়।

ঠিক সেই মুহূর্তে যেন জগৎ সংসার দুলে উঠল। গাছ থেকে পড়ে যাচ্ছে রানা। যে ডালটা ধরে আছে, আর যে ডালে পা রেখে দাঁড়িয়েছে, দুটোই জ্যান্ত প্রাণীর মত ঝাঁকি দিয়ে ওর হাত আর পা থেকে নিজেদেরকে যেন মুক্ত করে নিতে চাইছে।

খসে পড়ল রানা। মরিয়া হয়ে নীচের অন্য একটা ডাল ধরে ফেলল, ধরে ঝুলতে থাকল। এই সময় চট করে একবার চোখ তুলে বালিয়াড়ির দিকে তাকাতে দেখতে পেল আর্কটাকে পড়তে দেয়নি বাহকরা। তবে স্থির হয়ে কেউই ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না।

ভূমিকম্প? নিশ্চয়ই তাই! পাঁচ কি ছয় সেকেন্ড ছিল কম্পনটা। কাকতালীয় কোন ব্যাপার? প্রাচীন আর্কের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই?

আবার গাছের একটা ডালে উঠে দাঁড়িয়েছে রানা। ইউনিফর্ম পরা সৈন্যরা আতঙ্কে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, কমান্ডারের ধমক খেয়ে আর ভিতেরার আশ্বাস শুনে আবার আর্কটার পিছু নিল তারা। তবে সবাই নয়।

তিনজন সৈন্য নিজেদের একটা তাঁবুতে ঢুকল। দু'জন ডকের শেষ মাথায় এসে একটা লঞ্চে চড়ে নীচে নেমে গেল। নিঃসঙ্গ

একজন সোজা হেঁটে এসে ডকের কিনারায় বসল, চকচকে রুপালি সাবমেরিনটাকে দেখছে। হাতের গ্রেনেড লঞ্চারটা পাশে নামিয়ে রাখল সে।

দুঃখিত, ভাবল রানা। তোমার ওই ইউনিফর্মটা আমার দরকার যে!

আঠারো

প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড কুঁড়েগুলোর একটায় শেষ বিকেলের দিকে ভিতেরার সঙ্গে দেখা করতে এল দ্বীপের কমান্ডার মেজর বোনি। দু'জনেই তারা ইহুদি, সেই সূত্রে আর্কটার ধর্মীয় মর্যাদা এবং সম্ভাব্য ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন–এটা ছাড়া তাদের মধ্যে আর কোন সম্পর্ক বা মিল নেই। এটুকুই অবশ্য যথেষ্ট বিবেচিত হলো, একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা বিদেশী আরেকজন আর্কিওলজিস্টের অনুরোধ মেনে নিতে আপত্তি বা অনাগ্রহ প্রকাশ করেনি।

তাদের আলোচনায় মেজর ময়নিহানের উপস্থিতি মোটেও পছন্দ করল না ভিতেরা। তার ধারণা ওই গবেট লোকটা অপ্রয়োজনীয় নানা প্রশ্ন তুলে পরিস্থিতিকে শুধু জটিল করে তুলবে। লোকটার অসহিষ্ণু ভাব এমনিতেই তাকে নার্ভাস করে তুলেছে।

মেজর বোনি বলল, 'আপনি যেভাবে বলেছেন, মঁশিয়ে, ঠিক সেভাবেই প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে।'

'গুড।' সন্তুষ্টচিত্তে মাথা ঝাঁকাল ভিতেরা। 'কিছু বাদ পড়েনি তো?'

'না।'

'তা হলে আর্কটা এখন ওখানে নিয়ে যেতে হয়।'

চট করে একবার মেজর ময়নিহানকে দেখে নিল মেজর বোনি। তারপর সে তার সৈনিকদের নির্দেশ দিল কন্টেইনারটিকে একটা ট্রাকে তোলার।

এতক্ষণ পর মুখ খুলল ময়নিহান। 'কী বলছেন উনি? কীসের প্রস্তুতি নিয়ে কথা বললেন আপনারা?'

'এটা নিয়ে আপনাকে উদ্বিগ্ন হতে হবে না, মিস্টার ময়নিহান,' বলল ভিতেরা।

'কে বলেছে? এই মিশনের প্রতিটি বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার অধিকার আছে আমার।'

'আর্কটা খুলতে যাচ্ছি আমি,' বলল ভিতেরা। 'আমি, একজন ধর্মপ্রাণ ইহুদি। আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, এই কাজের জন্য নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় পূর্বশর্ত আছে।'

'পূর্বশর্ত? কী ধরনের পূর্বশর্ত?'

'সে-সব আপনি আসলে শুনতে চান না, মিস্টার ময়নিহান। শুনলে কিছু বুঝবেনও না। শুধু শুধু মাথাটাকে ভারি করা হবে।'

'মঁশিয়ে ভিতেরা, দয়া করে আমার সঙ্গে কৌতুক করবেন না। মাঝে-মধ্যে সন্দেহ হয়, আপনি বোধহয় ভুলে যান কে এখানে চার্জে আছে।'

কাঠের লম্বা বাক্সটার দিকে একদৃষ্টে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ভিতেরা। 'আপনাকে বুঝতে হবে–এটা স্রেফ একটা বাক্স খোলার কাজ নয়। এর সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের রীতি আছে। আমরা বাক্সভর্তি হ্যান্ড গ্রেনেড নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি না। এটা সাধারণ কোন বিষয় নয়। এই ব্যাপারটার

সঙ্গে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আর তাঁর একজন খাস প্রতিনিধি জড়িত...'

'কী ধরনের আচার?'

'সেটা সময় হলেই আপনি দেখতে পাবেন, মিস্টার ময়নিহান। তবে, এ নিয়ে আপনাকে ভয় পেতে হবে না।'

'মঁশিয়ে ভিতেরা, আর্কটার যদি কোন ক্ষতি হয়, আমি নিজের হাতে আপনাকে ফাঁসিতে ঝোলাব।' দাঁতে দাঁত পিষল ময়নিহান।

সহাস্যে মাথা ঝাঁকাল ভিতেরা। 'ঠিক আছে।' জানালা দিয়ে জঙ্গলের দিকে তাকাল সে। ওই জঙ্গলের ভিতরই নিয়ে যাওয়া হবে আর্কটাকে–দ্বীপের আরেক প্রান্তে।

'মেয়েটা,' বলল ময়নিহান। 'আলগা সুতো দুচোখের বিষ আমার। মেয়েটাকে নিয়ে কী করব আমরা?'

'মেয়েটা? কার কথা বলছেন আপনি? এখানে আবার মেয়ে এল কোত্থেকে?' ভিতেরা যেন আকাশ থেকে পড়ল। আসলে আর্কটাকে নিয়ে সারাক্ষণ এত বেশি মাথা ঘামাচ্ছে লোকটা, বাস্তব দুনিয়া অনেকটাই তার কাছে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। এই মুহূর্তে আর্কটাই আমার ধ্যান, আমার জ্ঞান, ভাবল সে। মানবজাতির সমস্ত আবেগ আর তাদের যাবতীয় অভিজ্ঞতার আদৌ কি কোন তাৎপর্য আছে?

'আমি আপনার দুর্বলতার কথা বলছি,' তিক্তকণ্ঠে স্মরণ করিয়ে দিল ময়নিহান। 'ফাহিমা...আপনার হিমা ডার্লিং।'

হঠাৎ একটা নিষ্ঠুর আইডিয়া খেলে গেল ভিতেরার মাথায়। ইহুদি ধর্মের কোনও রীতি নয়, তবে এই রীতি দুনিয়ার বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে আজও।

না, এটাকে হত্যা বলা উচিত হবে না। কেউ তা বলেও না। বলা হয় কোরবানি। বলিদান। সাধারণত পশুই জবাই করা হয়। তবে মানুষও বলি দেওয়া হয়। নিশ্চয়ই নিয়ম আছে। উপকারও পাওয়া যায়। তা না হলে এখনও মাঝে মধ্যে শোনা যায়

কেন–অমুক জায়গায় মানুষ বলি দেওয়া হয়েছে? 'ফাহিমাকে আমার বিশেষ দরকার আছে। তাকে আমি ভালোবাসি। তাই ব্যবস্থা করছি সে যাতে সরাসরি সৃষ্টিকর্তার কাছে পৌঁছে যেতে পারে।'

ভিতেরা আর ময়নিহান একই জিপে রয়েছে। একটা গিরিপথের ভিতর দিয়ে ধীরগতিতে এগোচ্ছে গাড়ি।

এখনও এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েনি, অথচ আকাশে ঘন কালো মেঘের বিরতিহীন আনাগোনা চলছে, চলছে বজ্রপাত আর বিদ্যুতের ঝলকানি।

ময়নিহান বলল, 'আমার ভালো লাগছে না। এরকম আকাশ জন্মের পর থেকে কখনও আমি দেখিনি। বৃষ্টি নেই, তেমন বাতাসও নেই, অথচ গোটা আকাশে যেন আগুন জ্বলছে। তারপর একের পর এক ভূমিকম্প!'

'আপনি দেখেননি, আমি দেখেছি,' জবাব দিল ভিতেরা। 'এদিকের আবহাওয়া চিরকালই এরকম। আর ভূমিকম্পের কথা যদি বলেন–হবে না? ওই যে গোটা আরব দুনিয়ার মাটির তলা থেকে যেভাবে প্রতিদিন কোটি কোটি ব্যারেল তেল তোলা হচ্ছে, তার সম্ভাব্য পরিণতির কথাটা কখনও ভেবেছেন? একবার ভাবুন, তা হলেই ভূমিকম্পের কারণটাও পেয়ে যাবেন। তা ছাড়া, আমি মাত্র একবার টের পেয়েছি...'

'চার বার ভূমিকম্প হয়েছে,' জোর দিয়ে বলল ময়নিহান। 'পরের তিনবার মৃদু, তবে আপনি ছাড়া সবাই টের পেয়েছে।'

'ঠিক আছে। চারবারই। তাতে কী হলো?'

'না, ভাবছি, আর্কটার সঙ্গে এ-সবের সম্পর্ক আছে কি না...'

'নেই। কিংবা আছে।' হঠাৎ হেসে উঠল ভিতেরা। খানিকটা পাগল পাগল লাগছে তাকে। 'না হয় ধরে নিন আজই সবাই

আমরা মারা যাব, তাতে কী হবে? জীবনের কী মূল্য, বলুন? কী মূল্য?'

'আচ্ছা, এই সব আচার-অনুষ্ঠান কি একান্তই দরকার?'

'হ্যাঁ, অবশ্য পালনীয়।'

উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে কাঠের বাক্সটার দিকে তাকাল ময়নিহান, সামনের একটা ট্রাকে রয়েছে ওটা।

গিরিপথ থেকে উঠে এসে জঙ্গলে ঢুকল ট্রাক আর জিপ। দশ মিনিট পর ফাঁকা একটা জায়গায় পৌঁছাল ওরা। জায়গাটার একধারে সারি সারি প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড কুঁড়ে, আরেকধারে কয়েকটা তাঁবু, ক্যামোফ্লাজ সেন্টার, ব্যারাক, আর্মারড ভেহিকেল, রেডিও মাস্ট, টাওয়ার ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে। দুর্যোগের পূর্বাভাস থাকায় সৈন্যরা সবাই খুব ব্যস্ত। ডিপোর চারদিকে গর্বের সঙ্গে চোখ বুলাচ্ছে মেজর ময়নিহান।

ভিতেরা এ ব্যাপারে মোটেও সচেতন নয়। সে ফাঁকা জায়গাটার সামনে তাকিয়ে আছে। ওদিকে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকা একটা পাথর দেখা যাচ্ছে, চূড়াটা প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু হবে, মাথায় চ্যাপ্টা একটা আলগা পাথর বসানো।

ঢালের গায়ে প্রাচীন কোন আদিবাসী, যারা ইতিহাসের অন্ধকার গর্ভে চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে, ছোট ছোট কিছু ধাপ তৈরি করে রেখে গেছে।

পাথরটাকে দেখে মনে হয় যেন একটা প্রকাণ্ড বেদি—আর্কটাকে এখানে নিয়ে আসার সেটাই কারণ ভিতেরার। ফাহিমাকে বলি দেওয়ার আইডিয়াটা মাথায় আসার সময়ও প্রকৃতির তৈরি এই বেদির কথা মনে পড়েছিল তার। এটা হয়তো ঈশ্বরের ডিজাইন করা, ভাবল সে, কাজেই আর্কটা খোলার জন্য এরচেয়ে ভালো জায়গা আর হয় না।

'আপনি কি এখনই প্রস্তুতি নিতে চান?' মেজর বোনি জানতে

চাইল।

মাথা ঝাঁকাল ভিতেরা। বোনির পিছু নিয়ে একটা তাঁবুর দিকে এগোল সে।

'সাদা সিল্কের তাঁবু,' বলল সে, ছুঁয়ে দেখল।

'আপনি যেমন চেয়েছেন,' বলল মেজর বোনি।

'চমৎকার, সত্যি চমৎকার!' ভিতরে ঢুকল ভিতেরা। মেঝের মাঝখানে একটা চেস্ট রাখা হয়েছে। ঢাকনি তুলে ভিতরে তাকাল সে। অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি করা আলখেল্লায় জমকালো এমব্রয়ডারির কাজ করা হয়েছে। সন্তুষ্টচিত্তে সামনের দিকে ঝুঁকে হাত বুলাল ওটার গায়ে। তারপর বোনির দিকে তাকাল। 'আপনি আমার প্রতিটি অনুরোধ রক্ষা করেছেন। আমি সত্যি খুশি। মুসা নবী আপনার মঙ্গল করবেন।'

মেজর বোনির হাতে কী যেন একটা রয়েছে। ভিতেরাকে জিনিসটা দেখাল সে। পাঁচ ফুট লম্বা একটা আইভরি রড। মেজরের হাত থেকে নিয়ে জিনিসটার গায়ে সাদরে হাত বুলাচ্ছে ভিতেরা।

'পারফেক্ট,' বলল সে। 'নিয়মে বলা হয়েছে আর্কটা খুলতে হবে একটা আইভরি রড দিয়ে। যে খুলবে তার পরনে থাকতে হবে এরকম একটা আলখেল্লা। আপনি সত্যি জাদু দেখিয়েছেন, মেজর বোনি।'

'ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ আপনাকে!'

মাথার উপর দিয়ে গলিয়ে আলখেল্লাটা পরার সময় ভিতেরার দিকে তাকিয়ে থাকল বোনি। পোশাকটা যেন সম্পূর্ণ বদলে দিল মানুষটাকে–এই মুহূর্তে তাকে পূত-পবিত্র একজন সাধু-সন্ত বলেই মনে হচ্ছে।

'বাইরে কি এখন অন্ধকার?'

'আকাশ আজ সারাদিনই অন্ধকার,' বলল মেজর বোনি। 'এ কীসের লক্ষণ, মঁশিয়ে ভিতেরা?'

'ঈশ্বরকে ডাকুন, ভাই! নবীজীকে ডাকুন।' তারপর ভিতেরা বলল, 'অনুষ্ঠানটা হতে হবে ঠিক সূর্যাস্তের সময়।'

হাতঘড়ি দেখল মেজর বোনি। 'তার আর বেশি দেরি নেই।'

'আর্কটা?' জানতে চাইল ভিতেরা।

'এতক্ষণে আমার লোকজন চূড়ায় তুলে স্ল্যাবটার ওপর বসিয়েছে বাক্সটাকে।'

'গুড,' বলে আইভরি রডটা হাতে নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল ভিতেরা।

চারদিকে গিজগিজ করছে আমেরিকান সৈন্য। তাদের ভিড়ে মিশে আছে সাবমেরিনের ক্রু আর মরমন মার্সেনারিরাও। সবাই তারা ঘাড় ফিরিয়ে ভিতেরার দিকে তাকাল। দ্রুত পায়ে পাশে চলে এসে তার সঙ্গে হাঁটছে ময়নিহান, নিচু গলায় কী যেন বলছে তাকে।

ভিতেরা তার কথা শুনছেও না, জবাবও দিচ্ছে না। প্রাচীন ধাপগুলোর কাছে পৌঁছে গেল সে। আর ঠিক এই সময় বিকট শব্দে আকাশটা যেন ফেটে গেল।

কিছু না, খুব জোরে একটা বাজ পড়ল দ্বীপের আশপাশে কোথাও।

প্রথম ধাপে পা রাখল ভিতেরা। পশ্চিম দিগন্ত থেকে সরে গেল মেঘপুঞ্জ, যেন চোখের পলকে। গোলাপি আভা সহ সূর্যের আকৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠল—অস্ত যাচ্ছে।

দ্বীপে জেনারেটর আছে। কয়েকটা পোল খাড়া করে দুশো পাওয়ারের বালব জ্বালা হয়েছে সিঁড়ির পাশে।

দ্বিতীয় ধাপে উঠল ভিতেরা। তারপর চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা আমেরিকানদের দিকে চোখ বুলাল। ঠিক তখনই

কিছু একটা ঘটল। কিছু একটা তার মনোসংযোগে বিঘ্ন ঘটাল। তাকে ফিরিয়ে আনল বাস্তব জগতে। একটা নড়াচড়া, একটা ছায়া, নিশ্চিত নয় আসলে কী

ঝট করে আবার তাকাতে দলছুট একজন সৈনিকের আচরণ অদ্ভুত লাগল ভিতেরার। লোকটার হাঁটার মধ্যে কেমন একটা অস্বাভাবিক আত্মবিশ্বাস। মাথায় হেলমেটটা পরেছে একটু বাঁকা করে, যেন নিজের চেহারা লুকাতে চায়। তবে শুধু এটুকু তার মনোসংযোগ কেড়ে নেয়নি। সৈনিকটার মধ্যে তার পরিচিত কী যেন একটা আছে

কী? ভিতেরা খেয়াল করল, গ্রেনেড লঞ্চারের ওজন অনায়াসে বহন করছে সৈনিক। তবে ইউনিফর্মটা একটু বেশি আঁটসাঁট।

পরমুহূর্তে সৈনিকটাকে হারিয়ে ফেলল ভিতেরা। হয় ঝোপের ভিতর ঢুকে পড়েছে সে, না হয় উঁচু টিলাটার আড়ালে চলে গেছে।

মাসুদ রানা? ভাবল ভিতেরা। তা কী করে হয়!

বেদির উপর উঠে এল ভিতেরা। সমতল আলগা পাথরের উপর রাখা হয়েছে আর্কটা। ওটার পাশেই শুয়ে রয়েছে ফাহিমা, হাত আর পা বাঁধা। আর্ক আর ফাহিমার মাঝখানে গরু জবাই করার উপযোগী বড় একটা ছোরা পড়ে রয়েছে।

'ঈশ্বরকে ডাকো, হিমা,' বিড়বিড় করে বলল ভিতেরা। 'ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্যে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার সুযোগ পেয়েছ, সেজন্যে খুশি হও আর কৃতজ্ঞ বোধ করো।'

'বেজন্মা কুত্তা!' চেঁচিয়ে উঠল ফাহিমা। 'এই শুয়োর, সুযোগটা তুই নিজে কেন নিচ্ছিস না? আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তুই কেন নিজের গলায় ছুরি চালাচ্ছিস না?'

'ওরে মূর্খ নারী, ঈশ্বরের কী ইচ্ছে তার তুই কী বুঝবি!' হাসল ভিতেরা, ছোরাটা তুলে নিয়ে ধার পরীক্ষা করছে। 'ঈশ্বর আমাকে দিয়ে আর্কটা খোলাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তারপর কী ঘটবে,

তোর দেখার সুযোগ হবে না।' ছোরাটা মাথার পাশে তুলল সে, ফাহিমার উন্মুক্ত গলায় কোপ মারতে যাচ্ছে।

সবকিছুই একটা প্ল্যান ধরে করছে রানা।

গাছ থেকে নেমে এসে নিঃশব্দ পায়ে মার্কিন সৈন্যটার পিছনে এসে দাঁড়াল ও, ঝুঁকে তার পাশ থেকে গ্রেনেড লঞ্চারটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিল, তারপর অস্ত্রের মুখে লোকটাকে সাবমেরিনে এনে তুলল।

লোকটাকে প্রথমে অজ্ঞান করে নিল রানা, তারপর আটকে রাখল স্টোর রুমে। তার পাউচে পুরো এক ডজন, অর্থাৎ বারোটা গ্রেনেড রয়েছে, সবগুলো নিজের পকেটে ভরে নিল ও। মরমন লোকটার লাশও আছে এই একই স্টোর রুমে।

বাইরে থেকে স্টোররুম বন্ধ করে কন্ট্রোল রুমে চলে এল রানা। আগেই কন্ট্রোল কনসোলটা দেখেছে ও, জানে কমপিউটারকে দিয়ে সাবমেরিনটা চালানো যায়, তারপরও স্টার্ট দেওয়ার পর কনসোলের এটা-সেটা নেড়ে ম্যানুয়ালি চালাবার চেষ্টা করল।

কয়েক মিনিট পরই কী থেকে কী হয় বুঝে নিল রানা। এর মধ্যে খুব যে একটা কৃতিত্ব আছে ওর, তা নয়। সাবমেরিন চালাবার অভিজ্ঞতা আছে ওর, এখানে সেটাই ওকে সাহায্য করল।

সাবমেরিন নিয়ে দ্বীপের পিছন দিকটায় চলে এল রানা। এর পিছনে একটা চিন্তাই কাজ করছে–ফাহিমাকে উদ্ধার করতে পারলে পালাবার সময় এটা দরকার হবে।

সাবমেরিনটাকে একটা প্রাকৃতিক গুহার ভিতর ঢুকিয়ে রেখে এসেছে রানা। গুহাটার খানিকটা জলমগ্ন। পাশাপাশি একই রকম গুহা আরও অনেকগুলো আছে, কাজেই সার্চ করলেও সহজে

ওটাকে কেউ খুঁজে পাবে না।

গুহা থেকে বেরিয়ে কয়েকটা বালিয়াড়ি পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে রানা, তারপর দূরত্ব কমাবার জন্য সংক্ষিপ্ত পথ ধরেছে–একটা পাহাড় টপকাতে হয়েছে ওকে, লাফ দিয়ে পার হতে হয়েছে একাধিক গভীর খাদ, ঝোপ-ঝাড় ডিঙাতে গিয়ে পায়ে শিকড় বেঁধে যাওয়ায় আছাড় খেয়েছে দু'তিনবার। অবশেষে অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচিত ফাঁকা জায়গাটায় পৌঁছেছে ও। ঝোপ আর উঁচু টিলাগুলোর পিছনে গা ঢাকা দিয়ে ভালো একটা পজিশনের খোঁজে এগোচ্ছে, এই সময় দেখল ফাহিমাকে জবাই করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ভিতেরা।

দ্রুত একটা নির্জন টিলার মাথায় উঠে এল রানা। চূড়াটায় বেশ কিছু বড় আকৃতির পাথর ছড়িয়ে রয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে এরচেয়ে নিরাপদ কাভার আশা করা যায় না। পজিশন নিয়ে তৈরি হলো ও। গ্রেনেড লঞ্চারটা সরাসরি ভিতেরার মাথায় তাক করল।

ফাহিমার গলায় ছুরি চালাতে যাচ্ছে ভিতেরা।

'সাবধান, ভিতেরা–হল্ট! একদম স্থির পাথর হয়ে যাও! অকস্মাৎ বজ্রকণ্ঠে গর্জে উঠল রানা। 'তোমাদের সবাইকে বলছি–খবরদার, কেউ এক পা এগোবে না আমার দিকে!' প্রথম কাজ ফাহিমাকে বাঁচাতে হবে। কাছেই কোথাও একটা বাজ পড়ল, রানার হুঙ্কার যেন ছাপিয়ে উঠল সেটাকেও। 'কেউ এক চুল নড়বে না। যদি দেখি নড়েছ, পয়গম্বরের ওই বাক্স আমি উড়িয়ে দেব।' তাতে তিনি বোধহয় খুশিই হবেন, ভাবল ও, আদৌ যদি তা সম্ভব হয় আর কী।

'মাসুদ রানা, তুমি সত্যি আমাকে অবাক করলে! জীবনকে তুমি এত ভালোবাস? এভাবে বারবার মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে তুমি

কি অমর হয়ে থাকতে চাও?'

ময়নিহানের মনে হলো, ফালতু কথা বলে সময় নষ্ট করছে ভিতেরা। 'মিস্টার রানা,' বলল সে। 'কোথায় এসেছেন, জানেন তো? এখান থেকে পালাতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন?'

'সেটা সময় হলেই দেখতে পাবে। এখন মন দিয়ে শোনো। আমি শুধু দুটো জিনিস চাই। আমার এই দাবি পূরণ করা হলে আমি তোমাদের কোন ক্ষতি না করে এখান থেকে চলে যাব।'

'চান?' হেসে উঠল মেজর ময়নিহান। 'এই চাওয়ার অধিকার কে দিল আপনাকে?'

'ফাহিমাকে ছেড়ে দিতে হবে,' নিজের কথা বলে চলেছে রানা। 'আর আমার বন্ধুর খুনি পল ভিতেরাকে আমার হাতে তুলে দিতে হবে।'

'আর আর্কটা?' জানতে চাইল ময়নিহান। 'ওটা আপনার দরকার নেই?'

'না, ওটার প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই। তা যদি থাকত, আমি কি ওটাকে ভিতেরার জন্য পথে ফেলে রেখে আসতাম?'

ভিতেরার দিকে তাকাল ময়নিহান।

'কোন পাগলও তো এভাবে কথা বলে না!' খেঁকিয়ে উঠল ভিতেরা।

জবাবে একটা গ্রেনেড ছুঁড়ল রানা। ফাঁকা জায়গাটার একপাশে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড কুঁড়েঘর, তার একটাকে টার্গেট করল ও। কুঁড়েটার সামনে একটা জিপ রয়েছে, পাশে রয়েছে একটা রেডিও মাস্ট, পিছনদিকে একটা উঁচু ওয়াচ টাওয়ার—সবগুলো একসঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো।

আতঙ্কে ছুটোছুটি শুরু করল ঘাঁটির সৈন্যরা, নিরাপদ আড়াল পাবার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছে সবাই।

'বাঁধন খুলে ফাহিমাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও,' হুকুমের সুরে বলল রানা। 'তা না হলে ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে আর্কটা উড়িয়ে দেব।'

জবাবে কিছু বলতে যাচ্ছিল ভিতেরা, তাতে বাধা দিল মেজর ময়নিহান। 'আপনি আর্ক নিয়ে ধর্মীয় আচার পালন করুন, এদিকটা আমাকে দেখতে দিন।' মার্সেনারিদের দিকে ফিরল সে। 'কোনও হামলা নয়। কোনও গুলি নয়। কোনও চালাকি নয়। যাও, মেয়েটির বাঁধন খুলে দাও। তারপর তাকে চলে যেতে দাও মিস্টার রানার কাছে।'

দাঁতে দাঁত চেপে ভিতেরা বলল, 'এ-সব করে তুমি কিন্তু বাঁচতে পারবে না, রানা।'

'বাঁচা-মরা আল্লাহর ইচ্ছা,' বলল রানা। 'তুমি ঘামছ নাকি, ভিতেরা?'

রানার কথার জবাব না দিয়ে ময়নিহানের দিকে তাকাল ভিতেরা। 'ঠিক আছে, বলি দেয়ার দরকার নেই। আমি বরং তা হলে আসল কাজটা শুরু করি।'

'কিন্তু মিস্টার রানা যে বলছেন আপনাকে তাঁর হাতে তুলে দিতে হবে, তার কী হবে?' জানতে চাইল ময়নিহান।

যেন শুনতে পায়নি, ময়নিহানের দিকে পিছন ফিরে নিজের কাজ শুরু করে দিল ভিতেরা।

মেজর ময়নিহানের নির্দেশ পেয়ে পাথুরে টিলাটার দিকে এগোচ্ছে দু'জন মার্সেনারি, ওই টিলার মাথায় একটা বেদির উপর হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে ফাহিমাকে।

প্রাচীন হিব্রু ভাষার ধর্মীয় গানগুলো মুখস্থ করে রেখেছে ভিতেরা। এইসব গান বা মন্ত্র একটা প্রাচীন পার্চমেন্টে পেয়েছে সে, যে পার্চমেন্টে হেডপিসটার ছবি আঁকা ছিল। নিচু স্বরে মন্ত্র আওড়াচ্ছে সে, সুরটা একঘেয়ে।

শুধু নিজের কণ্ঠস্বর নয়, আর্ক থেকে বেরিয়ে আসা গায়েবী একটা আওয়াজও ঢুকছে তার কানে। সেটা যেমন ভরাট, তেমনি নিবিড়; অন্ধকারকে জ্যান্ত করে তুলছে। ভিতেরার সারা শরীরে রক্ত ছলকাচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে সে—আর্কের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা শব্দ তার রক্তে ঢুকল কীভাবে! ব্যাপারটা বিস্মিত আর মুগ্ধ করছে তাকে, আহ্বান জানাচ্ছে উপলব্ধি করার।

প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু পাথুরে টিলার গোড়ায় পৌঁছাল দুই আমেরিকান মরমন। শুয়ে থাকায় এখান থেকে তারা ফাহিমাকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না, তবে মন্ত্র পাঠরত ভিতেরাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

গাইতে গাইতে সামনে-পিছনে দুলতে শুরু করল ভিতেরা। তার কানে গায়েবী শব্দ পরিষ্কার বাজছে।

আমি ক্ষমতা! আমি জ্ঞান!

ঘাড় ফিরিয়ে লোকজনদের দিকে তাকিয়ে রেগে যাচ্ছে ভিতেরা। আশ্চর্য, ওদের চেহারায় উল্লাস নেই কেন? তা হলে কি একা শুধু সে-ই শুনতে পাচ্ছে আর্কের বাণী?

সহস্র বছরের ধুলো আর অবহেলা সত্ত্বেও, এটার মত সুন্দর কিছু আগে কখনও দেখেনি ভিতেরা। জিনিসটা থেকে আশ্চর্য একটা আভা, স্বর্গীয় একটা জ্যোতিই হবে, বেরিয়ে আসছে।

দশ-পনের ধাপ উপরে ওঠার পর দুই মরমন মার্সেনারি প্রায় একযোগে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভিতেরার ছন্দবদ্ধ দোল খাওয়া আর সুরেলা মন্ত্রপাঠ তাদেরকে যেন সম্মোহিত করে ফেলেছে।

এ-ধরনের একটা পরিস্থিতির জন্য তৈরি ছিল রানা।

'ওরা অযথা দেরি করছে!' আবার গর্জে উঠল ও। 'দশ সেকেন্ডের মধ্যে বেদির কাছে পৌঁছাতে না পারলে গ্রেনেড ছুঁড়ব আমি।'

রানা থামতেই হুঙ্কার ছাড়ল মেজর ময়নিহান, 'টিমোথি আর বোথাম, ওখানে তোমরা সঙ সেজে দাঁড়িয়ে আছ কীজন্যে?'

টিমোথি আ বোথাম একচুল নড়ছে না।

'ওরে বেজন্মারা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস না?' ময়নিহান ক্ষোভে আর দুঃখে ফেটে পড়ল। 'আর দশ সেকেন্ড পর যে বাজ পড়বে মাথায়!'

পরমুহূর্তে বাতাসে শিস কেটে ছুটে এল আরেকটা গ্রেনেড। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজে কেঁপে উঠল যেন গোটা সাপ্লাই ক্যাম্প। আরেকটা প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড কুঁড়ে, একজোড়া জিপ, দুটো তাঁবু, একটা পানির ট্যাংক ভেঙেচুরে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

এতক্ষণে ঘোর ভাঙল মরমন মার্সেনারিদের, বাকি ধাপ কটা দ্রুত পেরিয়ে বেদির সামনে পৌঁছাল তারা, হাত চালিয়ে ফাহিমার বাঁধনগুলো খুলে দিল। হাত-পা ঘন ঘন মুচড়ে সেগুলো আগেই ঢিলে করে রেখেছিল ফাহিমা, পুরোপুরি মুক্ত হতে কারও সাহায্য ছাড়াই লাফ দিয়ে নেমে পড়ল বেদি থেকে, তারপর তরতর করে ধাপ বেয়ে নীচে নেমে দে ছুট।

একটা কম্পন অনুভব করল ভিতেরা। পরিষ্কার বোঝা গেল কম্পনটা আর্কের ভিতর তৈরি হচ্ছে, কিংবা উৎসটা ওটার ভিতর আছে। পাথরের ছোট পাহাড়, বেদি সহ, থরথর করে কাঁপছে। তারপর দুলতে লাগল বালব সহ পোলগুলো, ফাঁকা জায়গার কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা গাছপালা। দুলে উঠল সারি সারি তাঁবু, প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড কুঁড়ে। পায়ের নীচে মাটি।

ভিতেরা অনুভব করল কাঁপনটা তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে, অণু-পরমাণুতে পরিণত করে শূন্যে পাক খাওয়াচ্ছে। কিন্তু শূন্যতা বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই, অস্তিত্ব নেই সময়ের।

আছে শুধু ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য আর্কটা।

'আমার সঙ্গে কথা বলুন!' প্রার্থনা করল ভিতেরা। 'আমাকে সব জানান! বলুন, অস্তিত্বের রহস্য কী?'

শুধু মুখ নয়, ভিতেরার মনে হলো তার প্রতিটি লোমকূপ আর রক্তকণিকাও কথা বলছে। সেই সঙ্গে উত্থান ঘটছে তার, যেন মাটিতে পা নেই, অথচ চমৎকার স্থির থাকতে পারছে, যুক্তিনির্ভর আড়ষ্ট দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, মহাবিশ্বের কোন নিয়ম তার বেলায় কাজ করছে না।

'আমার সঙ্গে কথা বলো! আমাকে জানাও! আমি কে? তুমি কে? কী আমাদের সম্পর্ক? কোত্থেকে এলাম? কোথায় যাব? বলো! জানাও!'

আইভরি রডটা তুলল ভিতেরা। ঠিক সেই মুহূর্তে ঝড়টা শুরু হলো। দমকা একটা বাতাস এসে ফেলে দিল সব কটা পোল। তার ছিঁড়ে গেল, নিভে গেল সমস্ত আলো।

তারপরও অন্ধকার জাঁকিয়ে বসতে পারল না। কিছুক্ষণ বিরতির পর এখন আবার আলো জ্বলে উঠেছে মাথার উপর আকাশে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

সাগর ফুঁসছে, সেই গর্জনকে ভিতেরার মনে হলো আর্ক থেকে বেরিয়ে আসা ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর। 'কথা বলো আমার সঙ্গে। কথা বলো! জানাও।' তারপর আইভরি নিয়ে কাজ করার সময়, হঠাৎ নিজেকে নিঃস্ব মনে হলো, যেন এই মুহূর্তের আগে তার কোন অস্তিত্ব ছিল না, যেন তার সমস্ত স্মৃতি মুছে ফেলা হয়েছে; মনটা অসম্ভব শান্ত, শান্তিময় অনুভূতি, যেন চারপাশের অন্ধকারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে, মহাবিশ্বের সঙ্গে সম্ভাব্য সব রকমভাবে সংযুক্ত সে।

তারপর নিজের আলাদা কোন অস্তিত্ব থাকল না। সে এখন কিছু না। এখন তার অস্তিত্ব টিকে আছে শুধু আর্ক থেকে বেরিয়ে আসা শব্দের ভিতর। ঈশ্বরের শব্দের সঙ্গে।

ভিতেরা দেখতে পাচ্ছে না তার চারপাশে লোকজন প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারছে দৌড়াচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে না মাটি ফেটে লম্বা-চওড়া ফাটল তৈরি হচ্ছে, সেই সব ফাটল গিলে ফেলছে অসহায় মানুষকে। গিলে নিয়ে আবার উগরে দিচ্ছে দ্বিগুণ বেগে সামুদ্রিক নোনা জলসহ। খেয়াল নেই পরম শত্রু মাসুদ রানা টিলার উপর থেকে তার দিকে গ্রেনেড লঞ্চার তাক করছে।

এ যেন হঠাৎ কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে, কেউ কারও খবর নেওয়ার সময় নেই, ইচ্ছে বা সাধ্য নেই সাহায্য করার।

একা শুধু ভিতেরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেদির সামনে, নিজের কাজে নিবেদিত প্রাণ। ঐশ্বরিক ক্ষমতা লাভের মোহে কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত। আর্কের ডালাটা খুলছে সে।

মোটা আলখেল্লার ভিতর দরদর করে ঘামছে ভিতেরা। পরম সত্যের মুখোমুখি হওয়ার মাহেন্দ্রক্ষণটি উপস্থিত হয়েছে। উন্মোচিত হবে সমস্ত রহস্য। ঐশ্বরিক সকল কর্মপরিকল্পনা আর কলা-কৌশল প্রকাশিত হবে। কান্না আর হাসির মত একটা শব্দ করে ঢাকনিটা তুলল সে।

কী এক মহা আনন্দে হেসে উঠল ভিতেরা। চোখের সামনে আশ্চর্য এক স্বর্গীয় জ্যোতি দেখতে পাচ্ছে সে। বুঝতে পারছে মহাবিশ্ব যেদিন তৈরি হয় সেদিনের প্রথম সেই আলো এটা। নতুনত্বের আলো, নতুন করে জন্মানোর আলো, যে আলো ঈশ্বর তৈরি করেছিলেন: সৃষ্টির আলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে গ্রেনেড লঞ্চারের ট্রিগার টানল রানা।

অব্যর্থ লক্ষ্য। ভিতেরা অবশ্য বেদির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েই থাকল, তবে দাঁড়িয়ে থাকল শুধু তার অর্ধেকটা। বাকি অর্ধেক, বুক সহ মাথা, বিস্ফোরিত গ্রেনেড ছিঁড়ে নিয়ে গেছে।

ফাহিমাকে নিয়ে জঙ্গল ধরে ছোটার সময় রানা অনুভব করল

বিক্ষুব্ধ সাগর ওদের পিছনের বালিয়াড়ির উপর দিয়ে উঠে আসছে দ্বীপের পশ্চিম, অর্থাৎ উঁচু দিকটাতেও। ঝোপ-ঝাড় ডিঙিয়ে ছুটল ওরা, লাফ দিয়ে গভীর খাদ টপকাল, পেরিয়ে এল মাঠ, পাহাড় টপকাল, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখতে পেল ওদের পিছনে তীব্র স্রোতের ধাক্কায় মটমট করে ভেঙে পড়ছে আকাশ ছোঁয়া গাছগুলো। বিদ্যুতের চোখ-ধাঁধানো ঝলকানি পথ দেখাচ্ছে ওদেরকে। তবে এভাবে কত দূর যেতে পারবে বলা মুশকিল। কারণ পিছু নিয়ে শুধু সাগর ছুটে আসছে না, গোটা দ্বীপ দ্রুত নিচু হয়ে তলিয়ে যাচ্ছে সাগরের গর্ভে।

তারপর একটা বাজ পড়ল দ্বীপের কোথাও।

হঠাৎ শুরু হলো তুমুল বর্ষণ।

তারপর টকটকে লাল একটা স্তম্ভ মাথা চাড়া দিল সেই বেদির মাঝখান থেকে, রানা আর ফাহিমার হাজার কী বারোশো গজ পিছনে। একশো গজ বেড় নিয়ে ওটা একটা আগুনের স্তম্ভ, সহস্র বছর ধরে লুকিয়ে থাকা একটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ।

এত দূর থেকেও আগুনের আঁচে গায়ের চামড়া পুড়ে যাচ্ছে ওদের। গুহাটার ভিতর ঢুকে পড়তে দেরি করলে নির্ঘাত আগুন ধরে যেত কাপড়ে।

গুহার ভিতর সাগরের পানি আশ্চর্য শান্ত দেখল রানা। এক প্রস্থ রশি কনিং টাওয়ারের গায়ে পেঁচিয়ে, অপরপ্রান্তটা বড় একটা বোল্ডারের তলায় আটকে রেখে গিয়েছিল ও। রশিটা ছেঁড়েনি, সাবমেরিনেরও কোন ক্ষতি হয়নি।

কন্ট্রোল কনসোলের সামনে বসে ঝটপট কয়েকটা বোতাম টিপে আর লিভার টেনে স্টার্ট দিল রানা, লম্বা গুহা থেকে সাবধানে খোলা সাগরে বের করে আনল সাবটাকে।

সারফেসে পেরিস্কোপ তুলে চারপাশে চোখ বুলাচ্ছে রানা। আলোর কোন অভাব নেই। অভাব শুধু দেখার জিনিসের। গভীর

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও।

'কী দেখছেন, মাসুদ ভাই?' পাশ থেকে রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল ফাহিমা।

পেরিস্কোপের আইপিসটা নিঃশব্দে তার দিকে ঠেলে দিল রানা।

আইপিসে চোখ রেখে সাগরের উপরটা দেখছে ফাহিমা। বিদ্যুতের আলোয় চারদিক ভালো করে দেখতে বেশ কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল তার। 'আশ্চর্য! আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, মাসুদ ভাই! কত বড় একটা দ্বীপ...'

'থাকলে তো দেখবে,' বিষণ্ন সুরে বলল রানা। 'এখন ওটা একটা ডুবো আগ্নেয়গিরি।'

***

মাসুদ রানা

মরুকন্যা

কাজী আনোয়ার হোসেন

অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছে মাসুদ রানা। শুরু হলো কুখ্যাত আর্কিওলজিস্ট পল ভিতেরার সঙ্গে শত্রুতা। এরপর ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেওয়ার পালা, তবে ইজরায়েলি এজেন্ট মিরান আর নিশাকে কথা দিতে হলো, পবিত্র একটা আর্টিফ্যাক্ট উদ্ধারে তাদেরকে সাহায্য করবে ও।

পেরুর গভীর জঙ্গল থেকে নেপালের দুর্গম প্রত্যন্ত এলাকা, মিশরের উষর মরুভূমি থেকে আফ্রিকান উপকূলের ছোট্ট একটা দ্বীপ—প্রবল প্রতিপক্ষ তাড়া করে বেড়াচ্ছে ওকে। মুসা নবীর আর্কটা ওদের চাই-ই চাই।

সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Aohor Arsalan HQ Release

Please Buy The Hard Copy if You Like this Book!!

www.Banglapdf.net